Contents

লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের উপর হাদীস শাস্ত্রের আলোকে রচিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক

জরুরী জ্ঞাতব্য

* গ্রন্থটির নাম 'প্রচলিত জাল হাদীস' বলে এর সব হাদীসই জাল ও মওযূ নয়; বরং এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনেক সহীহ হাদীসও স্থান পেয়েছে। তাই এ গ্রন্থে আছে বলেই কোন হাদীসকে জাল বলে দেওয়ার কোন অবকাশ নেই; বরং হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা অবশ্যই পড়তে হবে; যদিও বাহ্যিক আলামতস্বরূপ জাল ও মওযূগুলোকে কালো-মোটা অক্ষরে নম্বরসহ লেখা হয়েছে।

* জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত সম্পর্কে ৩৩-৭৮পৃষ্ঠা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা মূল গ্রন্থে প্রবেশের পূর্বেই ভালভাবে পড়ে নেওয়া খুবই জরুরী।

* আলোচিত ভিত্তিহীন ও জালরেওয়ায়াতসমূহ ঃ ৮১-২৩৩ পৃষ্ঠা

* নূর ও বাশার এবং নূরের হাদীস সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনাঃ ১৯৭-২৪৩ পৃষ্ঠা

كفى بالمرأ كذبا أن يحدث بكل ما سمع.

"কারো মিথ্যাচারী হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে (সত্যমিথ্যার যাচাই ছাড়া) তাই বর্ণনা করে।"

–সহীহ মুসলিম ঃ ১/৮, হাদীস ৫, সুনানে আবু দাউদ ঃ ২/৬৮১, হাদীস ৪৯৮২

Contents

প্রচলিত জাল হাদীস

মাওলানা মুতীউর রহমান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

(গবেষণামূলক উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান)

Contents

প্রচলিত
জাল হাদীস

মাওলানা মুতীউর রহমান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক ঃ মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
(গবেষণামূলক উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান)
৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬, ফোন ঃ ৮০৫০৪১৮,০১৫৫২-৪৩৩৮৭২

১ম প্রকাশ ঃ রজব ১৪২৪ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী

মূল্য ঃ একশ পঁচানব্বই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

*** আলখায়ের প্রকাশনী**
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং ৩)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৪-২৬৩৯৪১

*** মাকতাবাতুল আশরাফ**
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ৫
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

*** রাহমানিয়া লাইব্রেরী**
সুপার মার্কেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১

PRACHALITA JAL HADITH VOL-1 BY MAWLANA MATIUR RAHAMAN **EDITED BY** MAWLANA MUHAMMAD ABDUL MALIK

PUBLISHED BY MARKAZUD DAWAH ALISLAMIA DHAKA (AN INSTITUTE FOR HIGHER RESEARCH EDUCATION AND DA'WA) 30/12, PALLABI, DHAKA-1216, TEL : 8050418, MOBILE : 01552-433872

PRICE : *TK. 195.00 U. S. $ 5.00 ONLY*

মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর তত্ত্বাবধায়ক, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহুম-এর

দুআ

আল-হামদুলিল্লাহ, 'মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা' বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আল্লাহর রহমতে নির্ধারিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, ইতিমধ্যেই 'দারুত তাসনীফ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু কিতাব প্রকাশিত হয়ে পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। আরো কিছু কিতাবের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে আছে; আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাওফীক হলে সেগুলো প্রকাশ করা যাবে।

এখন 'প্রচলিত জাল হাদীস' নামে যে কিতাবটি প্রকাশ করার তাওফীক হয়েছে এর রচনা ও প্রচার সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছিল।

এই কিতাব সম্পর্কে আমার কোন কিছু বলার নেই। দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরামের মূল্যবান অভিমত থেকেই পাঠকবৃন্দ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবেন।

আল্লাহ পাক এই প্রতিষ্ঠান ও এর আসাতিযা, তালাবা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবূল করুন এবং এই কিতাবটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা সামান্যতম শ্রমও দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন; আমীন।

আব্দুল হাই (পাহাড়পুরী)
২৬/০৮/১৪২৪ হিজরী

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন,
আল-আল্লামাতুল মুহাক্কিক হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের

অভিমত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শুকরিয়া যিনি নিজেই এই দ্বীনের হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর আল ও আসহাবের উপর।

আল্লাহ রাব্বুল ইযযত এই দ্বীন ও শরীয়তকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই শরীয়তের বিধানই বলবৎ থাকবে। তাই এই দ্বীন ও শরীয়তের ভিত্তিসমূহও কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও খোদ আল্লাহ তাআলাই নিয়েছেন।

যেহেতু হাদীস শরীফ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম ভিত্তি; তাই আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে হাদীস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় উলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দেসীনে ইযাম বিভিন্নমুখী অকল্পনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। রচনা করেছেন হাদীসশাস্ত্রের সকল বিভাগে অসংখ্য গ্রন্থ। যুগ ও জাতির চাহিদা পূরণে তাঁরা ছিলেন সদা-সচেষ্ট। যখনই হাদীসের উপর ইসলাম বিদ্বেষী, অর্বাচিন ও বাতিল পন্থীদের আক্রমণ এসেছে তখনই তাঁরা আছায়ে মূছা হাতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং বর্ণনা ও লেখনীর মাধ্যমে তা প্রতিহত করেছেন। উলামা ও মুহাদ্দেসীনে কেরামের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত হয়ে গেছে।

[সাত]

আমি শোনে খুশী হয়েছি যে, 'মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা'র রচনা বিভাগ 'প্রচলিত জাল হাদীস' নামে একটি পুস্তক তৈরী করেছে। বহু দিন থেকেই বাংলা ভাষায় এ ধরণের বইয়ের অভাব প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছিল। আশা করি বইটির মাধ্যমে বহুদিনের এ শূন্যতা কিছুটা হলেও পূর্ণ হবে এবং পাঠক-পাঠিকাগণ এর মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান পাবেন।

এ বইয়ে যে সব রেওয়ায়াত ও বর্ণনা বাতিল, মিথ্যা ও জাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিজেদের থেকে নয়; বরং বিজ্ঞ ও প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের উদ্ধৃতিতেই উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস থাকলে তা বরাত সহ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বাতিল, মিথ্যা ও প্রচলিত জাল হাদীস পরিহার করত সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমাদেরকে জানতে হবে তা সত্যিই হাদীসে রাসূল কিনা। নতুবা উদাসীনতা ও অসাবধানতার কারণে আমরা মিথ্যাচারী সাব্যস্ত হব। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كفى بالمرأ كذبا أن يحدث بكل ما سمع.

"কারো মিথ্যাচারী হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে (সত্যমিথ্যার যাচাই ছাড়া) তাই বর্ণনা করে।" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/৮, হাদীস ৫, সুনানে আবু দাউদ ঃ ২/৬৮১, হাদীস ৪৯৮২

আর জেনে-শুনে মিথ্যা বর্ণনা করার তো প্রশ্নই আসে না। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.

"যে ব্যক্তি আমার নামে বুঝে-শুনে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে সেও মিথ্যাচারীদের একজন।" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/৬

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হাদীসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে সহীহ হাদীসের প্রচার-প্রসারের তাওফীক দান করুন; আমীন।

উবায়দুল হক
১.৬.০২ ইং

Contents

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা, বাংলার মাদারে ইল্‌মী–জামিআ আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর রঈস, হযরাতুল আল্লামা মাওলানা আহমাদ শফী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর

অভিমত

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد!

ইলমের ইতিহাস যারা জানেন তাদের কারো অজানা নয় যে, বিভিন্ন প্রকৃতির লোকেরা নানা উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এমন সব কথা প্রচার করেছে যা তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। কতক ধর্মোদ্রোহী তো অসংখ্য উদ্ভট, ভিত্তিহীন ও বাতিল কথাকে হাদীসে রাসূল নামে মানুষের মাঝে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজেই এই দ্বীন হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই হাদীস ও সুন্নাহ–যা দ্বীন ও শরীয়তের দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি এবং যা ব্যতীত দ্বীনের পূর্ণ পরিচয়, দ্বীনের আমলী নমুনা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব–এর হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতি যুগেই এমন নিবেদিতপ্রাণ শাস্ত্রজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন যাঁরা হাদীসের আমানত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন; যাঁরা দাজ্জাল ও মিথ্যুকদের মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্ভট ও জালিয়াতি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের নিখাদ খেদমত আঞ্জাম দেন। তাঁদের বিভিন্নমুখী খেদমতের একটি এই যে, শুধু বানোয়াট ও জাল বর্ণনাসমূহের প্রকৃত অবস্থা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য তারা রচনা

করেন বহু গ্রন্থ। ফলে মানুষ সে সকল গ্রন্থের মাধ্যমে বানোয়াটকে বানোয়াট হিসেবে জানতে পেরেছে।

এতদিন বাংলা ভাষায় এ ধরনের কোন কিতাব ছিল না। আল্‌হামদু লিল্লাহ্, অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর রচনা বিভাগের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি তাহকীকী পুস্তক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পুস্তকের প্রতিটি কথা 'মুহাক্কিক', বিজ্ঞ ও হাদীসপরখবিদদের বরাতে লেখা হয়েছে। পুস্তকটির প্রথম খণ্ড আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হল।

বক্ষমান কিতাবটি সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই। হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুস সালাম সাহেব (সাবেক রঈস–দারুল ইফতা–জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিনুরী টাউন, করাচী এবং বর্তমান উস্তাদ–গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ, জামিআ আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী) কিতাবটি পড়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। তাছাড়া খোদ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব–যাঁর তত্ত্বাবধানে এ কিতাব লেখা হয়েছে, তিনি সমকালীন একাধিক প্রখ্যাত আলেম ও হাদীস বিশেষজ্ঞদের সুদীর্ঘ সোহবত লাভে ধন্য হয়েছেন এবং হাদীসশাস্ত্রে তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে উলামায়ে কেরামের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা কিতাবটিকে কবূল করুন; উম্মতকে এর দ্বারা উপকৃত করুন; যে প্রতিষ্ঠান এবং যে সব ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এ কিতাব প্রকাশিত হল আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন; আমীন। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

আহমদ শফী

২২ জুমাদাল উখরা ১৪২৪ হিজরী

Contents

প্রসিদ্ধ ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসার মহাপরিচালক আল উস্তাযুল মুহাক্কিক আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী দামাত বারাকাতুহুম-এর

অভিমত

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

"প্রচলিত জাল হাদীস" কিতাবটির কয়েকটি আলোচনা আমি শোনেছি। কিতাবটি রচনার ক্ষেত্রে আমার পরামর্শও নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর দায়িত্বশীলদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাঁরা এই কিতাবের মাধ্যমে সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী পূরণ করেছেন।

এ কথা সকলেরই জানা যে, হাদীসে রাসূলের ব্যাপারে আজ অবহেলা ও অসতর্কতা ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। যে কোন লেখক বা বক্তার নিকট হাদীস নামে কিছু পেলেই তা গ্রহণ করে নেওয়া হচ্ছে; অথচ হাদীস শুধু হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে বিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে কেরামের হেদায়াত মোতাবেক গ্রহণ করা উচিত।

একাধিক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অবহেলা ও অসতর্কতা থেকে বারণ করেছেন। তাছাড়া শরীয়তের ঐকমত্যপূর্ণ মাসআলাসমূহের একটি মাসআলা এই যে, মিথ্যা, বাতিল, জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা হারাম।

এই ব্যাপক রোগের চিকিৎসাস্বরূপ কিতাবটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এর

১ম পর্ব আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এতে শুধু সেসব রেওয়ায়াত চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো আমাদের দেশে হাদীস হিসেবে লোকমুখে প্রসিদ্ধ; অথচ সেগুলো জাল বা ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একমত।

কিতাবটির শুরুতে মারকাযুদ্দাওয়ার আত-তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীসিশ শরীফ-এর মুশরেফ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের ৪৬পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি তাহকীকী ভূমিকা রয়েছে। এতে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক আলোচনা করেছেন যা মূল বইয়ে প্রবেশের পূর্বে মনোযোগের সাথে প্রত্যেকের পড়ে নেওয়া উচিত, যাতে নিজের অজ্ঞতার কারণে কিতাবের কোন আলোচনা বিভ্রান্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

আমি এ কারণে খুব আনন্দিত হয়েছি যে, আলোচ্য কিতাবে যা কিছু লেখা হয়েছে সবই নেহায়াত তাহকীকের পর নির্ভরযোগ্য বরাতে লেখা হয়েছে। প্রতিটি জাল বা ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের বিপরীতে সহীহ হাদীস বা সঠিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে কিতাবটির উপকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভূমিকায় "জরুরী সতর্কীকরণ" শিরোনামে যে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, সেটিও বিশেষভাবে জানা থাকা উচিত। কেননা কোন কোন মহলে এ ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করছে যে, নিজের মন বা মাযহাব বিরোধী হলেই যে কোন হাদীসকে তারা জাল বা দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। এ ফিতনা পূর্বোক্ত ফিতনা থেকে কোনক্রমেই কম ভয়াবহ নয়। হাদীসের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

অবশেষে আমি কিতাবের লেখক মাওলানা মুতীউর রহমান এবং তাঁর মুশরেফ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব যাঁর তত্ত্বাবধানে এই কিতাবটি লেখা হয়েছে, উভয়ের মাকবুলিয়্যাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করি। বিশেষত মারকাযুদ্দাওয়ার জন্য দুআ করি। আমি জানতে পেরেছি যে, মারকাযের দারুত তাসনীফে ইলমী ও গবেষণামূলক একাধিক কিতাব প্রস্তুত হয়ে আছে, যেগুলো সময়ের ইলমী প্রয়োজন মিটাতে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক

অবস্থা অতিশয় দুর্বল হওয়ার কারণে এই কিতাবগুলো জনসাধারণের হাতে আসতে পারছে না। তাই অর্থবান দ্বীনদার ভাইদের জন্য এদিকে মনোযোগ দিয়ে নিজ নিজ আখেরাতের জন্য সদকা জারিয়ার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা প্রতিষ্ঠানটি কবূল করুন এবং এর সর্বপ্রকার উন্নতি ও অগ্রগতি দান করুন; আমীন।

মুহাম্মাদ হারুন ইসলামাবাদী
০৪/০৮/২০০১ ঈসায়ী

Contents

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া করাচীর সাবেক প্রধান মুফতী, জামিয়া আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুফতী ও মুহাদ্দেস হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুস সালাম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর

অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد!

জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত সম্পর্কে স্নেহের মাওলানা মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব (আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন)এর তত্ত্বাবধানে যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে আমি তা পড়িয়ে শোনেছি। মাশা-আল্লাহ বিষয়বস্তুর বিচারে গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, হাদীস সংকলনের ইতিহাস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিভিন্ন ফেরকা ও দল নিজেদের হীনস্বার্থে বহু রেওয়ায়াত জাল করেছে। শব্দের ত্রুটি, বর্ণনাভঙ্গি, শব্দ ও বাক্য বিন্যাস দেখে উলামায়ে কেরাম বিশেষত ফিক্হ ও হাদীসশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিরা তো বুঝতে পারেন যে, এটি জাল, বাতিল ও মনগড়া রেওয়ায়াত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ থেকে বেখবর ও উদাসীন। কেননা তারা সে সব ফেরকার উদ্দেশ্য ও কুট-কৌশল বুঝে উঠতে পারে না।

রেওয়ায়াত জাল করার বা জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করার ব্যাপারে যে সব হুঁশিয়ারী এসেছে জালকারীরা বা তা বর্ণনাকারীরা হয়ত তা থেকে অজ্ঞ ও জাহেল কিংবা সে ব্যাপারে অবগত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়ার কারণে এই গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الشيخان.

"যে ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" —সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري.

"যে আমার নামে এমন কোন কথা বলবে যা আমি বলিনি তাহলে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" –সহীহ বুখারী

অন্যত্র আরো ইরশাদ করেন ঃ

حدثوا عني ولا تكذبوا علي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري والترمذي.

"তোমরা হাদীস বর্ণনা কর; কিন্তু আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" –সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, রেওয়ায়াত জাল করা অথবা জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করার নিন্দা ও হুঁশিয়ারী সম্পর্কে শতাধিক সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাঁদের মধ্যে 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)ও রয়েছেন।

যাহোক, যারা জেনে-শুনে জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করে এবং তা দ্বারা মানুষকে কোন আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বা কোন আকীদা-বিশ্বাসের দাওয়াত দেয় এবং তাকে জরুরী মনে করে বা জায়েয মনে করে তারা সবাই উক্ত কঠোর হুঁশিয়ারী বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আযাবের যোগ্য হবে। কেননা জাল ও মিথ্যা রেওয়ায়াত দ্বীন ও শরীয়ত বহির্ভূত বস্তু। তাই যে কেউ একে দ্বীন ও শরীয়ত মনে করবে সে আল্লাহ ও রাসূলের উপর মিথ্যারোপকারী হিসাবে বিবেচিত হবে; আর এরূপ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আযাবের কঠিন হুঁশিয়ারী রয়েছে। তাই হাদীস বর্ণনাকারীদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

আশা করি বক্ষমান গ্রন্থটি এ ব্যাপারে যথেষ্ট মদদ যুগাবে। কেননা, এতে যা কিছু লেখা হয়েছে তা অনেক তাহকীক করে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের ইমাম ও বিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে কেরামের উদ্ধৃতিতে লেখা হয়েছে।

বান্দা মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
২২ জুমাদাল উখরা ১৪২২হিজরী

ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী দামাত বারাকাতুহুম-এর বিশিষ্ট খলীফা, শাইখুল হাদীস আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেবের

অভিমত ও দুআ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد!

ইসলামের ভিত্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত। لا ريب فيه এতে কোন ধরণের শক-শোবাহ, দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই।

এই ওহীর দুটি ধারা মাতলূ এবং গাইরে মাতলূ। সংক্ষেপে আমাদের কাছে আল-কিতাব এবং আস্‌সুন্নাহ নামে পরিচিত। আরো সহজে আমরা বলি কুরআন ও হাদীস।

আল্লাহ পাকের বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন নির্ঘোষ ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

"আর আমি নাযিল করেছি 'আয-যিক্‌র' আর আমি-ই এর হেফাযতকারী।"

এ আলোকে দীন ও ইসলামের মূল বুনিয়াদ ওহীর সর্বোত সংরক্ষণ হয়ে আসছে। দুশমনরা চেষ্টা করেছে বহুত; কিন্তু لا يأتيه الباطل... বাতিলের অনুপ্রবেশ তাতে কোন দিক দিয়েই, কোন ক্রমেই নয়। এই নিঃশঙ্কতায় হাজারো বাজী রেখে প্রয়াসের পরও অক্ষমতা অসফলতার কঠিন প্রাকারে মাথাকুটা ছাড়া আর পারেনি কিছুই। ওহী-এ-মাতলূ কুরআন যেহেতু নাজ্‌ম ও

মা'না, শব্দ ও মর্ম উভয়েরই সমষ্টি সেহেতু শেষতক ليس من كلام البشر এতো মনুষ্যবাণী নয় বলে রণে ভঙ্গ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর হয়নি। তবে ওহী-এ-গায়রে মাতলূ হাদীস ও সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে এরা নানা কূট-কৌশলে বাযূ আযমাই-বাহু পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে বটে। কিন্তু তাক্‌বীনী নেজামের প্রকাশ্য উদ্ভাস সাহাবা-ই-কেরামের যুগ থেকে নিয়ে সর্বযুগে পূর্বসূরী ওলামা, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও মুফাস্‌সিরীন তন-মন-প্রাণ এক করে এই আহবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন এবং 'বাল সে খাল নিকাল কর' এর সর্বোত সংরক্ষণ করেছেন। এর ইতিহাস সু-প্রাচীন, সু-বিপুল ও সুদীর্ঘ। আবু বকর (রাঃ) উমর (রাঃ) ইবনে মাসউস (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে নিয়ে শা'বী, যুহরী, আবু হানীফা, মালিক, শাফী', আহমাদ, ইবনে মাদীনী, ইবনে মা-ঈন (রহঃ)-এর কাল বেয়ে বুখারী, মুসলিম সহ হাজারো, লাখো সেই মহাপ্রাণদের কয়জনের কথা বলা যাবে। সকলেই অহরহ প্রাণ, জাত, শ্রম, মেধা, শক্তি, মননশীলতা সৃষ্টিশীলতা সবকিছু একান্ত নিয়োজিত করেছেন এই মহা প্রয়াস-পথে। আর দুশমনদের সকল ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করে দিনকে দিন আর রাতকে রাত বলে আলাদা আলাদা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এত সু-স্পষ্ট এত পরিষ্কার করে সবকিছু উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন যে আজ যেমনভাবে আলকিতাব কুরআন মাজীদের আয়াতের বিষয়ে সত্যতা ও নির্ভুলতার কসম খেয়ে দাবী করা যায় তেমনি এমন হাদীসের সংখ্যাও কম নয় যেগুলোর সত্যতা ও নির্ভুলতার কসম খাওয়া যায়।

কুরআন মাজীদের মর্মোদ্ঘাটন ও তাফসীরের এমন কোন দিক নেই, ইসলামী যিন্দেগীর এমন কোন অঙ্গ নেই, মনুষ্য জীবন পরিচালনার কোন ক্ষেত্র এমন নেই যে বিষয়ে বিশুদ্ধ সুন্নাহ ও হাদীস বিদ্যমান নেই। মানব জীবন পরিচালনার সব দিক সম্পর্কেই আছে বিপুলসংখ্য সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের মহা সম্ভার। হাদীস সংরক্ষণ কার্যের ধারাবাহিকতায় ওলামা ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম যেমন সহীহ, হাসান, যঈফ ইত্যকার সবকিছুই যাচাই বাছাই করেছেন। নির্ভুল নীতিমালা কলকাঠি নির্ধারণ করে সব কিছু আলাদা

করেছেন। এই প্রবাহমানতায় তারা দুশমন এবং কিছু নাদান দোস্তদের দ্বারা প্রচারিত মওযূ ও স্বকল্পিত বর্ণনাসমূহেরও মাজমূআ তৈরী ও সংরক্ষণ করেছেন যেন কারো প্রতারিত হওয়ার অবকাশমাত্র না থাকে। এই প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতীর আল-লাআলিল মাস্নূআ-এর কথা তো সকলেই জানেন।

সুখের কথা বাংলাদেশে বর্তমানে ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে লিখন ও পঠন সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীস চর্চা ক্রমবেগবান। অনেক তরুণ আলিম ও বিশেষজ্ঞ এদিকে এগিয়ে এসেছেন। তবে উলূমুল হাদীস ক্ষেত্রে আলোচনা এখনও তেমন বেশী হয়নি। বিশেষ করে আমাদের দেশে তথাকথিত ওয়ায়েজীনের মাধ্যমে আর মকছূদুল মুমিনীন মার্কা কিছু বটতলার বই-পুস্তকের কারণে কিছু জাল ও মওযূ হাদীস মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সে সম্পর্কে কোন প্রয়াস আমার চোখে পড়েনি। অথচ শুধু আম মানুষই নয় বহু শিক্ষিত এমন কি আলিম নামধারীদের মাঝেও এগুলোর উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং এগুলো চিহ্নিত করে দেয়ার বড়ই প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দিন তরুণ বিশেষজ্ঞ আলিম মাওলানা আব্দুল মালিককে। তিনি দীর্ঘদিন আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ)-এর মত মুহাক্কিকের তত্ত্বাবধানে থেকে হাদীসশাস্ত্রে বিপুল অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন। তিনি অত্যন্ত হিম্মত ও সৎসাহসের সাথে হাদীসের নামে আমাদের দেশে প্রচলিত কিছু বর্ণনা একত্রিত করে তাহকীক করে চিহ্নিত করে দিয়েছেন মূলতঃ এগুলো কি? এটি পড়ে অনেকেই হয়ত আঁতকে উঠবেন, অনেকেই হয়ত সমালোচনার যবান দরাজ করবেন; কিন্তু নিজে আদ্যোপান্ত রচনাটি দেখেছি। আল্লাহ তাআলা এটিকে কবূল করুন এবং হাদীস সংকলনের সোনালী চেইনের আংটা হিসেবে আমাদের কবূল করে নিন এই প্রত্যাশা রাখি। আমীন

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
২০/০৫/১৪২২ হিজরী

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কথা

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শুকরিয়া যে, তিনি অধমকে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের খেদমতের তাওফীক দান করেছেন।

বক্ষমান গ্রন্থটি ভূমিকা ও মূল কিতাব–দু'টি অংশে বিভক্ত। ভূমিকাটি লিখেছেন মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর উলূমুল হাদীস বিভাগের প্রধান মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব।

এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিতে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর তাহকীকী আলোচনা করেছেন ঃ

হাদীস ও সুন্নাহ সুসংরক্ষিত

হাদীস হেফাযতের পদ্ধতি

হেফাযতের মর্ম

জাল রেওয়ায়াত ও জালকারীদের পরিণতি

কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য

সহীহ হাদীসের উৎস

জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করা কবীরা গুনাহ

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয

জাল হাদীসের পরিচয়

কথা সঠিক হলেই হাদীস হওয়া জরুরী নয়

হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ গ্রহণযোগ্য নয়

শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মান

হাদীস প্রমাণে শুধু বুযুর্গের উদ্ধৃতি যথেষ্ট নয়

একটি জরুরী সতর্কীকরণ

হাদীস হিসেবে পরিচিত কোন কথা বা উক্তি সম্পর্কে এ কথা বলা যে, 'এটি হাদীস নয়' বিষয়টি যেমন অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তেমনি সুকঠিন এবং জটিলও বটে। তাই আলোচ্য কিতাবে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয়েছে হাদীস বিশেষজ্ঞদের উপর। তাঁদের উদ্ধৃতি ছাড়া কোন হাদীসের উপর জাল ও ভিত্তিহীন হওয়ার হুকুম লাগানো হয়নি।

আলোচ্যগ্রন্থটির বিন্যাস ও পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা থাকা দরকার ঃ

(ক) এই কিতাবে শুধু সে সকল রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো সকল হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে জাল বা ভিত্তিহীন।

فلم يذكر فيه في هذا القسط الأول منه ما فيه خلاف بين النقاد، وإن كان القول الراجح الحكم بالوضع والبطلان، اللهم إلا روايات عدة، ربما لا تزيد على ثلاثة، ذكرت لوهاء القول بعدم بطلانها.

(খ) এ গ্রন্থে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি; বরং যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে যাতে পুস্তকের বিষয়বস্তু কঠিন হওয়া সত্ত্বেও এর প্রকাশভঙ্গি ও উপস্থাপন কঠিন না হয়ে যায়।

(গ) এ গ্রন্থে অনেক স্থানে কোন কোন মুহাদ্দেসের বিশেষণ হিসেবে 'হাফেয' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ 'হাফেযে হাদীস' ও 'হাদীসশাস্ত্রের বিজ্ঞ ব্যক্তি।' হাদীস ও আসমাউর রিজালের পরিভাষায় শুধু কুরআনের হাফেযের ক্ষেত্রে 'হাফেয' শব্দের ব্যবহার নেই।

(ঘ) প্রায় প্রত্যেক রেওয়ায়াতের মান উল্লেখ করার পাশাপাশি আলোচিত রেওয়ায়াতবিষয়ক সহীহ্ হাদীস বা সঠিক তথ্য পেশ করা হয়েছে।

[একুশ]

(ঙ) প্রতিটি কথা হাদীসশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং বিদগ্ধ ইমামদের উদ্ধৃতিতে লেখা হয়েছে।[১]

(চ) এ পুস্তকে শুধু সে সব রেওয়ায়াতই স্থান পেয়েছে, যেগুলো এদেশের মানুষের মধ্যে প্রচলিত। এমনটি নয় যে, সকল জাল বা ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত স্তুপ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যা সাধারণ পাঠকদের জন্যে সম্পূর্ণ নিরর্থক একটি কাজ।

তবে এরূপ হতে পারে যে, একটি রেওয়ায়াত কোন এলাকার মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও মুখরোচক আর অন্য এলাকার লোকদের তা জানাই নেই। তাই কোন রেওয়ায়াত পড়ে শুধু নিজের অবগতির ভিত্তিতে এরূপ আপত্তি করা ঠিক হবে না যে, অযথা এ রেওয়ায়াত কেন উল্লেখ করা হল; কোন বোকাও তো একে হাদীস মনে করে না।

ঢাকার এক খতীবকে জুমুআর খুৎবায় বলতে শোনা গেছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : الإنسان مركب من الخطأ و النسيان (ভুল ও বিস্মৃতির সমষ্টিই মানব)' অথচ আমার মনে হয় না যে, কোন তালেবে ইলম এ কথা বিশ্বাস করতে রাজি হবে যে, কোন মানুষ একেও হাদীস মনে করে।

(ছ) রেওয়ায়াতগুলো বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে কিতাব থেকে উপকৃত হওয়া সহজ হয়।

(জ) পুস্তিকাটি এই বিষয়ের প্রথম পর্ব। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে

---

(١) فليس الأحكام التي ذيلت بها هذه الروايات الموضوعات من قبلنا نحن، حتى يقال: من هؤلاء؟ وما مدى وقوفهم على كتب الحديث ليحكموا على الحديث بأنه لا أصل له أو لا يوجد في كتاب، وكم من كتاب حديثي لم يقفوا عليه، فمن الممكن أن هذه الأحاديث فيها!!

لا عبرة بهذه الوساوس أصلاً، فإن كل ما حكم به على روايات الكتاب فمن النقاد المعتمدين ومن المصادر المعتمدة.

প্রয়োজনে এতে আরো সংযোজন হতে থাকবে ইনশাআল্লাহু তাআলা।

(ঝ) এতে কতিপয় বিষয় এমন রয়েছে যা সাধারণ পাঠকদের জন্য জরুরী নয়; বরং আহ্‌লে ইলমদের জন্য উপকারী, সেগুলো আরবী ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর শোকর আদায় করছি যাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানের কারণেই এই বিষয়ে লেখার হিম্মত হয়েছে। প্রতিটি রেওয়ায়াতের ব্যাপারে যা কিছু লেখা হয়েছে সবকিছু তিনি অক্ষরে অক্ষরে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়েছেন। শুধু তাই নয় বরং তাঁর বরকতে গ্রন্থটি সমকালীন আকাবেরে উলামায়ে কেরামের সম্পাদনা ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এবং তাঁদের অতিমূল্যবান মতামত লাভে ধন্য হয়েছে।

তদুপরি ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক; তাই কেউ ত্রুটিবিচ্যুতি অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এর সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং এটিকে আমাদের সকলের এবং মারকাযুদ্দাওয়ার কবূলের যরীয়া ও মাধ্যম বানান; আমীন।

মুতীউর রহমান
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
১৭/০৭/১৪২৪হিজরী

Contents

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

Contents

আলোচিত ভিত্তিহীন, মওযূ ও জাল রেওয়ায়াতসমূহ

Contents

Contents

[সাতাশ]

فهرس الأحاديث الموضوعة
والتي لا أصل لها مما اشتمل عليها الكتاب

[উপক্রমণিকা]

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে বড় বড় যত নেয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হল নবুওয়ত ও রিসালাতের নেয়ামত। মানুষের যখনই হেদায়াতের প্রয়োজন হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির তালীম-তরবিয়তের জন্যে নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং অহীর মাধ্যমে হেদায়াত দান করেছেন।

নবী ও রাসূল আগমনের এই ধারা বহু বহু কাল অব্যাহত ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁরই মাধ্যমে সর্বশেষ ও সর্বপূর্ণ হেদায়াত দান করা হয়, যা সর্বকালের জন্যেই প্রযোজ্য ও যথেষ্ট।

আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতি যে আসমানী তালীম ও হেদায়াত লাভ করেছে, তার দু'টি ভাগ–কিতাব ও সুন্নাহ। কিতাব অর্থ আল-কুরআন; যা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার কালাম ও ওহী। আর সুন্নাহ অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও জীবনচরিত এবং তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজ এবং আদেশ-নিষেধ, যা তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং তাঁর কিতাবের শিক্ষকরূপে উম্মতকে প্রদান করতেন; যা সাহাবায়ে কেরাম যথাযথ সংরক্ষণ করতঃ পরবর্তীদের নিকট হুবহু পৌছিয়েছেন এবং পরবর্তীরা তা সনদসহ কিতাবে সংরক্ষণ করেছেন। এই নববী আদর্শ এবং নববী শিক্ষা ও হেদায়াতের নামই হল হাদীস ও সুন্নাহ।

কুরআন তো কুরআনই। এর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য, এর জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান মানুষ কতটুকুই বা জানতে পারে! তবে বিভিন্ন হেকমতের ভিত্তিতে

কুরআনকে আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়তের আহকাম ও বিধান এবং নীতি ও মূলনীতির উৎস বানিয়েছেন। আর সে সব ধারা ও মূলনীতির ব্যাখ্যা, কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন, এর উলূম ও মাআরেফের ব্যাখ্যা এবং কুরআনী জীবনের বাস্তবরূপায়নের কাজ হাদীস ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে নিয়েছেন।[১]

সুতরাং হাদীস ও সুন্নাহ হল কুরআনের ব্যাখ্যা ও কুরআনের বাস্তব রূপরেখা। উপরন্তু, কুরআন মাজীদকে অর্থগত বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার জন্যে হাদীস ও সুন্নাহ হল আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত মানদণ্ড। হাদীস ও সুন্নাহ ইসলামের রুচি ও প্রকৃতি নির্ধারক এবং এতদুভয়ের সংরক্ষকও বটে। এই হাদীস ও সুন্নাহ মা'বূদের সাথে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টির মযবূত রজ্জু। হাদীস ও সুন্নাহ ঐ মহান ব্যক্তির ওহীভিত্তিক শিক্ষা ও হেদায়াতের নাম, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবের জন্যে রাসূল এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁর অনুসরণ-অনুকরণকে ঈমানের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন যে, তা ছাড়া কাউকে মুমিনই বলা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মোতাবেক জীবন যাপন করে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়েছেন; কিন্তু মানব জাতিকে কিয়ামত পর্যন্ত হেদায়াতের পথে পরিচালিত করার জন্যে তাঁর আনীত শিক্ষা ও হেদায়াত তথা কুরআন ও সুন্নাহ রেখে গেছেন।

আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকে প্রত্যেক যুগে হেফাযত করার জন্য এমন বহু ব্যবস্থা রেখেছেন, যা চিন্তাশীলদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার অকাট্য নিদর্শন এবং আখেরী নবীর এক জীবন্ত মু'জিযা। সেই ব্যবস্থাসমূহের একটি এই যে, যে যুগে কিতাব ও সুন্নাহ্র যে ধরনের খেদমতের প্রয়োজন দেখা

---

(١) يلاحظ أنه أطلق هنا في مواضع لفظ الحديث مرادفاً للسنة، وهذا على أحد الاستعمالات لهذين اللفظين، والمراد بهما هنا كل ما يمكن أن يؤخذ منه حكم شرعي من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وبقية شئونه. وأما الفروق الملحوظة بين هذين اللفظين حسب بقية استعمالاتهما فهي معروفة معلومة لدى أهل العلم.

দিয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কতিপয় বান্দার অন্তরে সে প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নববী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে কুরআন হাদীসের উপর যত কাজ হয়েছে, সেদিকে তাকালে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যত কাজ হয়েছে, সবই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে গায়েবী ব্যবস্থাস্বরূপ ছিল এবং যাঁদের দ্বারা এ বিশাল কর্ম সম্পন্ন হয়েছে তাঁরা শুধু উসীলা বা মাধ্যমই ছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ব্যাখ্যা যেমন ঈমানোদ্দীপক ও আনন্দদায়ক; তেমনি সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত যা এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ভূমিকার আলোচ্যবিষয় নয়; বরং একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের আলোচ্যবিষয় এবং এ বিষয়ের উপর অন্যান্য ভাষায় বিশাল কলেবরের স্বতন্ত্র গ্রন্থও রয়েছে।

হাদীস ও সুন্নাহ্ সুসংরক্ষিত

হাদীস ও সুন্নাহ্ সংরক্ষণের ইতিহাস যত দীর্ঘই হোক না কেন, এর মূলকথা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে কুরআন মাজীদকে সংরক্ষণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবেন, ঠিক সেভাবেই কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সুন্নাহকেও সংরক্ষণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবেন এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون "নিশ্চয় আমি এই উপদেশ (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর সংরক্ষণকারী।" –সূরা হিজ্‌র ঃ ৯

এখানে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের হেফাযতের ওয়াদা করেছেন। আর শব্দ ও মর্ম উভয়ের সমষ্টিরই নাম কুরআন। শুধু শব্দ কিংবা শুধু ব্যাখ্যার নাম কুরআন নয়। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা উক্ত আয়াতে কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয়েরই হেফাযতের ওয়াদা করেছেন। কেননা, কুরআন মাজীদের বক্তব্য অনুযায়ী সুন্নাহ্ হল কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য। তা ছাড়া ذكر (যিক্‌র) শব্দের অর্থ হল নসীহত। আল্লাহ্ তাআলা উক্ত আয়াতে কুরআন মাজীদ হেফাযতের ওয়াদা করতে গিয়ে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন

নাম থেকে 'যিক্র' নামটি উল্লেখ করেছেন। আর অর্থ ও ব্যাখ্যা ছাড়া শুধু শব্দ নসীহত হতে পারে না। সুতরাং যিকির শব্দই এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে কুরআন মাজীদের শব্দ এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা, যার অপর নাম হাদীস ও সুন্নাহ–উভয়েরই হেফাযতের ওয়াদা করেছেন।

বিষয়টি এমনিতেই সুস্পষ্ট, তাই কোন সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেননা, যে কিতাব শুধু তেলাওয়াতের জন্যে নয়; বরং চিন্তা-গবেষণা, উপদেশ গ্রহণ এবং আমল ও বিধিবিধান পালনেরও জন্য তার শুধু শব্দের হেফাযত যথেষ্ট নয়। কুরআনের হেফাযত যদি শব্দে সীমাবদ্ধ থাকে, আর অর্থ-বিকৃতির পথ খোলা থাকে তা হলে কুরআনের চির সংরক্ষিত হওয়ার সুসংবাদ সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ে। আর বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ স্থায়ীভাবে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা সংরক্ষণে ব্যর্থ। নাউযুবিল্লাহ!

কাজেই, যেভাবেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, এ কথা নিশ্চিত যে, হাদীস ও সুন্নাহ্র হেফাযত কুরআন মাজীদ হেফাযতের ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

যে কোন বিবেকবান হোক না অমুসলিম যদি হাদীস হেফাযতের ইতিহাস ও তার উপায়-উপকরণ ও হাদীসের সুবিশাল ভাণ্ডারের প্রতি নযর দেয়, তাহলে সে উক্ত ওয়াদার সত্যতা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। ومن أصدق من الله قيلا. وإن الله لا يخلف الميعاد

সুতরাং কুরআন মাজীদের সাক্ষ্য এবং বাস্তবতার সাক্ষ্য–সর্বদিক থেকে এ কথা অকাট্য যে, কুরআন মাজীদ, এর অর্থ, ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ (যার পারিভাষিক নাম নববী আদর্শ এবং হাদীস ও সুন্নাহ) সবগুলোই নিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত।

বাস্তব কথা হল, নবুওয়তের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তির পর আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত ও শিক্ষাদীক্ষা এবং তাঁর উত্তম আদর্শ হেফাযতের এরূপ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য ছিল। যেহেতু তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন নবী আসবে না এবং

এই দুনিয়াবাসীর শেষ জনগোষ্ঠী পর্যন্ত তিনিই নবী, তাই সংগত কারণেই তাঁর হেদায়াত, শিক্ষাদীক্ষা এবং উত্তম নমুনা দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, যাতে সকল যুগের সত্যানুসন্ধিৎসুরা তা থেকে হেদায়াতের সে নূর গ্রহণ করতে পারে, যে নূর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সৌভাগ্যবানরা সরাসরি নবুওয়তের পবিত্র দরবার থেকে গ্রহণ করত।

আজও যে কোন বিবেকবান মানুষ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, বিগত চৌদ্দ শতাব্দী যাবত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুসংহত রূপে বিদ্যমান ছিল এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। فقد شاء الله تعالى ذلك وقضى به

হাদীস হেফাযতের পদ্ধতি

বস্তুত কুরআন মাজীদ ও সুন্নাহ উভয়টিই উম্মতের হাতে সংরক্ষিত আছে। তবে সংরক্ষণের মধ্যে ধরণগত কিছু মৌলিক তফাৎ রয়েছে।

তন্মধ্যে এখানে যে পার্থক্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল, কুরআন মাজীদ সবটুকু একই গ্রন্থে সংরক্ষিত। প্রত্যেক যুগে হাজার হাজার নয়; বরং লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি হাফেয বিদ্যমান ছিলেন এবং এখনও আছেন, যাঁদের সিনায় পূর্ণ কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত আছে। পক্ষান্তরে হাদীস শরীফ কোন একক গ্রন্থে সংরক্ষিত নয়; বরং বহু গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

হেফাযতের মর্ম

এখানে একটি বিষয় জেনে নেওয়া দরকার যে, হেফাযতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, হেফাযতকৃত বস্তুতে কারো থেকে কোথাও কোন প্রকার ত্রুটি প্রকাশ পাবে না; বরং উদ্দেশ্য হল, তাতে কারো কোন ত্রুটি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারবে না। যখনই কোন ভুল হবে বা কোন কথা ছুটে যাবে, সাথে সাথে তা সংশোধনের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকবে। হাদীস ও সুন্নাহ

হেফাযতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে কুরআন মাজীদ হেফাযতের বিষয়টি বুঝতে হবে।

পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, নিজেই আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদ হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং ওয়াদা মোতাবেক তা যথাযথভাবে হেফাযত করেছেন। তাই বলে কি আপনি কোন হাফেয বা কারী সাহেবকে তেলাওয়াতে ভুল পড়তে শোনেননি? লিপিকারের কি কুরআন মাজীদ লিখতে ভুল হয় না? কোন মুদ্রাকরের কি যের-যবরের এদিক ওদিক হয় না?

এসব প্রশ্নের জবাব একটিই যে, কোন বিষয়ে কারো ভুল হয়ে যাওয়া এক কথা আর সে ভুল স্থায়িত্ব লাভ করা ভিন্ন কথা। যখনই কেউ ভুল করে, সাথে সাথে তার ভুল চিহ্নিত করে দেওয়া হয় এবং তা সংশোধন করে দেওয়া হয়। কেউ খারাপ নিয়তে করলে তারও যথোপযুক্ত প্রতিবাদ করা হয় এবং মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া হয়।

আর একথা বলাই বাহুল্য যে, একটি সংরক্ষিত বিষয় উপস্থাপন বা বর্ণনার ক্ষেত্রে কারো ভুল হওয়ায় বিষয়টির উপর কোনই প্রভাব পড়ে না। কারণ তা স্বস্থানে সুনিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত। আর ভুল তো হয়েছে ব্যক্তি বিশেষ থেকে, যা তার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। ভুল ভুলকারী পর্যন্ত, বিকৃতি বিকৃতিসাধনকারী পর্যন্ত সীমিত রয়েছে। অপরদিকে আসল জিনিস সম্পূর্ণ সহীহ-শুদ্ধভাবে সংরক্ষিত ছিল, এখনো আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে; কারণ খোদ আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমের চির সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

জাল রেওয়ায়াত ও জালকারীদের পরিণতি

সুন্নাহ ও হাদীসের বিষয়টিও একই রকম। তা সংরক্ষিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কোন হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারীর কোন প্রকার ভুল হয়নি বা কোন বেদ্বীন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোন বানোয়াট কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়নি; বরং বাস্তব সত্য এই যে, হাদীস রেওয়ায়াত করতে গিয়ে বহু বর্ণনাকারীর ভুলত্রুটি হয়েছে; কিন্তু সেগুলো কখনোই রাসূলের হাদীস হিসেবে

স্বীকৃতিলাভ করতে পারেনি; বরং ভুলক্রটি হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। জারহ-তাদীল এবং ইলালুল হাদীস উভয় শাস্ত্র এ কাজের জন্যেই নির্দিষ্ট।

এমনিভাবে অনেক বেদ্বীন বহু বানোয়াট, ভিত্তিহীন কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চালানোর কদর্য ও ব্যর্থ চেষ্টা করেছে; কিন্তু তাদের মিথ্যাচার কিছুতেই রাসূলের হাদীস নামে স্বীকৃতিলাভ করতে পারেনি; বরং উদ্ভট, জাল, বাতিল ও মুনকার ইত্যাদি নামে বিশেষিত ও চিহ্নিত হয়েছে এবং ঐ সকল দুষ্কৃতিকারীরা চিরদিনের জন্যে كذاب (মিথ্যাচারী), وضاع (জালকারী), متهم بالكذب (মিথ্যায় অভিযুক্ত) ও متروك (প্রত্যাখ্যাত) ইত্যাদি নামে কলংকিত হয়েছে। এ কাজের জন্যে 'আল মাওযূআত' এবং 'মারিফাতুল মাতরূকীন ওয়াল মুত্তাহামীন ওয়াল কাযযাবীন' নামক দু'টি মৌলিক শাস্ত্র ও উপশাস্ত্রসমূহ নির্ধারিত রয়েছে।

মোটকথা, ভুল তেলাওয়াতকে শুধরে দেওয়ার মত লোক যেমন সর্বযুগে সর্বত্রই আছেন, তেমনিভাবে ভুলভ্রান্তি এবং বর্ণনাকারীদের ক্রটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার মত বিচক্ষণ মুহাদ্দেসীনে কেরামও সর্বযুগে সর্বত্রই হাদীস হেফাযতের মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বিদআতী ও ধর্মদ্রোহীরা বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ইন্ধন যোগানোর জন্য যখনই জাল, বাতিল, মুনকার ও মাতরূক রেওয়ায়াতের আশ্রয় নিয়েছে, তখনই বিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে কেরাম সেগুলোকে অংকুরেই বিনাশ করে দিয়েছেন। সত্যানুসন্ধিৎসুরা বাতিলের বিরুদ্ধে جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (সত্য সমাগত, বাতিল অপসৃত)-এর লাঠি হাতে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

তবে হ্যাঁ, এতে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পূর্ণ কুরআন হাকীম যেহেতু একই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, ঘরে ঘরে কুরআন মাজীদের সহীহ-শুদ্ধ নোসখা বিদ্যমান, স্থানে স্থানে কুরআনের অসংখ্য হাফেয বর্তমান—এসব কারণে কুরআন কারীমের তেলাওয়াতে ভুল হলে ছোট্ট থেকে ছোট্ট বাচ্চাও তা সংশোধন করে দিতে পারে। তদ্রূপ কুরআন মাজীদ বিকৃতিকারীর অপতৎপরতা যেখানেই হোক না কেন, সাথে সাথে তা ধরা

পড়ে যায়; কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহ সমষ্টিগতভাবে এই উম্মাহর কাছে সংরক্ষিত থাকলেও যেহেতু কোন একটি নির্দিষ্ট কিতাব বা দু' একটি কিতাবে তা সীমাবদ্ধ নয়; আবার প্রত্যেকের কাছে অধিকাংশ হাদীসও বিদ্যমান নেই, কোন বিশেষ ব্যক্তি সকল সহীহ হাদীসের হাফেযও নন, সবার মধ্যে সহীহ ও গায়রে সহীহ নির্ণয়ের যোগ্যতাও নেই–এ সকল কারণে এমন তো হতে পারে যে, ভুল, জাল বা বাতিল রেওয়ায়াত বর্ণনাকারী লোকেরা সাধারণ মানুষ বা এ বিদ্যায় অজ্ঞ মানুষের হাত থেকে বেঁচে যাবে; কিন্তু এ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের হাত থেকে তারা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। অন্যরাও খেয়াল করলে সরাসরি হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের সহযোগিতায় বা তাঁদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর সহযোগিতায় সহজেই বিষয়টির ইল্‌ম হাসিল করতে পারবে এবং যে কোন দ্বীনী ব্যাপারে মুসলমানের শরয়ী দায়িত্বও এটি যে, তারা প্রত্যেক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞদের শরণাপন্ন হবে।[১]

সম্মানিত পাঠকদের হাতে যে কিতাবটি তুলে দেওয়া হচ্ছে, এতে হাদীস বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে এ ধরনেরই কিছু রেওয়ায়াত চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলোকে আমরা অজ্ঞতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মনে করে থাকি; অথচ সেসব রেওয়ায়াত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও জাল। হাদীসে রাসূলের সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে সেগুলো বর্ণনা করা সম্পূর্ণ হারাম।

১–এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হল, এগুলো সবই দ্বীন ও ইল্‌মবিষয়ক বাস্তব সত্য; অতি স্পষ্ট ও অকাট্য কথা। সবগুলোই বাস্তবতার ভাষ্য। নিজেই নিজের দলীল। এ সব তত্ত্ব ও বাস্তব এবং অকাট্য ও সুস্পষ্ট কথাগুলো উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কিতাবসমূহের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ঃ

মা'আরেফুল হাদীস–মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহঃ) (১ম ও ২য় খণ্ডের ভূমিকা); মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) রচিত পুস্তিকা–দাওরুল হাদীস ফী তাক্‌ভীনিল মানাখিল ইসলামী ওয়া সিয়ানাতিহী; জাষ্টিজ মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী সাহেব লিখিত–হুজ্জিয়্যাতে হাদীস এবং ডঃ খালেদ মাহমূদ সাহেব রচিত–আসারুল হাদীস।

আরবী ভাষায় এ ধরনের বহু কিতাব রয়েছে; কিন্তু আমার জানা মতে বাংলা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ এ-ই প্রথম। আশা করি এ গ্রন্থ দ্বারা সকল স্তরের মানুষই উপকৃত হবে। আল্লাহ তাআলা একে কবূল ও মনযূর করুন।

এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হতে হলে নিম্নোক্ত কথাগুলো জেনে নেওয়া একান্ত জরুরী।

কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য

সহীহ হাদীসের উৎস

১. মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ঠিক করা এবং জরুরী আমলের ইল্‌ম অর্জন করার পর ইল্‌মের ময়দানে একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম কাজ হল কুরআন মাজীদের সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা করা। এরপর নির্ভরযোগ্য কোন হাক্কানী আলেমের তত্ত্বাবধানে সাধ্য মোতাবেক ধীরে ধীরে কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীর ও তরজমার সহযোগিতায় কুরআন মাজীদের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করতে থাকা। সাথে সাথে নববী আদর্শ এবং তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াতের জ্ঞানার্জনেও কিছু সময় ব্যয় করা জরুরী।

উদাহরণস্বরূপ, আকীদাবিষয়ক হাদীসের জন্যে 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর কিতাবুল ঈমান তথা ঈমান অধ্যায়ের হাদীস পড়া। আখলাক-চরিত্র ও আদব-শিষ্টাচারের জন্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) রচিত 'আল আদাবুল মুফরাদ' এবং ইমাম নববী (রহঃ) রচিত 'রিয়াযুস সালেহীন' অধ্যয়ন করা। নববী যিকির ও দুআসমূহের জন্যে ইবনুল জাযারী (রহঃ) লিখিত 'আল্ হিসনুল হাসীন' এবং আল্লামা নববী (রহঃ)-এর 'আল আযকার' বার বার অধ্যয়ন করা। ফযীলতবিষয়ক হাদীসের জন্য 'আল্ মুন্‌তাকা মিনাত তারগীব ওয়াত তারহীব' এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল ও সীরাতসম্বলিত হাদীসের জন্যে 'শামায়েলে তিরমিযী', 'যাদুল মাআদ' ও 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি কিতাব পড়া। যুহ্‌দ ও মাওয়ায়েয, হেকমত ও প্রবাদ এবং অন্যান্য বিষয়ের হাদীস

জানার জন্যে 'সহীহুল জামিইস সগীর ওয়াযিয়াদাতিহী'ও একটি বিশাল ভাণ্ডার। ফিক্‌হবিষয়ক হাদীস জানার জন্যে 'ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার' এবং 'আসারুস সুনান' ইত্যাদি কিতাব পড়া।[১]

কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা সহীহ হাদীসের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়নের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। হাদীসের সাথে আমাদের সম্পর্ক এতটুকু যে, যে কোন বক্তার ওয়ায-নসীহতে বা বাজারি কোন পুস্তিকায় কোন হাদীস পেলেই হল। আমরা তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাই; অথচ হাদীসের ইল্‌ম অর্জন করার মাধ্যম যদি এটিই হয়, তা হলে নিজেদের অজান্তেই মানুষ হাদীসের নামে জাল ও মিথ্যা রেওয়ায়াতের ধোঁকায় পড়ে চরম ভ্রান্তির শিকার হবে। হয়ত বলা হবে যে, সবই যদি হয় জাল ও ভিত্তিহীন তা হলে আর থাকলটা কী?' এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভাই! যদি বাদ পড়ে তা হলে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতগুলোই বাদ পড়ছে এবং এগুলো বাদ পড়াই উচিত। যেগুলো মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সেগুলো সবই নির্ভরযোগ্য কিতাবে যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে। প্রয়োজন শুধু হিম্মত করে কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের তত্ত্বাবধানে সেগুলোর জ্ঞানার্জন করা। শুধু 'সহীহুল জামিইস সগীর ওয়াযিয়াদাতিহী'-এর মাঝেই সাত হাজারেরও অধিক সহীহ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। সুতরাং বক্ষমান গ্রন্থটির শ' খানেক জাল রেওয়ায়াত দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাদীসের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের পরিধি যদি জাল রেওয়ায়াত পর্যন্তই সীমিত থাকে, তা হলে তো আর কিছু করার নেই।

আরো আফসোসের কথা এই যে, একই বিষয়ের উপর যদি এক দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বিদ্যমান থাকে,

---

১-এ নেসাব ও তালিকা মধ্যম স্তরের লোকদের জন্যে প্রযোজ্য। আর হাদীসের বড় বড় গ্রন্থ, যা থেকে উপকৃত হতে হলে হাদীসের সনদ এবং ফিক্‌হের ব্যাপারেও যোগ্যতা থাকা জরুরী, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

অপরদিকে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতও থাকে, তখনো দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের মুখে ঐ বিষয়ের জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতই প্রসিদ্ধ। আর তার বিপরীতে সহীহ হাদীস থেকে তারা সম্পূর্ণ বেখবর এবং জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতগুলোকেই হাদীসে রাসূল নামে চালিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে যতই আফসোস করা হোক না কেন, তা খুবই কম হবে।

এ রোগের দাওয়াস্বরূপ আমরা এই কিতাবের অধিকাংশ স্থানে ভিত্তিহীন ও জাল রেওয়ায়াতের বিপরীতে একই বিষয়ের সহীহ হাদীস উল্লেখ করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, যাতে একই সাথে হাদীসের ইল্‌মও হাসিল হয়ে যায়, আর আমাদের উদাসীনতার আলস্যনিদ্রাও ভেঙ্গে যায় এবং এ কথাও যেন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা নিছক অজ্ঞতাবশত সহীহ হাদীস ছেড়ে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের পিছনে কীভাবে দৌড়াচ্ছি!!

জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করা কবীরা গুনাহ

২. জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের বিষয়টি হালকা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে দাবী করা ইসলামে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ বলে সাব্যস্ত। তাই এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে জাহান্নামের হুঁশিয়ারী পর্যন্ত এসেছে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়।” –সহীহ বুখারী ঃ ১/২১, হাদীস ১১০, সহীহ মুসলিম ঃ ১/৭, হাদীস ৩

অন্য হাদীসে আছে ঃ

إن كذبا عليّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

"আমার উপর মিথ্যারোপ করা, অন্য কারো উপর মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"–সহীহ বুখারী ঃ ১/১৭২, হাদীস ১২৯১, সহীহ মুসলিম ঃ ১/৭, হাদীস ৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

من يقل عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.

"যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" –সহীহ বুখারী ঃ ১/২১, হাদীস ১০৯

জাল রেওয়ায়াতের ব্যাপারে এ বাহানাও যথেষ্ট নয় যে, হাদীস জাল করে থাকলে করেছে অন্যজন, আমরা তো শুধু বর্ণনা করছি। কেননা, শরীয়ত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই মিথ্যা প্রচারকারীও মিথ্যাচারীর ন্যায় গুনাহগার ও শাস্তির যোগ্য। হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.

"যে ব্যক্তি আমার বরাতে বুঝে-শুনে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন।" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/৬

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

كفى بالمرأ كذبا أن يحدث بكل ما سمع.

"কেউ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে সবই বর্ণনা করে।" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/৮, হাদীস ৫, সুনানে আবু দাউদ ঃ ২/৬৮১, হাদীস ৪৯৮২

বুঝা গেল জাগতিক কোন ব্যাপারেও সংবাদ শোনামাত্র তা বর্ণনা করা ঠিক নয়; বরং সত্য-মিথ্যা যাচাই করা জরুরী। নতুবা তদন্ত ছাড়া যে কোন শ্রুত কথা প্রচারকারী মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যখন জাগতিক ব্যাপারে এবং সাধারণ সংবাদ সম্পর্কে এমন কড়া নির্দেশ, তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাপারে যাচাই-বাছাইয়ের বিধান কত তাকিদপূর্ণ হবে তা বলাই বাহুল্য!!

Contents

আল্লাহর নবীর নামে কোন কিছু বর্ণনা করতে কত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

"তোমরা আমার নামে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভয় কর। তোমরা যা নিশ্চিত জান (যে তা আমার হাদীস) শুধু তা-ই বর্ণনা কর। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের মর্জি মত মনগড়া তাফসীর করে, সেও যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" –জামে তিরমিযী ঃ ২/১২৩, হাদীস ২৯৫১, (তাফসীর অধ্যায়ের শুরুভাগে)

সুতরাং প্রমাণিত হল, হাদীস বলার পূর্বে এ কথা জেনে নেওয়া জরুরী যে, এটি বাস্তবেও হাদীসে নববী কি না। এ ব্যাপারে অসতর্কতা নবীর উপর মিথ্যারোপ করার শামিল, যার পরিণাম জাহান্নাম।

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয

সারকথা এই যে, নিম্নোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয ঃ

ক–যে কোন কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হল, বর্ণনার পূর্বে যাচাই করে দেখা, তা বর্ণনাযোগ্য কিনা। হাদীসের ব্যাপারটি তো সঙ্গত কারণেই আরো গুরুত্বপূর্ণ।

খ–বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতা মিথ্যারোপের শামিল, যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট নিন্দনীয়। আর হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা তো আরো ভয়ংকর, যা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

Contents

গ–হাদীসের সম্পর্ক দ্বীনের সাথে; বরং এটি দ্বীনের অন্যতম দলীল এবং দ্বীনী বিধানাবলীর ভিত্তি। সুতরাং হাদীসের ব্যাপারে অসতর্কতা দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশা করার নামান্তর। যার অশুভ পরিণতি কারো অজানা নয়।

ঘ–হাদীসের সম্পর্ক সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। তাঁর মর্যাদা সৃষ্টিজীবের মধ্যে সর্বোচ্চ। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে ব্যক্তি যত বড় হয় তাঁর ব্যাপারে মিথ্যারোপ এবং তাঁর বাণী বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতা তত বড় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এ কথাই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ إن كذبا عليّ ليس ككذب على أحدكم.

"আমার ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারো ব্যাপারে মিথ্যারোপ করার মত নয়। (বরং তার ভয়াবহতা সাধারণ মিথ্যারোপ থেকে অনেক অনেক বেশী।)

ঙ–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু দ্বীনী ব্যাপারে ওহী ছাড়া কোন কথা বলতেন না, তাই কোন কথা হাদীসে নববী হওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এটি তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওহী ও পয়গাম। সুতরাং যদি কোন কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেননি; তথাপিও তাঁর বরাত দেওয়া হয়, তাহলে তার মাঝে খারাবী ও ক্ষতি শুধু এতটুকুই নয় যে, এটি রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হচ্ছে; বরং পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার উপরও মিথ্যারোপ করা হচ্ছে। আর আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা কত জঘন্য অপরাধ, তা কারো অজানা নয়।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم،

ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظلمين.

"আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম কে যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষিগণ

বলতে থাকবে, এরাই ঐ লোক যারা আপন পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। সাবধান! যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে।"–সূরা হুদ ঃ ১৮

এসব কারণেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয। এ সতর্কতার একমাত্র পথ এই যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট সেসব কিতাবের নাম জেনে নেওয়া, যেগুলোতে শুধু সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এতদভিন্ন অন্য কিতাব থেকে হাদীস গ্রহণের সময় হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে জেনে নেওয়া যে হাদীসটি সহীহ কি না। উম্মতের সচেতন ব্যক্তিদের মাঝে আজো এ নিয়মই বিদ্যমান আছে।

এ ব্যাপারে যখনই যে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে উলামায়ে কেরাম তা যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন।

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের উর্দূ ফাতাওয়া গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিটি ফত্ওয়া গ্রন্থে হাদীসের একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রয়েছে; যেখানে বিভিন্ন রেওয়ায়াতের মান সম্পর্কে জনমনের বহু প্রশ্নের সমাধান দেওয়া রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ এই কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে ঃ

১–ফাতাওয়া আযীযিয়া, শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১২৩৯ হিঃ)

২–মাজমূআয়ে ফাতাওয়া, আব্দুল হাই লাখনৌভী (রহঃ, মৃত্যুঃ ১৩০৪ হিঃ)

৩–ফাতাওয়া রশীদিয়া, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১৩২৩ হিঃ)

৪–ফাতাওয়া খলীলিয়া, খলীল আহমাদ সাহারানপূরী (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১৩৪৬ হিঃ)

৫–ইমদাদুল ফাতাওয়া, আশরাফ আলী থানভী (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১৩৬২ হিঃ)

৬–আযীযুল ফাতাওয়া, আযীযুর রহমান দেওবন্দী (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১৩৪৭ হিঃ)

৭–কেফায়াতুল মুফতী, মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১৩৭২ হিঃ)

৮–ইমদাদুল মুফতীন, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১৩৯৬ হিঃ)

৯–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১৪১৭ হিঃ)

১০– ফাতাওয়া রহীমিয়া, সৈয়দ আব্দুর রহীম লাজপুরী (রহঃ)
১১–আহসানুল ফাতাওয়া, রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১৪২২হিঃ)

জাল হাদীস চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র খেদমত ছাড়াও আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ বহু স্থানে এরূপ বলেছেন যে, 'অমুক কথাটি কোন বুযুর্গের বাণী, হাদীস নয়।' বিভিন্ন স্থানে তাঁরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত চিহ্নিত করেছেন।

ইমামুল আউলিয়া খাজা নিযামুদ্দীন (রহঃ)-এর মালফূযাত তথা বাণীসংকলণ 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ'-এ আছে ঃ "মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেয বাদায়ূনী তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন ঃ من ليس له شيخ فشيخه الشيطان (যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান) এটি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস? হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) বলেন, না; এটি মাশায়েখের বাণী। মাওলানা সিরাজুদ্দীন পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ من لم ير مفلحا لا يفلح أبدا. (যে ব্যক্তি কোন বুযুর্গের সংশ্রব লাভ করেনি, সে কখনো সফলকাম হতে পারে না) বাক্যটি কি হাদীস? উত্তরে বলেন, এটিও মাশায়েখের বাণী।"[১]

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) মাসআলা-মাসায়েল ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে 'আগলাতুল আওয়াম' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের শুরুতে তিনি লেখেন ঃ

"অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, এমনকি বিশেষ লোকদের মাঝেও কতিপয় এমন ভুল মাসআলা প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে, শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। তারা সেগুলোকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। সেগুলো সম্পর্কে তাদের

১–ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ, আলাউদ্দীন সান্‌জারী, মজলিস নং ১০, যুলকাদাহ ৭১৬ হিঃ–আসসুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল চিশ্‌তিয়াতিল আলিয়্যা, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ঃ ৫৯

বিন্দুমাত্র সন্দেহও হয় না যে, উলামায়ে কেরামের নিকট গিয়ে যাচাই করবে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামেরও সে সব ভুল সম্পর্কে অবগতি নেই যে, তাঁরা সেগুলো সংশোধন করে দিবেন। সুতরাং যখন জনসাধারণের পক্ষ থেকেও যাচাইয়ের আগ্রহ সৃষ্টি হল না এবং উলামায়ে কেরামের দিক থেকেও সতর্ক করা হল না, তখন আর সে সব ভুল-ত্রুটির সংশোধনের কোন পথই অবশিষ্ট থাকল না।

"এই কারণে বহুদিন থেকে সে ভুলগুলো যতদূর সম্ভব একত্রিত করে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল (যা এখন আল্লাহ তা'আলার ফযলে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে)। যেভাবে মুহাদ্দেসীনে কেরাম হাদীসসংক্রান্ত জাল রেওয়ায়াতসমূহ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন; তদ্রূপ এই পুস্তকটি হল মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ভিত্তিহীন কথাবার্তা সম্বলিত।"

আকীদা-বিশ্বাস ও ফিক্হী মাসায়েল সম্পর্কিত ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর আরবী ভাষায় বহু পূর্ব থেকেই রচনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

শাইখ তাজুদ্দীন ফাযারী (মৃত্যু ৭৩১ হিঃ) 'ফিক্হুল আওয়াম ওয়া ইন্কারু উমূরিন ইশ্তাহারাত বাইনাল আনাম' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন; কিন্তু ভারত উপমহাদেশে আমাদের জানা মতে গলত মাসআলার উপর হযরত থানভী (রহঃ)-এর পুস্তকটি সর্বপ্রথম রচনা। গলত ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের (বর্ণনাসমূহের) উপর আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ রয়েছে, যা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি; কিন্তু বাংলা ভাষায় বিশেষত আমাদের দেশে প্রচলিত ভিত্তিহীন জাল রেওয়ায়াতের উপর (আমাদের যতদূর জানা আছে) কোন গ্রন্থ নেই। তাই সাওয়াবের নিয়তে পূর্বসূরীদের এই মুবারক সুন্নাতকে জীবিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থ রচনার এই প্রয়াস। দ্বীন সম্পর্কিত ভুল মাসআলা এবং রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে বানোয়াট ও জাল করার প্রবণতা নস্যাত করার দায়িত্ববোধই মূলতঃ অধিক প্রেরণা যুগিয়েছে। তাছাড়া আকাবের ও বন্ধু মহল উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বার বার এ ধরণের কিতাব রচনা করে সাধারণ পাঠকদের সামনে পেশ করার তাগাদা তো ছিলই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

জাল হাদীসের পরিচয়

৩. 'হাদীস'-এর আভিধানিক অর্থ 'কথা'; কিন্তু পরিভাষায় হাদীস বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত এবং তাঁর কর্ম ও অবস্থাসমূহকে বুঝানো হয়। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, জাল হাদীস, ভিত্তিহীন হাদীস মূলত হাদীসই নয়। কেননা, যদিও তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কেউ মিথ্যারোপ করেছে বা যাচাই ও তদন্ত ছাড়াই বর্ণনা করেছে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা প্রমাণিত নয়। তাঁর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবুও আমরা কথা প্রসঙ্গে বলে থাকি, 'জাল হাদীস', 'ভিত্তিহীন হাদীস'। যেমন বলা হয়ে থাকে 'মিথ্যা নবী' আর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সে নবীই নয়। তেমনিভাবে 'মওযূ হাদীস', 'জাল হাদীস' এবং 'ভিত্তিহীন হাদীস'-এর অর্থ এটি হাদীসে নববীই নয়।

কথা সঠিক হলেই হাদীস হওয়া জরুরী নয়

৪. মওযূ তথা জাল হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত। এক–যার অর্থ ও বিষয়বস্তুই বাতিল। এগুলো হাদীসে নববী হওয়ার কল্পনাই করা যায় না। এ প্রকার মওযূগুলোকে চিহ্নিত করলে তাতে কারো কোন আপত্তি থাকে না। কেননা প্রত্যেকেই জানে যে, বাতিল কথা কোনক্রমেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হতে পারে না।

দুই–কিছু কিছু ক্ষেত্রে জালকারীরা হাদীস জাল করতে গিয়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ তারা একেবারে বাতিল কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বর্ণনা করে প্রথমবারেই নিজকে অপমানিত করার চিন্তা করেনি; বরং সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও হেকমতপূর্ণবাণী অথবা বাহ্যত সুন্দর মনে হয় এমন বাণী নিজ থেকে বানিয়ে বা কোথাও থেকে 'নকল' করে রাসূলের বাণী হিসেবে প্রচার করেছে। এ প্রকার জাল বর্ণনা সাধারণত বে-দ্বীন ওয়ায়েয, বে-দ্বীন সূফী-দরবেশ এবং বে-দ্বীন কিস্‌সা-কাহিনীকাররা তৈরী করেছে।

মিথ্যা সর্বাবস্থায়ই মিথ্যা এবং মিথ্যুক সর্ব অবস্থায় মিথ্যুক। সে যে মুখোশেই সামনে আসুক না কেন–গোপন থাকতে পারবে না। বিশেষ করে দ্বীনের ব্যাপারে। তদুপরি হাদীসে রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যুকদেরকে আল্লাহ তাআলা কখনোই ছাড় দেন না। তাদের মিথ্যা প্রকাশ করেই দেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিজেই দ্বীনের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই সুন্দর উপদেশের নামে রেওয়ায়াত জালকারীরাও হাদীস বিশেষজ্ঞদেরকে ধোঁকা দিতে পারেনি। তাদের বানানো হাদীস জাল হাদীসের কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং জালকারীদের নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় এসে গেছে।

এই দ্বিতীয় প্রকার জাল রেওয়ায়াত সম্পর্কে যদি লোকদেরকে সতর্ক করা হয় তখন কতিপয় কম-ইলম ও বে-ইল্‌ম লোকদের আপত্তি হয় যে, এ কথাটি তো সত্য। এ কথা তো ভাল মনে হয়। এ তো কোন বাতিল, মন্দ বা ভুল কথা নয়; একে তুমি জাল বলছ কেন?

যারা এ ধরণের কথা বলে আসলে মিথ্যার অর্থই তাদের জানা নেই। কেননা জগতবাসী জানে যে, অবাস্তব কথাকেই মিথ্যা বলা হয়। যেমন কারো ব্যাপারে এমন কথা বলেছে বলে দাবী করা হল যা সে বলেনি। একে তার প্রতি মিথ্যারোপ বলা হয়; সে কথা মন্দ হোক আর ভালই হোক।

সুতরাং যে বাণী আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেননি, তা যদিও ভাল হয় বা কারো ভাল মনে হয়; তথাপি কিছুতেই একে রাসূলের বাণী বলা জায়েয হবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে এটা হবে রাসূলের উপর মিথ্যারোপ যা পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপের সমার্থক।

বিষয়টি আরো গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই দ্বিতীয় প্রকার জাল রেওয়ায়াতসমূহ আরো ক্ষতিকর। কেননা প্রথম প্রকারের রেওয়ায়াতগুলো জাল হওয়ার বিষয়টি অতি স্পষ্ট হওয়ার কারণে মানুষ ধোঁকায় পড়ে কম। পক্ষান্তরে এ দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনাসমূহের বিষয়বস্তু বাহ্যত সুন্দর হওয়ায় সাধারণ মানুষ সহজেই প্রতারিত হয় এবং ধোঁকা খায়।

এর চেয়ে বড় কথা হল, এধরনের ভাল ভাল কথা হাদীসের নামে যারা চালিয়ে দিচ্ছে, তারা যেন বলতে চায় যে, "এ কথাগুলো মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর রাসূলের ইরশাদ করা উচিত ছিল। তিনি যখন ইরশাদ করেননি, তখন আমিই তাঁর নামে এগুলো বলে দিচ্ছি।" অথবা পরোক্ষভাবে সে যেন বলতে চায় যে, "রাসূলের মাধ্যমে একথাটি বলানো আল্লাহর উচিত ছিল, তিনি যখন তা করেননি, তখন আমিই আল্লাহর পক্ষ হতে তার রাসূলের নামে তা বলে দিচ্ছি।"

যাহোক, এই আখেরী দ্বীন ও শরীয়ত এবং এর উৎসসমূহ সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ। এতে কারো পক্ষ থেকে কোন ধরনের সংযোজনের প্রয়োজন নেই। জালিয়াতি ও মিথ্যার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

এ কথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কোন কথা সহীহ-শুদ্ধ হওয়া বা শরীয়তের কোন দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা একথা জরুরী নয় যে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হবে। আর আপনি তা হাদীসে নববী হিসেবে বর্ণনা করবেন। যদি তাই হয় তা হলে নির্ভরযোগ্য তাফসীর এবং হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে আয়াত ও হাদীসসমূহের তাফসীর ও ব্যাখ্যায় যা কিছু উল্লেখ আছে সবগুলোকেই হাদীস বলা শুদ্ধ হবে; অথচ সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষই একথা বলবে না; বরং তাকে রাসূলের উপর মিথ্যারোপ হিসেবেই আখ্যায়িত করবে।

এ সম্পর্কে আয়িম্মায়ে দ্বীনের নিম্নোক্ত ইজমাসম্পন্ন, সুস্পষ্ট ও অকাট্য কথাটি সকলের সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখা উচিত ঃ

ليس لأحد أن ينسب حرفا يستحسنه من الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقا، فإن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وليس كل ما هو حق قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فليتأمل هذا الموضع، فإنه مزلة أقدام، ومضلة أفهام.

Contents

"যে কোন কথা ভাল মনে হলেই তাকে হাদীসে রাসূল বানিয়ে দেওয়া কিছুতেই জায়েয হবে না; যদিও কথাটি সঠিক হোক না কেন। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল হাদীসে নববীই হক তথা সত্য; কিন্তু দুনিয়ার সকল সঠিক কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। বিষয়টি ভালভাবে বুঝা উচিত। কেননা, সামান্য অসতর্কতার কারণেই এখানে পদস্খলনের; বরং পথভ্রষ্টতার আশংকা রয়েছে।"[১]

পাঠকদের নিকট আবেদন, এ কথাগুলো ভালভাবে বুঝে নিবেন, যাতে এ কিতাব পড়ার সময় কোন প্রকার পেরেশানী না হয়।

হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন বা কাশ্ফ গ্রহণযোগ্য নয়

৫. বিদআতী ও বে-ইল্ম পীরদের দৌরাত্মের এ যুগে ভয় হয়, যেসব রেওয়ায়াতকে এ কিতাবে হাদীস বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে জাল বা ভিত্তিহীন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কেউ এই হিলা-বাহানা না করে যে, "যদিও এগুলো হাদীস বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে মওযূ তথা জাল; কিন্তু আমি বা আমার পীর সাহেব খাব, কাশ্ফ বা ইল্হামের মাধ্যমে এগুলো সঠিক বলে জানতে পেরেছি।"

১-লিসানুল মীযান, ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ঃ ৫/৩০৬, যাইলুল লাআলিল মাসনূআ, সূয়ূতী (রহঃ) ঃ ২০২, আল মাসনূ ফী মারেফাতিল হাদীসিল মাওযূ (টীকা ঃ শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহঃ) ঃ ২৩৬

وحاصلُ ما في هذا الباب أن الموضوعات على قسمين: قسم معناه باطل فلا بد من أن تكون نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلة، وقسم معناه صحيح ولكن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلة، لعدم ثبوت نسبته إليه وكونه مختلقة عليه. والمدار في كون الموضوع موضوعاً بطلان النسبة لا بطلان المعنى، وهذا يفهمه كل ذي لب آتاه الله العقل السليم، ولئن كانت صحة المعنى كافية لصحة النسبة ونفي الوضع فلم يكن للرد على الكرامية معنى، إذ جوزوا الوضع فى الترغيب والترهيب، ولما أدخل في الوضاعين تلك الطائفة التي تضع الكلام الحسن، أو تاخذ كلام الحكماء والفقهاء والصحابة فتضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان لنفي أهل العلم أن تكون موافقة

Contents

মনে রাখবেন, এসব ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল। হাদীসে রাসূল ছেড়ে কিংবা তা অস্বীকার করে তদস্থলে অন্যদের কথা ও মতকে দ্বীনে অনুপ্রবেশ করানোর পথকে সুগম করার এটি একটি ইবলীসী চক্রান্ত।

مضمون الخبر للواقع دليلا على نفي الوضع، .... وإلى متى أقيم الحجة على بيان البدهيات والضروريات؟!

ومما يؤسف عليه أن بعض المتسبين إلى العلم يغترون بقول بعض أصحاب الكتب الموضوعة، عند الكلام على بعض الأحاديث الموضوعة: «موضوع ولكن معناه صحيح»، فيظنون أن هذا الحديث مروي بالمعنى، ولو كانت ألفاظه الخاصة موضوعة، ثم يبالغ بعضهم فيقولون: إن الرواية بالمعنى كانت شائعة فى الرواة، وجوزها الجمهور بشرائط معلومة، فجعل المروي بالمعنى موضوعاً غلط!!، إذاً فكل ما كان من الموضوعات من هذا القبيل تصح روايته!!

وهذا إلى جانب كونه خارقاً الإجماع ومخالفته لضروريات علوم الحديث وقطعيات الدين الحنيف، سوء فهم منهم لمصطلح كتب الموضوعات، فإن أصحابها لا يريدون بقولهم: «موضوع ولكن معناه صحيح»: أن الخبر المحكوم عليه بهذا اللفظ صحيح مروي بالمعنى، ولو كانت ألفاظه المشهورةُ على الألسنة موضوعة، والعياذ بالله تعالى.

بل المراد أنه موضوع لم ترد فيه رواية صحيحة أصلاً، فلا تصح نسبتُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، وأما أن معناه صحيح غير باطل فهذا يراد به أنه من القسم الثاني من الموضوعات الذي لا يكون معناه باطلاً وإن كانت نسبته باطلة، وهذا واضح لا يشتبه، وأما المروي بالمعنى فلا يطلق عليه وصف الوضع والكذب أبداً، بل حكمه حكم إسناد روايته، بهذا اللفظ كان أو بلفظ آخر، وأكثر ما يحكم على الصحيح المروي بالمعنى إذا كانت الرواية بالمعنى أثرت على أصل المراد أنه معلول باللفظ الذي أنتجته الرواية بالمعنى. ولئن كان من عادتهم –والعياذ بالله تعالى– الحكم على المروي بالمعنى بالوضع مع صحته وسلامته للزمهم الحكم بذلك على طائفة كبيرة من أخبار الآحاد الصحيحة، المروية في «صحيح البخاري» وغيره من كتب الصحاح، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك وحاشاهم، فافهم ولا تزل قدمك في غير مزلة، وانظر ما يأتي في ص ١٠٢-١٠٣ تعليقاً على الحديث ٣٠.

١٠٢ ١٠٢-١٠٣

হাদীস বিশেষজ্ঞগণ শরীয়তের উসূল ও মূলধারার ভিত্তিতেই কোন রেওয়ায়াতের উপর ভিত্তিহীন বা জাল হওয়ার হুকুম আরোপ করে থাকেন। তাই শরীয়তের বিধি মোতাবেক এই হুকুম মেনে নেওয়া একান্ত অপরিহার্য। এর বিপরীতে কারো স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম শরীয়তে ধর্তব্য নয়। উম্মতের ইজমা এবং শরীয়তের অন্যান্য দলীল মোতাবেক এগুলো দ্বীনী ব্যাপারে বিশেষত হাদীসের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে না। এগুলোর পিছনে পড়ার অর্থ-যা দ্বীন নয় তাকে দ্বীন বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।

এখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মান সম্পর্কে দলীলভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে গোড়া থেকেই এই ভ্রান্ত ধারণা খতম হয়ে যায়। ইতিপূর্বে 'তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা' শীর্ষক আমার অন্য আরেকটি কিতাবে উক্ত বিষয় সম্পর্কে দলীলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেটির সারসংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে করছি।

শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মান

কিছু লোকের মধ্যে এমন রোগও রয়েছে যে, খাব-স্বপ্নের প্রতি তাঁরা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ভাল স্বপ্ন কম দেখতে পাওয়াকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হতে দূরে সরার আলামত মনে করে। ভাল স্বপ্ন দেখলে তাসাওউফ ও সুলূকের আসল উদ্দেশ্য হাছিল হয়েছে ভেবে গর্ববোধ করতে থাকে। উত্তরোত্তর ভাল স্বপ্ন দেখার লালসায় থাকে। আর কোন মন্দ স্বপ্ন দেখলে পেরেশান হয়ে যায়; অথচ শরীয়তে স্বপ্নের এমন কোন মর্যাদা নেই; যার কারণে একে আসল উদ্দেশ্য মনে করা যায়।

আরো আফসোসের কথা এই যে, কতক মানুষ অজ্ঞতাবশ স্বপ্নকে শরীয়তের দলীলের মর্যাদা দিয়ে থাকে। নিজের স্বপ্ন, পীর সাহেবের স্বপ্ন বা অন্য কোন ব্যক্তির স্বপ্নকে কোন নির্দিষ্ট আমল, অভিমত ইত্যাদির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ রূপে পেশ করে থাকে। স্বপ্নের ভিত্তিতে কাউকে পীর মনোনীত করে থাকে।

অথচ দ্বীনের কোন মাসআলাতেই শরীয়ত স্বপ্নকে দলীলের মর্যাদা দেয়নি। দুনিয়াবী ব্যাপারেও স্বপ্ন মোতাবেক আমল করার জন্যে এ শর্তারোপ করেছে যে, স্বপ্নের বিষয়বস্তু কুরআন হাদীস বা শরীয়তের অন্য কোন দলীলের পরিপন্থী যেন না হয় এবং সে মোতাবেক আমল করতে গিয়ে শরীয়তের কোন মূলনীতি যেন লঙ্ঘিত না হয়।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان. فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، ولا تضره، ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحبه.

"ভাল স্বপ্ন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে বামদিকে থুথু দেবে, আল্লাহ তাআলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করবে। তা হলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং এ দুঃস্বপ্নের কথা কারো কাছে বলবেও না। আর ভাল স্বপ্ন দেখলে সুসংবাদ গ্রহণ করবে এবং এ স্বপ্নের কথা একান্ত বর্ণনা করতে হলে প্রিয়জনদের নিকটই বর্ণনা করবে।"–সহীহ মুসলিম ঃ ২/২৪১, হাদীস ৫৮৫৬

অন্য হাদীসে আছে ঃ

الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرأ نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل، ولا يحدث بها الناس.

"স্বপ্ন তিন প্রকার। এক, ভাল স্বপ্ন–এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সুসংবাদস্বরূপ। দুই, শয়তানের পক্ষ হতে উদ্বেগসৃষ্টকারী স্বপ্ন। তিন, কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। তোমাদের কেউ যদি স্বপ্নে অপ্রীতিকর কিছু দেখে তা হলে সে যেন উঠে নামায আদায় করে এবং মানুষের কাছে তা বর্ণনা না করে।"–সহীহ মুসলিমঃ ২/২৪১, হাদীস ৫৮৫৯, জামে তিরমিযীঃ ২/৫৩ হাদীস ২২৭০

এ হাদীস দু'টির আলোকে স্বপ্নের বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, ভাল স্বপ্নও সুসংবাদই মাত্র, কোন দলীল নয়। আর এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, স্বপ্ন কোন দলীল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, যদি কোন প্রকারের স্বপ্ন দলীল হতে পারত, তা হলে শুধু প্রথম প্রকারটিই হত যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হয়ে থাকে। তবে কোন স্বপ্নটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে, শরীয়ত এর কোন পরিচয় দেয়নি। শুধু এতটুকুই বলেছে যে, যেটি ভাল সেটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আর এ কথা সকলেই জানে যে, পার্থিব ব্যাপারে মানুষ যদিও ভাল-মন্দ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারে; কিন্তু দ্বীনী ব্যাপারে ভাল-মন্দ নির্ধারণ শরীয়তের কোন দলীল ব্যতীত সম্ভব নয়। এ জন্যে কোন স্বপ্নকে ভাল বা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়েছে বলতে গেলে শরীয়তের কোন না কোন দলীলের আশ্রয় নিতেই হবে। কাজেই স্বপ্ন কোন স্বতন্ত্র দলীল হতে পারে না।

উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত হাদীসে মন্দ স্বপ্নের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য যে, শরীয়ত পরিপন্থী কথা বা শরীয়তবিষয়ক দলীলবিহীন কথা নিশ্চয়ই মন্দ। এ প্রকার স্বপ্ন হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী নিশ্চিতভাবে শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করল, সে যেন প্রকারান্তরে শয়তানের কথা দ্বারাই প্রমাণ পেশ করল। আর নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

من رآني فى المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي.

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে সত্যই আমাকে দেখল। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।" [১]

এর মধ্যে যদিও দেখার সত্যতার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু কথা ঠিক ঠিকভাবে শোনা, সঠিকভাবে বুঝা এবং জাগ্রত হওয়ার পর যথাযথ স্মরণ থাকা, সেগুলোর কোনটির সত্যতা অথবা তাতে শয়তানের কোন প্রকার প্রভাব না থাকার নিশ্চয়তা এ হাদীসে দেওয়া হয়নি।

১-সহীহ বুখারী ঃ ২/১০৩৬, হাদীস ৬৯৯৪, সহীহ মুসলিম ঃ ২/২৪২, হাদীস ৫৮৭৩

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) উল্লেখ করেন ঃ এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বলছেন, اشرب الخمر। তুমি মদপান কর।"

তখন আলী আল-মুত্তাকী (রহঃ, মৃত্যু ৯৭৫ হিঃ) জীবিত ছিলেন। তাঁর নিকট তা'বীর জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لا تشرب الخمر। 'তুমি মদপান করো না।' আর শয়তান তোমার নিকট ব্যাপারটি পাল্টে দিয়েছে। তাছাড়া ঘুমের সময় ইন্দ্রীয় ও অনুভূতি শক্তি লোপ পায়। জাগ্রত অবস্থায়ই যেহেতু কোন বহিরাগত কারণ বা শ্রোতার নিজের কারণে বক্তার বক্তব্যের বিপরীত শ্রবণ করার সম্ভবনা থাকে। সুতরাং নিদ্রিত অবস্থায় তা আরো স্বাভাবিক।"[১]

যাহোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অসিয়ত করেছেন ঃ

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ، كتاب الله وسنة نبيه.

"আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম, যতদিন তা আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এক ঃ আল্লাহ তাআলার কিতাব, দুই ঃ তাঁর নবীর সুন্নাত।"—মুআত্তা ইমাম মালেক (রহঃ) ঃ ৩৬৩, তামহীদ ২৪/৩৩১

তিনি এ কথা ইরশাদ করেননি যে, তোমরা স্বপ্নযোগে আমার পক্ষ থেকে যা লাভ করবে সে মোতাবেক আমল করবে; স্বপ্নের দ্বারা কুরআন-হাদীস বর্জন করবে অথবা স্বপ্নের ভিত্তিতে নতুন নতুন কথা দ্বীন-ইসলামে দাখেল করবে। নাউযুবিল্লাহ।

মোটকথা, স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত বিষয়াবলীর সত্য-মিথ্যা নিরূপণের জন্যে শরীয়ত যেহেতু শরীয়ত ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র কোন মানদণ্ড নির্ধারণ করেনি, কাজেই এটি শরীয়তের কোন স্বতন্ত্র দলীল হতে পারে না; বরং শরীয়তের আলোকেই তার যাচাই-বাছাই হবে। তা ছাড়া স্বপ্ন তো স্বপ্নই। এ মর্মে

১–ফয়যুল বারী ঃ ১/২০৩, শরহু মুসলিম লিন্নববী ঃ ১/১৮, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ঃ ৪/৪৫২-৪৫৩

সকল বিবেকবানদের ঐকমত্য রয়েছে যে, স্বপ্ন পার্থিব কর্মকান্ডেও কোন গুরুত্ব রাখে না। সুতরাং স্বপ্নকে শরীয়তের কোন বিষয়ে দলীল গণ্য করা একই সাথে বিবেক ও শরীয়তের বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম

কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামকেও কতিপয় তথাকথিত তরীকতপন্থী বড় করে দেখে। কাশ্‌ফের মাধ্যমে কোন কথা জানতে পারাকে বুযুর্গীর সনদ মনে করে থাকে। আর কেউ কেউ তো কাশ্‌ফ ও ইলহামকে শরীয়তের দলীলই মনে করে এবং শুধু কাশ্‌ফ ও ইলহাম অর্জন করার জন্যে সুন্নাত নয়, এমন অনেক মুজাহাদায় লিপ্ত হয়; অথচ কুরআন-হাদীসে কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামকে দ্বীনী ব্যাপারে কখনো দলীলের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডেও কাশ্‌ফ বা ইলহামের উপর আমল করার জন্যে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, সেগুলোর বিষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহ বা শরীয়ত পরিপন্থী যেন না হয় এবং সে মোতাবেক আমল করতে গিয়ে শরীয়তের কোন ধারা যেন খণ্ডিত না হয়।

কাশ্‌ফের পরিচয়

অদৃশ্য জগতের কোন কথা প্রকাশিত হওয়াকে কাশ্‌ফ বলা হয়। এ কাশ্‌ফ কখনো সঠিক হয়, আবার কখনো মিথ্যা হয়। কখনো বাস্তবসম্মত হয়, কখনো বাস্তব পরিপন্থী হয়। তাই এটি শরীয়তের কোন দলীল তো নয়ই; উপরন্তু একে শরীয়তের দলীলের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী।

এমনিভাবে কাশ্‌ফ ইচ্ছাধীন কোন কিছু নয় যে, তা অর্জন করা শরীয়তে কাম্য হবে অথবা সাওয়াবের কাজ হবে। অনুরূপ কাশ্‌ফ হওয়ার জন্যে বুযুর্গ হওয়াও শর্ত নয়। বুযুর্গ তো দূরের কথা, মুমিন হওয়াও শর্ত নয়। কাশ্‌ফ তো ইবনুস সায়্যাদের মত দাজ্জালেরও হত। সুতরাং কাশ্‌ফ বুযুর্গ হওয়ারও দলীল হতে পারে না।[১]

১–মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশ্‌ফি ওয়াররুইয়া ঃ ১১-১১৪, রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৭-১৯, শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম ঃ ১৯১-১৯২, শরীয়ত ও তরীকত ঃ ৪১৬-৪১৮, আত-তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ঃ ৩৭৫, ৪১৯

এ ব্যাপারে তাসাওউফ শাস্ত্রের ইমাম শাইখ আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ, মৃত্যু ২০৫ হিঃ)-এর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة.

"প্রায়ই আমার অন্তরে তাসাওউফের কোন ভেদতত্ত্ব উদয় হয়; কিন্তু আমি তা নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদ্বয়–কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসুল-এর সাক্ষ্য ব্যতীত গ্রহণ করি না।" –সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ৮/৪৭৩

এ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) তাঁর মাকতূবাতে বলেন, "ওয়াজ্‌দ ও হাল তথা তাসাওউফের বিশেষ অবস্থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের নিক্তিতে পরীক্ষা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সামান্য মূল্যও রাখে না। অনুরূপ কাশ্‌ফ-ইল্‌হামকে কিতাব ও সুন্নাতের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের পূর্ব পর্যন্ত অর্ধ যবতুল্য হওয়াও পছন্দ করি না।" –ইরশাদাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী ঃ ১২৪, মাকতূব নং ২০৭

ইল্‌হাম

ইলহামের পারিভাষিক অর্থ হল চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই কোন কথা অন্তরে উদ্রেক হওয়া। ইল্‌হাম কাশ্‌ফেরই প্রকার বিশেষ। ইল্‌হাম সহীহ্‌ হলে তাকে ইল্‌মে লাদুন্নীও বলা হয়ে থাকে; কিন্তু কথা হল স্বপ্নের ন্যায় ইল্‌হামও কখনো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে হয় এবং কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যে ইলহাম শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম সম্পর্কিত নয় এবং তার বিষয়বস্তু শরীয়ত পরিপন্থীও নয় বা যে ইলহাম শরীয়তের কোন হুকুম-আহ্‌কাম সম্পর্কিত; কিন্তু তার পক্ষে শরীয়তে দলীলও বিদ্যমান আছে–শুধু এধরনের ইলহামকেই সহীহ ইলহাম বলা হবে এবং ধরা হবে যে, এটি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত বলে পরিগণিত হবে, এ ব্যাপারে তাঁর শোকর আদায় করা দরকার। আর যদি ইল্‌হামে উপরোক্ত শর্তগুলো না পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে তা

শয়তানের প্রলাপমাত্র। এ ধরনের ইল্‌হাম থেকে বিরত থাকা এবং তা থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা ফরয।[১]

হাদীস শরীফে আছে ঃ

إن للشيطان لمة، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله، ومن وجد من الآخر، فليتعوذ من الشيطان الرجيم، ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا.

"নিশ্চয় মানুষের অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকেও ভাবের উদ্রেক হয়, ফেরেশতার পক্ষ থেকেও ভাবের উদ্রেক হয়। শয়তানের উদ্রেক হল মন্দ ওয়াদা এবং সত্য অস্বীকার করা। ফেরেশতার উদ্রেক হল, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান এবং হকের সত্যায়ন করা। যে ব্যক্তি এটি অনুভব করবে, তাকে বুঝতে হবে যে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। তাই তাঁর প্রশংসা করা উচিত। আর যে ব্যক্তি অন্যটি অনুভব করবে, তার উচিত বিতাড়িত শয়তান থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করা। এরপর তিনি (সূরা বাকারার ২৬৮ নং) আয়াত পাঠ করেন। অর্থাৎ শয়তান তাদের অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।"[২]

এ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ইল্‌হাম কখনো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়; আবার কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই ইল্‌হাম হক ও বাতিলের মাপকাঠি হতে পারে না এবং শরীয়তের কোন দলীল হতে পারে

১–ফাতহুল বারী ঃ ১২/৪০৫ কিতাবুত্তাবীল, বাব ১০, রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৬-২২, তাবসিরাতুল আদিল্লা ঃ ১/২২-২৩, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইল্‌হাম ওয়াল কাশ্‌ফি ওয়াররুইয়া ঃ ১১-১১৪

২–সুনানে নাসায়ী কুবরা ঃ ৬/৩০৫, হাদীস ১১০৫১, জামে তিরমিযী ঃ ২/১২৮, হাদীস ২৯৮৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ঃ ৩/২৭৮, হাদীস ৯৯৮

না। তা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ইল্‌হাম হওয়ার আলামত শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তা হক ও ভাল। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হক ও ভালোর একমাত্র মাপকাঠি হল কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল।

ফিক্‌হ ও আকাইদ শাস্ত্রের আইম্মায়ে কেরাম ছাড়াও হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম শরীয়তের কোন দলীল নয়; বরং শরীয়তের অন্যান্য দলীলের আলোকে কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের বিচার-বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। ইতোপূর্বে কাশ্‌ফের আলোচনায় ইমাম আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) এবং মুজাদ্দেদে আলফে সানীর (রহঃ) গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সূফিয়ায়ে কেরামের ইমাম শাইখ আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহঃ, মৃত্যু ৯৭৩ হিঃ) বলেন ঃ

قد زل في هذا الباب خلق كثير فضلوا وأضلوا، ولنا في ذلك مؤلف سميته: «حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام»، وهو مجلد لطيف.

"এ ক্ষেত্রে (ইল্‌হামকে দলীল মনে করতঃ) বহু লোকের পদস্খলন ঘটেছে। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। এ বিষয়ে আমি একটি বইও লিখেছি যার নাম হল, 'হদ্দুল হুসাম ফী উনুকি মান আত্‌লাকা ঈজাবাল আমালি বিল ইল্‌হাম।"–রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৭

সূফিকুল শিরোমণি শাইখ সারী সাকাতী (রহঃ, মৃত্যু ২৫৩ হিঃ) বলেন

من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط

"যে ব্যক্তি এমন বাতেনী ইলমের (ইল্‌হাম) দাবী করে, যাকে যাহেরী শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে সে ব্যক্তি ভ্রান্তির শিকার।" –রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯

ইমাম আবূ সাঈদ খাররায সূফী (রহঃ, মৃত্যু ২৭৭ হিঃ) বলেন ঃ

كل فيض باطن يخالفه ظاهر فهو باطل.

"যে সকল বাতেনী ফয়েয (ইল্‌হাম) যাহেরের (শরীয়তের) পরিপন্থী, তা ভ্রান্ত।"–রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯

স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম সম্পর্কে একটি সর্বজনবিদিত মৌলিক কথা মনে রাখতে হবে যে, এগুলো সবই ইচ্ছাশক্তির বাইরের বস্তু। কাজেই এগুলো শরীয়তের ভিত্তি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং শরীয়তের কাম্য বস্তুও হতে পারে না। যদি শরীয়তে এগুলো কাম্য হত, তবে আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মানুষের ইচ্ছাধীন বানিয়ে দিতেন। তা ছাড়া যদি এগুলো হাছিল হয়েও যায়, তবু সেগুলোর সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য শরীয়তের দলীল ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই; তাই মূল ভিত্তি শরীয়তের দলীলের উপরই হল, খাব-কাশ্‌ফ-ইল্‌হামের উপর নয়।

খাব-কাশ্‌ফ-ইল্‌হাম যদি শরীয়তের দলীল হত, তাহলে এগুলো অর্জন করার নির্দেশও দেওয়া হত; অথচ কুরআন-হাদীসে এগুলো অর্জনের নির্দেশ তো দূরের কথা, এগুলোর প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্যে একটি হরফও বিদ্যমান নেই। অথচ শরীয়তের ইল্‌ম অর্জন করার তাকিদ-উৎসাহ এবং শরীয়তে ইল্‌ম থেকে দূরে থাকার পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারিসংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত-হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

উম্মতের কারো খাব-কাশ্‌ফ-ইল্‌হাম যদি দলীল হত, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে দ্বীনের খাব-কাশ্‌ফ-ইল্‌হামই দলীল হত; কিন্তু তাঁদের কেউ কখনো দ্বীনী মাসআলার ব্যাপারে এ সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি এবং এর ভিত্তিতে দ্বীনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধান থেকেও বিমুখ হননি। তাঁদের সম্মুখে যখন শরীয়তের কোন দলীল তুলে ধরা হত; তখন তাঁরা কখনো একথা বলতেন না যে, আমি তো কাশ্‌ফ-ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে এর বিপরীত জানতে পেরেছি।

এই হল শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইলহামের অবস্থান। যদি এটি ভালভাবে বুঝে এসে থাকে, তা হলে কোন দ্বীনী ব্যাপারে বিশেষত হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের মত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেউ এগুলো প্রমাণ হিসেবে পেশ করার কথা কল্পনাই করতে পারবে না।

বিশেষত স্বপ্ন, কাশফ বা ইলহামের ভিত্তিতে হাদীসের শুদ্ধতা যাচাই করা এ জন্যেও নাজায়েয যে, তা হাদীস ও রেওয়ায়াত যাচাই সম্পর্কিত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিধিবিধান পরিপন্থী। কেননা ঃ

ক–কুরআন ও সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে রেওয়ায়াতের মান নির্ণয়ের ভিত্তি হল রাবী তথা বর্ণনাকারীদের অবস্থা–কোন স্বপ্ন, কাশ্ফ বা ইলহাম নয়।

খ–রেওয়ায়াত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কুরআন কারীম ও সুন্নাতে নববীর নির্দেশ হল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া–স্বপ্ন, কাশ্ফ বা ইল্হামওয়ালার নিকট যাওয়া নয়।

গ–সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন ও গোটা উম্মতের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, হাদীস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্যে বাহ্যিক রেওয়ায়াত ও নির্ভরযোগ্য সনদ থাকা একান্ত জরুরী। এ ব্যাপারে স্বপ্ন, কাশ্ফ বা ইলহাম ধর্তব্য নয়।

ঘ–এ ব্যাপারে সকল ইমামের ইজমা যে, হাদীস জানার জন্যে হাদীস গ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী এবং হাদীস যাচাইয়ের জন্যে হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়া অপরিহার্য। এ সম্পর্কে কাশ্ফওয়ালা বুযুর্গের কাশ্ফভিত্তিক রায় ধর্তব্য নয়।

ঙ–বিশেষত হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরাম হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে হাদীস বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়াকে জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। কোন হক্কানী সূফী দ্বীনী মাসআলা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকেননি। তাঁরা কখনো স্বপ্ন, কাশ্ফ বা ইলহামকে ফয়সালার মাপকাঠি বানাননি এবং এ কথা বলেননি যে, "শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে যদিও এ হাদীস জাল; কিন্তু আমি বাতেনী নূরের মাধ্যমে তা সঠিক বলে জানতে পেরেছি!"

চ–এ কথা সুস্পষ্ট যে, হাদীসের সহীহ-যয়ীফ তথা মান নির্ণয়ের ভিত্তি যদি স্বপ্ন, কাশ্ফ বা ইলহাম হত, তা হলে উসূলে হাদীসসংক্রান্ত ইল্মের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না উসূলে ফিক্হের সুন্নাত অধ্যায়ের এবং রিজাল-শাস্ত্র জ্ঞানের এবং জাল, দুর্বল ও মাতরূক রেওয়ায়াত সম্পর্কিত

শাস্ত্রসমূহের। তাবেঈদের স্বর্ণযুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত উক্ত বিষয়গুলোর শত শত নয়; বরং হাজারো এমন কিতাব রচিত হয়েছে, যেগুলো ইজমার ভিত্তিতে উক্ত বিষয়সমূহের উৎস এবং ফয়সালার ভিত্তির মান রাখে। যদি এর ভিত্তি স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইলহাম হত, তা হলে হাদীস যাচাই ও শুদ্ধতা নির্ণয়ের কাজ মুজ্‌তাহেদীনের হাতে ন্যাস্ত হত না। সূফিয়ায়ে কেরামের হাতেই থাকত এবং এ ব্যাপারে একেক জনের একেক রকম রায় থাকত। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইলহামের ভিত্তিতে ফয়সালা করত।

বলাবাহুল্য, যদি ব্যাপারটি এমনই হত তা হলে এর চেয়ে বলগাহীনতা আর কিছুই হত না! কিংবা দ্বীনের উৎসসমূহ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করার এর চেয়ে নিকৃষ্ট পদ্ধতি আর কিছুই হত না![১]

আলোচনা দীর্ঘ না করে এ পর্যায়ে দু'একজন হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করছি।

আপন যুগের সূফীকুল শিরোমণি, 'রিয়াযুস সালেহীন' প্রণেতা ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন ঃ

لا تبطل بسبب المنام سنة ثبتت، ولا تثبت به سنة لم تثبت، هذا بإجماع العلماء.

---

(١) أدلة هذه النقاط الستة واضحة للغاية عند من تأملها مع الرجوع إلى كتب الفن، ولا حاجة إلى بسط الكلام عليها، غير أني أنبه على أمر، هو أنك تجد في كلام بعض المشايخ المحققين، في بعض المواضع ذكر الإلهام في مجال التصحيح، ولكن ذلك فيما إذا لم تكن الرواية واهية أو باطلة، بل ضعيفة تأيدت بالقرائن فكان ذكر الإلهام هناك لمجرد التائيد، وقد يذكرون ذلك استطرادا لا احتجاجا حاشا وكلا، كما يذكرون الرؤيا في المجال العلمي لهذا الغرض فقط، فلا تغترن بذلك. وأما من احتج بمجرد الإلهام فهو بمخالفة الشرع مأزور، أو لجهله معذور، وكل منهما ساقطان عن موضع القدوة. فافهم ذلك جيدا. واعلم أن شرع الله أحق بالغيرة من الغيرة على آحاد الأمة، الذين لم تكتب لهم العصمة.

"স্বপ্নের ভিত্তিতে কোন প্রমাণিত হাদীস বাতিল হতে পারে না এবং কোন অপ্রমাণিত হাদীস স্বপ্নের ভিত্তিতে প্রমাণিত হতে পারে না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।" –শরহু সহীহে মুসলিম ঃ ১/১৮

সূফী আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ عليش (রহঃ) 'ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক'–এ তাঁর শাইখ আবূ ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

من المعلوم لكل أحد أن الأحاديث لا تثبت إلا بالأسانيد، لا بنحو الكشف وأنوار القلب،...، والولاية والكرامات لادخل لها هنا، إنما المرجع للحفاظ العارفين بهذا الشأن.

"এ কথা সর্বজনবিদিত যে, হাদীস সনদের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, কাশ্‌ফ, বাতেনী নূর ইত্যাদির মাধ্যমে নয়। এ ক্ষেত্রে বুযুর্গী বা কারামতের সামান্যতম দখল নেই; বরং এ শাস্ত্রে পারদর্শী হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এর একমাত্র উৎস।" –ফাত্হুল আলিয়্যিল মালিক ঃ ১/৪৫–আল মাসনূ ফী মারেফাতিল হাদীসিল মাওযূ ঃ ২১৬ (টীকা)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

হাদীস প্রমাণে শুধু বুযুর্গের উদ্ধৃতি যথেষ্ট নয়

৬–স্বপ্ন কাশ্‌ফ বা ইলহামের ভিত্তিতে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের প্রচার-প্রসারের অপচেষ্টা একমাত্র বিদআতী, ভণ্ড ও মূর্খরাই করতে পারে। তবে একটি ব্যাপারে কোন কোন তালেবে ইলমেরও সংশয় হতে পারে যে, এমন কতিপয় রেওয়ায়াত রয়েছে, যা সকল হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে জাল; কিন্তু এমন বুযুর্গানে দ্বীনের কিতাবে তা স্থান পেয়েছে, যাঁরা আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। হাদীসের তাহকীক ও যাচাই কাজে যদিও তাঁদের তেমন উচ্চ মরতবা ছিল না; কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের ইমাম ছিলেন।

'যদি এ সব রেওয়ায়াত জালই হত তা হলে এই বুযুর্গগণ কীভাবে সেগুলোকে নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।'

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ প্রশ্ন যথার্থ নয়। আসল কথা হল যে, আল্লাহ তাআলা সাধারণত এক ব্যক্তির মধ্যে সকল বিদ্যার যোগ্যতা ও পূর্ণতা দান করেন না। তাই এও সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি বুযুর্গী, তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধিতে উৎকর্ষের শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে গেলেন; কিন্তু রেওয়ায়াত যাচাই কার্যে সময় ব্যয় করার এবং এই বিদ্যার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার সুযোগ তাঁর হল না। তাই কোন এক কিতাবে কোন হাদীস বর্ণিত দেখে অথবা কারো কাছে শোনে সুধারণার কারণে একে সহীহ মনে করেছেন আর যাচাই করার খেয়াল হয়নি। এ সব কারণে উক্ত বুযুর্গদের কিতাবে কতক জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত এসে গেছে। জেনে-শুনে তাঁদের থেকে এ ধরনের কাজের কল্পনাও করা যায় না।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) 'আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ'–এ সহীহ বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ঃ

إن من أعظم الفرى أن يقول الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل.

"এটা বড় জঘন্য মিথ্যা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে এমন কথা বলা হবে, যা তিনি বলেননি।" –সহীহ বুখারী ঃ ১/৪৯৮, হাদীস ৩৫০৯

এরপর হযরত থানভী (রহঃ) লেখেন ঃ "যদি প্রবল সুধারণার কারণে কারোর সন্দেহই না হয় যে, বর্ণনাকারীরা ভুল বর্ণনা করেছেন, তা হলে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। কোন কোন বুযুর্গের বেলায় এরূপই ঘটেছে। এভাবেই তাঁদের বাণী ও লেখনীতে কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে যদি উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক করার পরও কেউ

উক্ত প্রকারের হাদীস বর্ণনায় অটল থাকে, যেমনটি অধিকাংশ জ্ঞানপাপীদের অভ্যাস, তা হলে তাকে দোষমুক্ত মনে করার কোন অবকাশ নেই।"[১]

বর্ণনাকারীদের প্রতি প্রবল সুধারণার কারণে যে সব বুযুর্গের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের অজান্তে জাল হাদীস এসেছে বলে থানভী (রহঃ) ইঙ্গিত করেছেন, উলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী সেসব বুযুর্গদের মধ্যে বড় পীর শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এবং ইমাম গায্যালী (রহঃ)ও রয়েছেন।

শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) রচিত 'গুনয়াতুত তালেবীন' সম্পর্কে 'নিবরাস'–এর স্বনামধন্য গ্রন্থকার আল্লামা আব্দুল আযীয ফারহারভী (রহঃ) বলেন ঃ الأحاديث الموضوعة في غنية الطالبين وافرة "গুনয়াতুত তালেবীনে অনেক মাওযূ (জাল) হাদীস রয়েছে।" –নিবরাস ঃ ৪৭৫

শাইখুল হাদীস আল্লামা সরফরায খান সফদর 'ইত্‌মামুল বুরহান ফী রদ্দি তাওযীহিল বয়ান' গ্রন্থে বলেন ঃ

"নিঃসন্দেহে হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁর যুগের বড় বুযুর্গ, কারামতবিশিষ্ট ওলী, ইস্‌লাহের পাঠদানকারী এবং একজন সুবক্তা ছিলেন। তবে তিনি রিজাল শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন না। হাদীসের সহীহ-যয়ীফকে মুহাদ্দেসীনে কেরামের ন্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন না। মুহাদ্দেসগণ হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে থাকেন। পক্ষান্তরে সূফিয়ায়ে কেরাম স্বভাব-সরলতার কারণে মানুষের প্রতি অত্যধিক সুধারণা পোষণ করে থাকেন। নিজেদের পবিত্র এবং নির্মল অন্তঃকরণের ন্যায় অন্যদের ব্যাপারেও এ ধারণা করেন যে, সকল বর্ণনাকারীগণও তেমনিই হবেন। এ জন্যে তাদের ব্যাপারে তলিয়ে দেখতে যান না।" –ইতমামুল বুরহান ঃ ২৮১

ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) নিজেই তার 'কানূনুত তাবীল'-পুস্তিকায় বিনয়স্বরূপ নয়; বরং বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন ঃ بضاعتي في الحديث مزجاة "ইলমে হাদীসে আমার পুঁজি সামান্য।" পৃষ্ঠা-১৬

১–আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ঃ ৪০৩, হাদীস ২৬৩

উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে 'ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন'—এ অনেক জাল হাদীস রয়েছে।

এ ব্যাপারে ইমাম মাযারী, ইমাম আবূ বকর তুরতুশী, ইমাম যাহাবী, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল্লামা সুয়ূতী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা যাবীদী, আল্লামা লাখনোভী (রহঃ) প্রমুখ সতর্ক করেছেন।[১]

যেহেতু ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন—এ সহীহ হাদীসের সাথে বাতিল, মাওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতও রয়েছে, যার সংখ্যা একেবারে কম নয়, এই জন্যে মুহাদ্দেসীনে কেরাম ভিন্ন কিতাব রচনা করে সেগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন ঃ একটি কিতাব 'ইহ্ইয়া' (আরবী)—এর টীকায় ছাপানো আছে, যার নাম 'আল-মুগনী আন হাম্লিল আস্ফার ফিল আস্ফার বিতাখ্রীজি মা-ফিল ইহ্য়াই মিনাল আহাদীসি ওয়াল আখবার।"

যারা বাংলায় ও অন্যান্য ভাষায় ইহ্য়াউল উলূমের অনুবাদ করেছেন তাদের উচিত ছিল মুহাদ্দেসীনে কেরামের সেসব কিতাবের সহযোগিতা নিয়ে সে সব বাতিল, মাওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতগুলো তরজমা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া (এবং অনুবাদকের ভূমিকায় তা উল্লেখ করে দেওয়া) অথবা টীকার মধ্যে সে সব রেওয়ায়াতগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া; কিন্তু আফসোস! তাঁরা তা করেননি।

যাহোক উপরোক্ত গ্রন্থাবলীতে লেখকের অজান্তে জাল হাদীস প্রবেশ করায় গ্রন্থকারের মর্যাদাহানী হবে না এবং গ্রন্থও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্যতা হারাবে না। তবে উক্ত কিতাবগুলোতে কোন হাদীস আছে বলেই চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করা যাবে না; বরং তার শুদ্ধতা জানার জন্যে হাদীস বিশেষজ্ঞদের *শরণাপন্ন হওয়া জরুরী।*

---

[১]—উক্তিসমূহের জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১৪/৩৩০, ৩৩২, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১০/৫৫২, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ১/২৮, আল-আজবিবাতুল ফাযিলা ঃ ৩৫, আত-তা'লীকাতুল হাফিলা ঃ ১১৮—১২০, মুকাদ্দিমাতু মুকাদ্দিমাতি কিতাবিত্তালীম ঃ ৪৮—৫৩

থানভী (রহঃ) 'তালীমুদ্দীন' –এ হাদীস বর্ণনায় অসতর্কতার নিন্দা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"একটি ত্রুটি হল এই যে, হাদীস বয়ান করতে গিয়ে নেহায়েত অসতর্কতা অবলম্বন করা হয়। হাদীসের যাচাই-বাছাই মুহাদ্দেসীনের নিকট করা উচিত। উর্দূ, ফারসী বা আরবী অনির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে হাদীসের নাম পেয়ে তা দিয়েই দলীল-প্রমাণ পেশ করা কিছুতেই সমীচীন হবে না। এমন অনেক আশ্চর্য উক্তি আছে যেগুলোর কোন ভিত্তিই নেই; কিন্তু লোক মুখে সেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে। যেমন [১] أنا عـرب بلا عيـن

এ ধরনের আরো বহু উক্তি আছে, যেগুলোর শব্দ ও অর্থগত কোন ভিত্তিই নেই। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফেও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

–তা'লীমুদ্দীন–ইসলাহী নেসাব ঃ ৩০৪–৩০৫

হাদীস যাচাইয়ের ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হবে, এটি এমন এক বিষয় যে ব্যাপারে পুরো উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরামও উক্ত ইজমার অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কুরআন হাদীসেরও নির্দেশ তা-ই যে, প্রত্যেক মাসআলায় সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হবে।

যুগশ্রেষ্ঠ সূফী শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আহমাদ শারানী (রহঃ, ইন্তেকাল ৯৭৩ হিঃ) 'উহুদে কুবরা' গ্রন্থে বলেন ঃ

১–অর্থাৎ আমি عين বিহীন আরব (عرب), যার অর্থ দাঁড়ায় আমি رب (প্রভু)। এই হল মিথ্যুক, দাজ্জাল ও ধর্মদ্রোহীদের অবস্থা, যারা রাসূলেরই ভাষায় রাসূলকে প্রভু প্রমাণ করছে। কোন কোন নাস্তিক ও বে-দ্বীন এরূপ জাল হাদীসও বানিয়েছে যে أنا أحمد بلا ميم অর্থাৎ, আমি মীমবিহীন আহমাদ, যার মানে হয় আমি أحد (একক প্রভু)। ওদের উপর আল্লাহ তা'আলার লানত বর্ষিত হোক।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদের সকলের ব্যাপক অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, আমরা হাদীস রেওয়ায়াতের ব্যাপারে যেন দুঃসাহসিকতার পরিচয় না দেই; বরং তাঁর থেকে বর্ণিত সকল হাদীসের ব্যাপারে যেন সতর্কতা অবলম্বন করি এবং তাঁর নামে একমাত্র প্রমাণিত হাদীসগুলোই যেন বর্ণনা করি।"

তিনি আরো বলেন ঃ "হে আমার প্রিয় ভাই! ভালভাবে জেনে রাখুন যে, হাদীস রেওয়ায়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেওয়া উক্ত অঙ্গীকারের সবচেয়ে বেশী খেলাপ হয়েছে তাসাওউফ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা।

এব্যাপারে তাদের বিবেচনাবোধ না থাকায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও অন্যদের উক্তির মাঝে পার্থক্য করতে না পারায় তাঁর নামে এমন কথাও বর্ণনা করেছে যা তাঁর বাণী নয়।" –কাওয়াইদুদ তাহ্‌দীস ঃ ১৬৪

গত শতাব্দির অন্যতম সূফী ও চার তরীকার সোহবত ও ইজাযতপ্রাপ্ত হযরত মাওলানা আবদুল হাই লাখনোভী (রহঃ) বুযুর্গদের প্রণীত বলে কথিত কিছু কিতাব চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে, এ সমস্ত কিতাবের যেসব রেওয়ায়াত কোন হাদীসগ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সনদে পাওয়া যায় না, সেগুলোকে হাদীস মনে করে রেওয়ায়াত করা বৈধ নয়। এ পর্যায়ে 'যাদুল লাবীব', 'আনীসুল ওয়ায়েযীন', 'আওরাদু রাহাতিল আবেদীন' ও 'মিফতাহুল জিনান' ইত্যাদি পুস্তকের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি স্পষ্ট লিখেছেন যে, "হাদীস উল্লেখকারী ব্যক্তি বুযুর্গ হওয়াই হাদীস প্রমাণিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়; যতক্ষণ না তা কোন নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হবে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে রেওয়ায়াত যাচাই করে নেওয়া জরুরী।"[১]

১–আল আজবিবাতুল ফাযিলা ঃ ২৯-৩৪, যাফারুল আমানী ঃ ৩৪১-৩৪৪, রাদউল ইখওয়ান আম্মা আহদাসূহু ফী আখিরী জুমুআতে রমযান ঃ ৪০-৪৪–আত্‌তালীকাতুল হাফেলা ঃ ৩১-৩৪

و فهم هذا المقام سهل جدا لأهل العلم إذا توجهوا، فإن المعلقات بعد عصر الرواية ليس

জনৈক ব্যক্তি 'ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন'–এর একটি ভিত্তিহীন হাদীস দেখে এই বলে আশ্চর্য প্রকাশ করল যে, তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন আলেম হয়ে এই ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত কীভাবে উল্লেখ করলেন ? এ সম্পর্কে তাকে হযরত থানভী (রহঃ) লেখেন ঃ

"ইমাম গাযযালী (রহঃ) বিশেষ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, হাদীস শাস্ত্রে নয়।"

তিনি আরো বলেন ঃ "বর্ণনানির্ভর বিষয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বর্ণনা না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। 'হতে পারে কোথাও এর সনদ থেকে থাকবে' শরীয়তে এ কথার কোন মূল্য নেই। (বরং সুনির্দিষ্টভাবে সনদ প্রমাণিত থাকতে হবে)।" –ইমদাদুল ফাতাওয়া ঃ ৫/২০৩

বিশেষত ভারত উপমহাদেশের বুযুর্গগণের (হাদীসশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা যাঁদের বিষয়বস্তু ছিল না) বাণী সংকলন ও পত্রাবলীতে ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের সংখ্যা অধিক। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) স্বরচিত গ্রন্থ তারীখে দাওয়াত ও আযীমত-এ লেখেন ঃ

"শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ, ইন্তেকাল ১০৫২ হিঃ) এর পূর্বে হিন্দুস্তানে সহীহহাদীসসম্বলিত কিতাব ব্যাপকতা লাভ করেনি। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সাথে মানুষের সম্পৃক্ততা বা পরিচিতি হয়নি। হাদীসশাস্ত্রে শুধু 'মাশারেকুল আনওয়ার' ও 'মিশকাতুল মাসাবীহ'কে ইল্‌মের একমাত্র পুঁজি ও হাদীসের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ কিতাব মনে করা হত।

حكمها حكم المراسيل والمنقطعات، بل الحكم فيها أن يفتش عنها، فإذا وجدت أسانيدها، فحكمها حكم أسانيدها، وإذا لم توجد وحكم حافظ مطلع أنه لا أصل له فهو في حكم الموضوع، وإن لم نجد حكما عن الحفاظ ولم نجد أيضا أسانيدها فالحكم فيها التوقف. هذا أمر مفروغ عنه عند المحدثين والأصوليين جميعا، وتجد ذكر نصوص أهل العلم في ذلك، في «النكت» لابن حجر ١: ٨٤٧، ومقدمة «تنزيه الشريعة» ١: ٧-٨، ومقدمة «المصنوع» ص ٢٦، و «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص٢٤٢-٢٤٣، و «المدخل إلى علوم الحديث الشريف» ص١٠٣.

সূফিয়ায়ে কেরামের মুখে এবং বুযুর্গদের বাণীসমূহেও জাল ও দুর্বল রেওয়ায়াত অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। হাদীস যাচাই এবং জাল রেওয়ায়াতসমূহের ইল্‌ম মুহাম্মদ তাহের পাটনী (রহঃ, ইন্তেকাল ৯৮৬ হিঃ)-এর পূর্বে এখানে দেখা যায় না।"[১]

হযরত মাওলানা আলী মিয়া (রহঃ) আরো বলেন ঃ "এতদঞ্চলে সহীহ হাদীসসম্বলিত কিতাবসমূহ এবং হাদীস ও সনদ-যাচাই-শাস্ত্র ব্যাপকতা লাভ না করার কারণে খানকাসমূহে দিন ও মাসের এমন বহু ফযীলত প্রসিদ্ধ ছিল এবং পীর মাশায়েখের বাণীসমূহেও নির্দ্বিধায় বর্ণনা করা হত, যেগুলোর কোন অস্তিত্ব হাদীসের নির্ভরযোগ্য উৎস ও গ্রন্থসমূহে ছিল না। মুহাদ্দেসীনে কেরাম সেগুলো সম্পর্কে কঠোর উক্তি করেছেন। এ সবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মুহাদ্দেসীনে কেরাম এবং সেসব মুখলেসীন ও নিষ্ঠাবানদের প্রচেষ্টার মূল্য অনুমিত হয়, যাঁরা হিন্দুস্তানে হাদীস শাস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সহীহ ও দুর্বল হাদীসের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছেন।" شكر الله مساعيهم[২]

যাহোক, উল্লিখিত কারণে তাঁরা অপারগ ছিলেন। কাজেই তাঁদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি দ্বারা অন্যদের বাহানা বের করার কোন অবকাশ নেই। বিষয়টির মূলতত্ত্ব অবহিত হওয়ার পর এ নিয়ে অতিরঞ্জনকারী বা বুযুর্গদের একটি দুর্বল দিক দ্বারা দলীল প্রদানকারী কিছুতেই নির্দোষ সাব্যস্ত হবে না।

একটি জরুরী সতর্কীকরণ

জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতকে বিভিন্ন বাহানায় হাদীসে রাসূল হিসেবে চালানোর অপচেষ্টা করা যেরূপ ঘৃণীত কাজ, তদ্রূপ নানা বাহানা ও ছল-চাতুরি করে আকল ও বিবেক পরিপন্থীর অভিযোগ এনে, সনদের সামান্য সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে কিংবা আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং বহু হাদীস বিশেষজ্ঞের মতের বিপরীতে শুধু দু'একজনের উক্তির কারণে উম্মতের মাঝে

১–তারীখে দাওয়াত ও আযীমত ঃ ৩/১২৭

২–তারীখে দাওয়াত ও আযীমত ঃ ৩/১২৮

ধারাবাহিকভাবে চলে আসা সুপ্রমাণিত আমলসিদ্ধ হাদীস ও আসর প্রত্যাখ্যান করা এবং সেগুলোকে যয়ীফ, মুনকার, বাতিল বা ভিত্তিহীন প্রমাণ করার চেষ্টা করাও একটি ভয়ানক ফেতনা। এ ফেতনা প্রথমোক্ত ফেতনা থেকে কোন অংশে কম নয়, যা থেকে উম্মতকে রক্ষার জন্যে এই কিতাব পেশ করা হচ্ছে।

আফসোস! এই দ্বিতীয়োক্ত ফেতনাতেও কোন কোন শ্রেণীর লোকজন ফেঁসে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে এবং পুরো উম্মতকে সকল ফেতনা থেকে হেফাযত করুন। এ ব্যাপারে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে আমি শুধু একটি কথার প্রতি ইঙ্গিত করছি। আজকাল আপনি ইংরেজী শিক্ষিত এমন বহু লোককে দেখবেন, যাদের তাওফীক হয়নি দ্বীনী ইলম দ্বীনের ভাষায় দ্বীনদারদের রচিত সঠিক উৎস থেকে পড়ার ও বুঝার; বরং বাংলা বা ইংরেজী কতিপয় অনুবাদ, অমুসলিম ওরিয়েন্টালিস্ট (প্রাচ্যবিদ) বা ওদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারো কিতাব থেকে দু'এক হরফ শিখে তারা হাদীস বিশেষজ্ঞ এবং মুজতাহেদ বনে গেছেন! অথচ তাদের জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত (?!) যে, তাদের নিজেদের অজ্ঞতার অনুভূতি পর্যন্ত নেই। তারা আকল ও বিবেকের (পাশ্চাত্য ইবলীসী বিবেক) বিরোধিতার অভিযোগ এনে সুপ্রমাণিত হাদীসসমূহে আঘাত হানছে। দ্বীনের ইজমাসম্পন্ন এবং অকাট্য মাসআলাসমূহকে তথাকথিত গবেষণার নামে বাতিল রসম-রেওয়াজের অন্তর্ভুক্ত করছে। তাদের গবেষণার প্রারম্ভই হল নিজের রায়ের ব্যাপারে আত্মম্ভরিতা। গবেষণার পুঁজি হল কুরআন সুন্নাহ্‌র বিকৃতি সাধন করা এবং হাদীস অস্বীকার করা। আর গবেষণার ফলাফল হল শরয়ী বিধানাবলী প্রত্যাখ্যান করা এবং তদস্থলে বর্জিত ও পরিত্যাক্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ তাআলা তাদের ফেতনা থেকে উম্মতকে হেফাযত করুন এবং তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়াত দান করুন। আমীন।

ইসলামী হুকুমতে তাদের ন্যূনতম শাস্তি হচ্ছে যা হযরত উমর (রাঃ) সাবীগে ইরাকীকে দিয়েছিলেন। সাবীগের ঘটনা বহু কিতাবে নির্ভরযোগ্য

সনদে বর্ণিত হয়েছে। আমি এখানে শুধু সুনানে দারেমী'র রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করছি ঃ

عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: في الرحل، قال عمر: أبصر أن يكون ذهب، فتصيبك مني به العقوبة الموجعة، فأتاه به فقال عمر: تسأل عن محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برء، ثم عاد له، ثم تركه حتى برء، فدعا به ليعود له، قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت، فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لايجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن ائذن للناس بمجالسته.

"হযরত নাফে (রহঃ) থেকে বর্ণিত, সাবীগে ইরাকী মুসলিম সৈন্যদেরকে কুরআন মাজীদ (-এর আয়াতে মুতাশাবেহাত) সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করত। মিসর আসার পর আমর ইবনুল আস (রাঃ) তাকে (দূত মারফত) হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। দূত পত্র নিয়ে খলীফা উমর (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তা পাঠ করেন এবং বলেন, লোকটি কোথায় ? উত্তরে দূত বলল, উটের হাওদাতে আছে। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, দেখ, সে চলে গেল কি না। তাকে উপস্থিত করতে না পারলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব।

তাকে উপস্থিত করা হলে উমর (রাঃ) বলেন, তুমি নাকি নতুন নতুন (বিভ্রান্তিকর) প্রশ্ন কর ? এরপর তিনি খেজুরের কাঁচা ডাল আনালেন এবং তাকে এত প্রহার করলেন যে, পিঠে ফোস্কা পড়ে গেল। তারপর সুস্থ হওয়া

পর্যন্ত বিরতি দিয়ে পুনরায় অনুরূপ প্রহার করেন। এভাবে কয়েকবার করার পর সবীগ বলল, আপনি যদি আমাকে জীবনে শেষ করতে চান, তাহলে একবারে (বার বার কষ্ট ছাড়া) মেরে ফেলুন। আর যদি আমার সংশোধন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহর কসম! আমার উচিত শিক্ষা হয়ে গেছে। এরপর সে স্বদেশে (ইরাকে) ফেরার অনুমতি লাভ করল। সাথে সাথে হযরত উমর (রাঃ) এ মর্মে ইরাকের গভর্ণর আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-কে লিখে পাঠান যে, কোন মুসলমান যেন তার সাথে উঠা-বসা না করে। এটা সাবীগের জন্যে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে পুনরায় আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) উমর (রাঃ)-কে লিখে জানান যে, তার তওবা খালেস প্রমাণিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে হযরত উমর (রাঃ) মুসলমানদেরকে তার সাথে উঠা-বসা করার অনুমতি প্রদান করেন।"–সুনানে দারেমী ঃ ২/১২৫, হাদীস ১৫৫

এসব গবেষক ছাড়া আপনি এমন আরেক দল লোককেও দেখবেন, যারা কোন বেনামাযীকে নামাযের দাওয়াত দিবে না এবং কোন হাদীস অস্বীকারকারীকে হাদীসের প্রতি ঈমান স্থাপনের দাওয়াত দিবে না; বরং তারা নামাযীদের নিকট গিয়ে গিয়ে বলবে যে, তোমার নামায হয়নি। কেননা তুমি ইমাম সাহেবের পিছনে ফাতেহা পড়নি বা এ জন্যে যে, তুমি রফয়ে য়াদাইন করনি অথবা বলবে যে, তুমি মুসলমানই নও; কেননা তুমি কালিমা এভাবে পড়ে থাক ঃ لا إله إلا الله محمد رسول الله

তাদের কাজ হল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্য কিতাবের হাদীস মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া যে, এটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নেই।[১]

অথচ নির্ভরযোগ্য সনদে ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে এ কথা প্রমাণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ

لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحاح أكثر.

১–অথচ কোন হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হলেও তাদের মতের বিরোধী হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে থাকে!!

"আমি এই কিতাবে (সহীহ বুখারীতে) সহীহ হাদীসই উল্লেখ করেছি এবং আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়ে গেছে।"[১]

একথাও সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর কিতাব তাঁরই উস্তাদ ইমাম আবূ যুরআ রাযী এবং ইবনে ওয়ারা (রহঃ)-এর হাতে পৌঁছলে তাঁরা বলেছিলেন ঃ

"তুমি সহীহ নামে কিতাব লিখে বিদআতীদের পথ সুগম করেছ। যখন তাদের সামনে কোন সহীহ হাদীস পেশ করা হবে, তখন তারা এই বলে প্রত্যাখ্যান করবে যে, এটি তো সহীহ মুসলিমে নেই।"

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন যে, হযরত! আমি তো এ কিতাবে আমার ও আমার নিকট যারা হাদীস শিক্ষা করতে আসবে তাদের স্মরণ রাখার সুবিধার্থে কিছু হাদীস একত্রিত করে রেখেছি। আমি তো এ কথা বলিনি যে, এ সমষ্টির বাইরের সকল হাদীস দুর্বল; বরং এরূপ বলেছি যে, এই হাদীসগুলো সহীহ।"[২]

আপনি ইমাম আবূ যুরআ রাযী (রহঃ) এবং ইবনে ওয়ারা (রহঃ)-এর দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করুন! আজ কীভাবে তাঁদের ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন এবং উম্মতকে স্বতঃসিদ্ধ ও সুপ্রমাণিত বিষয় অস্বীকারের ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন!

অবশেষে আমি এই বইয়ের লেখক ভাই মাওলানা মুতীউর রহমানের শোকর আদায় করছি যে, তিনি এই কিতাবে অনেক শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দ্বীনের জন্যে কবুল করুন, তাফাক্কুহ ফিদ্দীন, রুসূখ ফিল ইল্‌ম এবং ইস্তিকামাত ফিদ্দীনের নেয়ামতে পরিপূর্ণ করুন। আরো যারা

১–শুরূতে আয়িম্মায়ে খামসা ঃ ১৬০, আরো দ্রষ্টব্য ঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১০/২৮৩, তারীখে বাগদাদ ঃ ২/৯, তাহযীবুল কামাল ঃ ১৬/৯১

২–তারীখে বাগদাদ ঃ ৪/২৭৪, শুরূতে আয়িম্মায়ে খামসা ঃ ১৮৮-১৮৯, সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১০/৩৮৭

Contents

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কিতাব রচনা, সম্পাদনা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এবং একে জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে মদদ যুগিয়েছেন আমি তাঁদের সকলের শোকর আদায় করছি। বিশেষভাবে হযরাতুল আল্লাম মাওলানা ফরীদুদ্দীন মাসউদ সাহেব এবং জামিয়া শারইয়্যা মালিবাগ-এর উস্তাদে হাদীস জনাব মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেবের শোকর আদায় করছি। তাঁরা উভয়েই বইটি আদ্যোপান্ত পড়েছেন এবং জরুরী নির্দেশনা দিয়েছেন।

এছাড়া হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল সালাম সাহেবও বইটি পড়িয়ে শোনেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন।

জনাব মাওলানা আরীফুদ্দীন মা'রূফ সাহেব ও মাওলানা ফযলুদ্দীন শিবলী সাহেবও বইটি পড়েছেন এবং ভাষাসংক্রান্ত কিছু সংশোধনী দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পরিশেষে যাঁর অনুগ্রহের কথা না বললেই নয় তিনি হচ্ছেন হযরত মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ সাহেব (দাঃ বাঃ)। তিনি তাঁর নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছেন এবং এর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ তাঁর বলিষ্ঠহাতে সম্পাদনা করেছেন। এজন্য আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সাথে সাথে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করে নিন, যা একমাত্র তাঁরই তাওফীকে সম্ভব হয়েছে এবং একে আমাদের নাজাতের এবং 'মারকাযুদ্দাওয়া'র মাকবূলিয়াতের উসীলা বানান, আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

দারুত তাসনীফ

মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা

৮ রমযানুল মুবারক, ১৪২১ হিজরী

প্রচলিত জাল হাদীস

মাওলানা মুতীউর রহমান

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
(গবেষণামূলক উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াত সংস্থা)

ولا تقف ما ليس لك به علم ط ان السمع والبصر والفؤاد كل

اولئك كان عنه مسئولا.

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" --সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬

আল্লাহ্ তাআলা ছিলেন গুপ্ত ভাণ্ডার

١-كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف

১-"আমি ছিলাম গুপ্ত ভাণ্ডার, তখন আমার ইচ্ছে হল পরিচিত হওয়ার। তাই আমি জগতকে সৃষ্টি করলাম যেন (সৃষ্টিজগতের মাঝে) পরিচিত হই।"

লোকমুখে এটি হাদীস হিসেবে অতি পরিচিত; বিশেষত তাসাওউফ পন্থীদের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা যারকাশী, সাখাবী, আজলূনী ও ইবনে আররাক (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম এই মত পোষণ করেছেন।

প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'রুহুল মাআনী'-এর প্রণেতা আল্লামা আলূসী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

قال ابن تيمية: إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. وكذا قال الزركشي، والحافظ ابن حجر وغيرهما، ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول: إنه ثابت كشفاً، ...، والتصحيح الكشفي شنشنة لهم.

অর্থাৎ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন যে, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। সহীহ্ কিংবা যয়ীফ কোন প্রকার সূত্রই এর নেই। আল্লামা যারকাশী, হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) এবং অন্যরাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। আর সূফীদের যারা এটি বর্ণনা করে থাকেন তারা একথা স্বীকার করেন যে, এটি সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়;

তবে কাশফের মাধ্যমে প্রাপ্ত (বাণী)। আর তাসহীহে কাশফী তথা কাশফের মাধ্যমে হাদীসের মান-যাচাই-প্রক্রিয়া (কতক) সূফীদের চিরাচরিত খাছলত। –তাফসীরে রুহুল মাআনী ঃ ২৭/২১-২২

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী (রহঃ) সংকলিত 'ইমদাদুল আহকাম'-এ উক্ত রেওয়ায়াতের ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

فى المقاصد الحسنة ١٥٣: كنت كنزا مخفياً...، قال ابن تيمية: إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف، وتبعه الزركشي وشيخنا. انتهى.

وفى الدرر المنتثرة للسيوطي: لا أصل له. الفتاوى الحديثية ص١٨٧.

অর্থাৎ এ সম্পর্কে 'আল মাকাসিদুল হাসানা'-এ রয়েছে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন যে, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। সহীহ কিংবা যয়ীফ কোন প্রকার সূত্রই এর নেই। আল্লামা যারকাশী (রহঃ) এবং আমাদের শাইখও (ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ) তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) রচিত 'আদ্‌দুরারুল মুনতাছিরা'-এ আছে যে, এর কোন ভিত্তি নেই। –ইমদাদুল আহকাম ঃ ১/২৯৪

সামান্য শব্দের ব্যবধানে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোতেও উক্ত আলোচনা রয়েছেঃ

–আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৩৮৬, আদ্দুরারুল মুনতাসিরা ঃ ১৫৪, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ১/১৪৮, তায্‌কিরাতুল মাওযূআত ঃ ১১, আল মাসনূ ঃ ১৪১, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৯৩, কাশফুল খাফা ঃ ২/১৩২, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৬১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ঃ ১/৭৭-৭৮, ১২/৬৯ [১]

---

[১] ১–সূফীদের কেউ কেউ এ হাদীস সঠিক প্রমাণের জন্যে কাশ্‌ফের আশ্রয় নেন; অথচ কাশ্‌ফের মাধ্যমে হাদীস যাচাইয়ের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। শুধু তাই নয়; বরং শরীয়তের কোন হুকুম-আহ্‌কামের ব্যাপারেও কাশ্‌ফ, স্বপ্ন বা ইল্‌হামের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। (তাবছিরাতুল আদিল্লা ঃ ১/২২-২৩, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল

আহমদে বে-মীম ...

٢–أنا أحمد بلا ميم، وأنا العرب بلا عين

২–"আমি 'মীম' বিহীন আহমাদ এবং 'আইন' বিহীন আরব।"

আহমাদ (أحمد) শব্দ হতে মীম অক্ষরটি বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে আহাদ (أحد)। আহাদ আরবী শব্দ, আল্লাহ তাআলার নাম। এর অর্থ একক প্রভু। সুতরাং মীমবিহীন আহমাদ হওয়ার অর্থ তিনি আল্লাহ।

আর আরব (عرب) শব্দটি হতে 'আইন' বাদ দিলে বাকী থাকে রব (رب)। রব শব্দটিও আরবী; অর্থ হল প্রতিপালক। মোটকথা, 'আইন' বিহীন 'আরব' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় তিনি প্রতিপালক তথা আল্লাহ। এখন অর্থ দাঁড়াল–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে আহাদ ও রব তথা আল্লাহ হওয়ার দাবী করছেন। নাউযুবিল্লাহ!

অর্থ দেখেই পাঠক বুঝতে পারেন যে, এটি জাল হাদীস; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হতেই পারে না, এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

ইলহাম ওয়াল কাশ্‌ফি ওয়াররুয়া ঃ ২০-১৩৬, শরহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা ঃ ৫৭, নিবরাস ঃ ১০৫-১০৬)

এমনকি দুনিয়ার কোন আদালতেও এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নেই। কোন চোর বা ডাকাতের বিরুদ্ধে বাদীর এ ধরণের বক্তব্য আদালত কবূল করে না যে, আমি কাশ্‌ফের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, সে আমার মাল চুরি করেছে বা ডাকাতি করেছে ইত্যাদি। দুনিয়ার ছোট-খাট ব্যাপারেও যখন এগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই; সেখানে দ্বীনের ব্যাপারে তা কীভাবে গৃহীত হতে পারে!?

সুতরাং শরীয়তের অন্যতম উৎস হাদীসের ব্যাপারেও তা গ্রহণ করা যাবে না। কোন যুগেই হাদীস যাচাইয়ের পদ্ধতি কাশ্‌ফ ছিল না। সর্বযুগেই মানুষ হাদীস পরখের জন্যে হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের শরণাপন্ন হত; কারো কাশ্‌ফের আশ্রয় নিত না।

কাশফের মাধ্যমে হাদীস যাচাইয়ের অসারতা বিস্তারিত জানার জন্যে ভূমিকার ৫৩-৬৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

দ্রষ্টব্য ঃ খাইরুল ফাতাওয়া ঃ ১/২৯২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ঃ ৫/২৪২, তালীমুদ্দীন–ইসলাহী নেসাব ঃ ৩০৪-৩০৫

ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মিলে

٣–لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به.

৩–"তোমাদের কেউ যদি পাথরের ব্যাপারেও সুধারণা রাখে তা হলে আল্লাহ্ তাআলা তা দ্বারা তার উপকার সাধন করবেন।"

এটিও হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিশেষ করে বে-ইলম ও মূর্খ যারা ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবয ও পানি পড়া ইত্যাদি প্রদানে অভ্যস্ত; তাদের অনেকে গ্রাহকদের আস্থা কুড়ানোর জন্যে এ সব সস্তা-বুলি আওড়ে থাকেন।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) উক্তিটির অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ هو من وضع المشركين عباد الأوثان "এটি মূর্তিপূজারী মুশরেকদের জালকৃত।" –আল মানারুল মুনীফ ফিস সহীহে ওয়াযযয়ীফ ঃ ১৩৯

হাফেয সাখাবী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

قال ابن تيمية: إنه كذب، ونحوه قول شيخنا: إنه لا أصل له.

"ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, এটি মিথ্যা কথা। আমাদের শাইখ (ইবনে হাজার আসকালানীও) বলেছেন, এর কোন ভিত্তি নেই।" –আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৪০২

আল্লামা তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা ইসমাঈল আজলূনী এবং শাইখ কাউকজী (রহঃ) এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

–তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ২৮, আল-মাসনূ ঃ ১৪৮, আল-মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৯৮, কাশফুল খাফা ঃ ২/১৩৮ আল-লুউলুউল মারসূ ঃ ৬৫

মেরাজের নব্বই হাজার কালাম

৪–"মেরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নব্বই হাজার কালাম ও বাণী লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার কালাম যাহেরী, যেগুলো উলামায়ে কেরাম জানেন। আর অবশিষ্ট ষাট হাজার কালাম বাতেনী, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে একমাত্র হযরত আলী (রাঃ)কে বলে গেছেন। তাঁর নিকট থেকে সিনা পরম্পরায় পরবর্তী সূফী, ফকীর ও দরবেশদের নিকট তা পৌঁচেছে। ফকীরদরবেশদের নিকট গচ্ছিত বাতেনী এই ষাট হাজার কালাম উলামায়ে কেরাম না জানার কারণে তারা ফকীর-দরবেশদের মধ্যে একটা কিছু দেখলেই তাদের উপর আপত্তি করে বসেন।"

এ কথাটি জাল ও ভিত্তিহীন। কেননা প্রথমত এতে আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপ করা হয় যে, তিনি মানুষকে দু' প্রকার শরীয়ত প্রদান করেছেন। একটি ত্রিশ হাজার কালামবিশিষ্ট শরীয়ত; আরেকটি ষাট হাজার কালামবিশিষ্ট শরীয়ত এবং উভয় শরীয়ত পরস্পর বিরোধী। এক শরীয়তে একটি বস্তু হালাল হলে অন্য শরীয়তে সে একই বস্তু হারাম। এরূপ পরস্পর বিরোধপূর্ণ কাজ কোন সৃষ্টির পক্ষেও নিকৃষ্ট। অথচ এটাকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার শানে চালিয়ে দিয়েছে এসব দাজ্জালরা।

দ্বিতীয়ত এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও এই আপবাদ আসে যে, তিনি দ্বীনের অধিকাংশ মৌলিক কথা–যা সর্বস্তরের মুসলমানদের জানা জরুরী ছিল, তা তিনি তাদের কাছে পৌঁছাননি। শুধুমাত্র একজনকে গোপনে বলে গেছেন আর অন্যদেরকে তার বিপরীত কথা বলে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে ব্যক্তির এরূপ ধারণা থাকবে, তার যে রাসূলের প্রতি ঈমান নেই, তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে দ্বীনের বিশেষ বিশেষ এমন অনেক কথা পৌঁছিয়েছেন, যা অন্যদেরকে

পৌঁছাননি—এ আকীদা মূলত সাবাঈ চক্রের ছিল (যাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে উম্মত একমত।) সাবাই চক্র এ আকীদা হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগেই রটিয়েছিল। আর হযরত আলী (রাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে একাধিক সহীহ রেওয়ায়াত রয়েছে। দেখুন ঃ

عن عامر بن واثلة قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيئ دون الناس؟ فغضب علي رضي الله عنه حتى احمر وجهه، وقال: ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت، فقال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه النسائي، وإسناده صحيح، وأصل الحديث في صحيح مسلم.

"আমের ইবনে ওয়াসেলা বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি লোকের অগোচরে আপনাকে গোপনে কিছু বলে গেছেন ? এ কথা শোনে ক্রোধে হযরত আলী (রাঃ)এর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকের অগোচরে আমাকে কিছু বলে যাননি; তবে আমাকে তিনি চারটি কথা বলে গেছেন, তখন আমরা ছিলাম ঘরের ভিতর। তিনি ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতাকে লানত করে, আল্লাহ তাআলা তাকে লানত করেন। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত করেন। যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত করেন। যে ব্যক্তি জমির চিহ্ন (সীমানা) এদিক-সেদিক করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত করেন।" —সুনানে নাসায়ী ঃ ২/১৮৩-১৮৪, হাদীস ৪৪২২

সুতরাং এ ধরনের উক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মেরাজ রজনীতে নব্বই হাজার কালাম লাভ করেছিলেন ... সেগুলো একমাত্র হযরত আলী (রাঃ)কে গোপনে বলে গেছেন...) ভিত্তিহীন ও কুফরী কালাম, যা উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। তাই এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস বর্জন করা অপরিহার্য।

আপদ-বিপদে কবরবাসীদের নিকট সাহায্য চাও

٥-إذا تحيرتم فى الأمور فاستعينوا بأهل القبور

৫-"যখন তোমরা কোন ব্যাপারে পেরেশান হও, তখন কবরবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা কর।"

এটি লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ; অথচ হাদীসের সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহঃ) ও অন্যান্য বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট রায় পেশ করেছেন।

কবরপূজারীদের তরফদার কোন কোন বিদআতী এ উক্তি দ্বারা কবরবাসীদের নিকট সাহায্য কামনার (যা স্পষ্ট শির্ক) স্বপক্ষে দলীল দিয়ে থাকে। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা তাদের কীর্তিকাণ্ডের অসারতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

-মাজমূআ ফাতাওয়া আব্দুল হাই ঃ ১/১৩৮, ফাতাওয়া আযীযী ঃ ১৭৯, ১৮০, ইত্মামুল বুরহান ঃ ১/১০৮

মান নাগুনজম দর জমিনও আসমাঁ ...

٦-ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن

৬-"আসমান ও যমীন আমাকে সংকুলান করে না; কিন্তু একমাত্র আমার মুমিন বান্দার কলব আমাকে সংকুলান করে।"

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বাক্যটিও লোকমুখে প্রসিদ্ধ ঃ

٧–القلب بيت الرب

৭–"কলব আল্লাহ তাআলার ঘর।"

এগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উভয়টিকে জাল বলেছেন। –যাইলুল লাআলী ঃ ২০৩–আল মাসনূ ঃ ১৬৪ (টীকা)

আল্লামা তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা ইবনে আররাক এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যে একমত পোষণ করেছেন।

–তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ৩০, আল মাসনূ ঃ ১৬৪, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ১/৪৮, যাইলুল লাআলী ঃ ২০৩–আল মাসনূ ঃ ১৬৪ (টীকা)

আরো দ্রষ্টব্য ঃ ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৭/২৩৪, আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৩৬৫, ৪৩৮, কাশফুল খাফা ঃ ২/৯৯, ১৯৫, আদ্দুরারুল মুন্তাসিরা ঃ ১৫০, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৫৭, আত্ তাযকিরা ঃ ১৩৫, ১৩৬

আল্লাহ্ তাআলা অসীম। তিনি নিরাকার। তিনি দৈর্ঘ-প্রস্থ-স্থান-কাল-দিক সকল কিছুর উর্ধ্বে। আল্লাহ্ তাআলা যাত ও সত্তা নয়; বরং তাঁর প্রতি ঈমান, মহব্বত, মারেফত ও পরিচিতি ইত্যাদিই মুমিনের অন্তরে স্থান পেতে পারে।

কলবুল মুমিনে আরশুল্লাহ্

٨–قلب المؤمن عرش الله

৮–"মুমিনের হৃদয় আল্লাহ্ তাআলার আরশ।"

উপরোক্ত উক্তিদ্বয়ের ন্যায় এটিও জাল, যা লোকমুখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর হাদীস নয়। এটি মূলতঃ পূর্বোক্ত জাল হাদীসের আরেকটি রূপমাত্র।

আল্লামা সাগানী (রহঃ) একে জাল আখ্যা দিয়েছেন । –রিসালাতুল মাওযূআত ঃ ৭

আল্লামা আজলূনী (রহঃ)ও সাগানীর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। –কাশফুল খাফা ঃ ২/১০০

আমি ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির সাথী

٩–أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي.

৯–"আমার (আল্লাহ তাআলার) জন্যে যাদের হৃদয় ভগ্ন থাকে আমি তাদের সঙ্গে আছি।"

সাধরণত এটিকে হাদীস কুদসী মনে করা হয়; বাস্তবে তা নয়। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এবং আল্লামা কাউকজী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন, "হাদীস হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই।" –আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৪০, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ২৪, কাশফুল খাফা ঃ ১/২০৩

আল্লামা মুরতাজা যাবীদী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন, "এটি হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়।" – ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৬/২৯০

মূলত এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা, যা হিল্য়াতুল আউলিয়া–এ (খণ্ড ঃ ৪ পৃষ্ঠা ঃ ৩৫, খণ্ড ঃ ২ পৃষ্ঠা ঃ ৪১৩, খণ্ড ঃ ৬ পৃষ্ঠা ঃ ১৯১) বিবৃত আছে।

বলাবাহুল্য, কোন ইসরাঈলী কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে বর্ণিত না হলে তাকে হাদীস বলার অবকাশ নেই।

১০–দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর

١٠–اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد

ইসলামে ইলমে দ্বীন অন্বেষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাই বিভিন্নভাবে ইলম অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ৯১-৯৩, ৯৫-৯৯ পৃষ্ঠায় ইলম অন্বেষণের ফযীলত, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হবে।

ইলমের যেমন কোন শেষ নেই; তেমনি তা শিক্ষা করার জন্য কোন সময়ও নির্দিষ্ট নেই। শৈশবকাল থেকে আমরণ ইলম অর্জন করে যেতে হবে। এটাই ইলমের দাবী।

তবে 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর' কথাটি একটি প্রবাদ ও হিতোপদেশ মাত্র; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। যদিও অনেকের নিকট তা হাদীস হিসেবেই প্রসিদ্ধ।

শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

ليس بحديث نبوي، وإنما هو من كلام الناس، فلا تجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقله بعضهم، إذ لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله أو فعله أو أقره.

وكون هذا الكلام صحيح المعنى في ذاته وحقا في دعوته: لا يسوغ نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو الحجاج الحلبي المزي: «ليس لأحد أن ينسب حرفا يستحسنه من الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقا، فإن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وليس كل ما هو حق قاله الرسول صلى الله عليه وسلم». انتهى من كتاب «ذيل الموضوعات» للحافظ السيوطي ص٢٠٢.

وهذا الحديث الموضوع: (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) مشهور على الألسنة كثيرا، ومن العجب أن الكتب المؤلفة فى (الأحاديث المشتهرة) لم تذكره. من حاشية «قيمة الزمن عند العلماء».

অর্থাৎ এটি হাদীসে নববী নয়; বরং একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। এটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধিত করা মোটেও বৈধ হবে না। (যেমন কেউ কেউ করে থাকে।) কেননা, তাঁর প্রতি শুধু সেটিকেই সম্বন্ধিত করা যাবে যা তিনি বলেছেন, করেছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন।

"যে কোন কথা ভাল মনে হলেই তাকে হাদীসে রাসূল বলা জায়েয হবে না; যদিও কথাটি সঠিক হোক না কেন। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল হাদীসে নববীই হক তথা সত্য; কিন্তু দুনিয়ার সকল সঠিক কথাই হাদীসে নববী নয়। বিষয়টি ভালভাবে বুঝা উচিত।" –কীমাতুয যামান ইন্দাল উলামা ঃ ৩০ (টীকা)

ইলম অন্বেষণে সত্তর নবীর সাওয়াব

١١-من تعلم بابا من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله، أعطاه الله أجر سبعين نبيا.

১১–"যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিয়তে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ইলমে দ্বীনের কিছু অংশ শিক্ষা করবে; আল্লাহ তাআলা তাকে সত্তরজন নবীর সাওয়াব দান করবেন।"

এটা বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা, যা হাদীসের নামে জাল করা হয়েছে।

হাফেয সুয়ূতী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহঃ) এটিকে জাল সাব্যস্ত করেছেন। –যাইলুল লাআলীল মাসনূআ ঃ ৩৭, তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ ঃ ১/২৭৫

আল্লামা মুরতাযা যাবীদী (রহঃ) বলেন, এর সনদে দুইজন কাযযাব তথা মিথ্যাবাদী রয়েছে। –ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ১/১০৬

আরো দ্রষ্টব্য ঃ তাযকিরাতুল মাওযূআত (আল্লামা তাহের পাটনী রহঃ) ঃ ১৮, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৩৬৪

তবে হ্যাঁ, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার কল্পে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত বহু হাদীস রয়েছে। যেমন ঃ

عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء! إني جئت من مدينة الرسول صلى الله عليه

وسلم، لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي. وحسنه حمزة الكناني، كما قال الحافظ في الفتح ١٩٣:١.

"কাসীর ইবনে কাইস (রহঃ) বলেন, আমি দামেস্কের মসজিদে হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর মজলিসে বসা অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, হে আবু দারদা! আমি রাসূলের শহর (মদীনা) হতে আপনার কাছে এসেছি, অন্য কোন প্রয়োজনে নয়; শুধু একটি হাদীসের জন্যে যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন বলে আমার কাছে খবর পৌঁচেছে।

"হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শোনেছি, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্যে কোন পথ অতিক্রম করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবেন এবং ফেরেশ্‌তারা তালেবে ইলমের সন্তুষ্টির জন্যে তাদের 'ডানা' বিছিয়ে দেবেন। একজন আলেমের জন্যে আসমান ও দুনিয়াবাসী, এমনকি পানির ভিতরে মাছ পর্যন্ত মাগফেরাতের দুআ করতে থাকে। আলেমের মর্যাদা ইবাদতকারীর উপর তেমন, যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকারাজির উপর।

"আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোন দেরহাম, দিনারের মীরাছ রেখে যাননি; বরং তারা শুধু ইলমের মীরাছ রেখে গেছেন।

যে ব্যক্তি এই ইলম গ্রহণ করল, সে বিরাট অংশই গ্রহণ করল।" –সুনানে আবু দাউদ ঃ ৫১৩, হাদীস ৩৬৪১, জামে তিরমিযী ঃ ২/৯৭-৯৮, হাদীস ২৬৮২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الحاكم، وقال: على شرطهما، ورواه الطبراني، وقال الهيثمي : رجاله موثقون.

"যে ব্যক্তি শুধু 'কল্যাণ' (দ্বীন) শিক্ষা করতে বা শিক্ষা দিতে সকালে মসজিদে যাবে, সে একটি পরিপূর্ণ হজ্বের সাওয়াব পাবে।" –তাবারানী কাবীর ঃ ৮/৯৪, হাদীস ঃ ৭৪৭৩, মুস্তাদরাকে হাকেম ঃ ১/২৮১, হাদীস ৩১৭

এ ছাড়াও আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিয়তে, দ্বীনকে জিন্দা রাখার জন্যে ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া খুবই ফযীলতের কাজ; তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সত্তরজন নবীর সাওয়াবের বিষয়টি সম্পূর্ণই বাতিল। আল্লাহর রাসূল তা ইরশাদ করেননি।

আলেমের চেহারার দিকে তাকানোর সাওয়াব

١٢-نظرة إلى وجه العالم أحب إلى الله من عبادة ستين سنة صياما وقياما.

১২–"আলেমের চেহারার দিকে একবার তাকানো আল্লাহ তাআলার নিকট ষাট বছরের রোযা-নামাযের চেয়ে উত্তম।"

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একাধিক আয়াত ও সহীহ হাদীস রয়েছে। তাছাড়া দ্বীনদার হক্কানী উলামায়ে কেরামের সংশ্রব অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শরীয়তে অপরিসীম। লোকমুখে প্রসিদ্ধ

উপরোক্ত কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। সামআন ইবনে মাহদী-এর নামে জালকৃত পুস্তক ছাড়া কোথাও এর সন্ধান পাওয়া যায় না।

—আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৫২২, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১৩২, কাশফুল খাফা ঃ ২/৩১৮, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৯৬

সামআনের নামে এ জালকৃত পুস্তিকাটির জন্যে আরো দ্রষ্টব্য ঃ মীযানুল ইতিদাল ঃ ২/২৩৪, লিসানুল মীযান ঃ ৩/১১৪, আল মাসনূ ঃ ২৪৭

আলেমের সাথে সাক্ষাত ও মুসাফাহার সাওয়াব

১৩–من زار العلماء فكأنما زارني، ومن صافح العلماء فكأنما صافحني، ومن جالس العلماء فكأنما جالسني، ومن جالسني فى الدنيا أجلس إلي يوم القيامة/ وفي لفظ: أجلسه ربي معي فى الجنة يوم القيامة.

১৩–"যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত করল, সে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করল। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মুসাফাহা করল, সে যেন আমার সঙ্গে মুসাফাহা করল। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে উঠাবসা করল, সে যেন আমার সঙ্গে উঠাবসা করল। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার সঙ্গে উঠাবসা করবে অর্থাৎ সংশ্রব অবলম্বন করবে, তাকে কিয়ামত দিবসে আমার নিকট বসানো হবে। অন্য কথায়–কিয়ামত দিবসে আমার প্রতিপালক তাকে আমার সঙ্গে জান্নাতে বসাবেন।"

অনেকে উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে খুব আগ্রহের সঙ্গে এবং হাদীসে রাসূল মনে করে এটাকে বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু তা হাদীসে রাসূল নয়।

এর সনদে হাফ্স ইবনে উমর আদানী নামক একজন মিথ্যুক বিদ্যমান থাকায় হাফেয সুয়ূতী (রহঃ) একে জাল সাব্যস্ত করেন।

মোল্লা আলী কারী, ইবনে আররাক, আজলূনী, আল্লামা তাহের পাটনী এবং আল্লামা শাওকানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামও তাদের কিতাবে এটিকে জাল বলেছেন।

একই বক্তব্যের আরো কিছু জাল হাদীস

১৪–"যে ব্যক্তি আলেমদের নিকট দুই মুহূর্ত বসবে, তাঁর সাথে দুই লোকমা খানা খাবে, তাঁর নিকট দু'টি কথা শোনবে অথবা তাঁর সাথে দুই কদম হাঁটবে, বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন দু'টি জান্নাত দান করবেন, যার প্রতিটি দুই দুনিয়ার সমান।"

১৫–"আলেমগণের সংশ্রবে এক মুহূর্ত বসা আল্লাহ তাআলার নিকট হাজার হাজার বছর ইবাদত করা থেকে উত্তম।"

১৬–"আল্লাহ তাআলা আরশে মুআল্লার নীচে একটা শহর তৈরী করেছেন, যার দরজায় লেখা আছে, যে আলেমগণের সাক্ষাত লাভ করল, সে যেন নবীগণের সাক্ষাত লাভ করল।"

এগুলো সবই ভিত্তিহীন এবং পূর্বোক্ত জাল হাদীসটিরই বিভিন্ন রূপ।

দ্রষ্টব্য ঃ যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ঃ ৩৫, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১২০, আল মাসনূ ঃ ১৮৩-১৮৪, কাশফুল খাফা ঃ ১/২৫১, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ১/২৭২, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ১৯, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৩৬৫, যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা ও যাইলু তানযীহিশ শরীয়া।

হক্কানী উলামায়ে কেরামের সংশ্রবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, শরীয়তে যেখানে নেককার লোকের সংশ্রব অবলম্বনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, সেখানে মুত্তাকী, আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামের সংশ্রব অবলম্বন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে।

নিম্নে সৎলোকের সংশ্রবের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও গুরুত্বের উপর কয়েকটি হাদীস প্রদত্ত হল ঃ

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافع الكير،

فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة.

"হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গী যথাক্রমে মেশকবহনকারী আর হাপর ফুঁৎকারকারী কামারের ন্যায়। মেশকবহনকারী হয়ত তোমাকে তা প্রদান করবে অথবা তুমি তার নিকট হতে ক্রয় করবে। কিংবা অন্তত সুঘ্রাণ তুমি অবশ্যই পাবে। আর হাপর ফুঁৎকারকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালাবে; নতুবা তুমি দুর্গন্ধ পাবে।" –সহীহ বুখারী ঃ ২/৮৩০, হাদীস ৫৫৩৪

অন্য হাদীসে আছে ঃ

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيئ أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من شراره أصابك من دخانه. رواه أبو داود، سكت عنه هو والمنذري بعده.

"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সৎসঙ্গীর উপমা হল মেশকবহনকারীর ন্যায়; মেশক যদি না পাও, সুঘ্রাণ তো অবশ্যই পাবে। অসৎ সঙ্গীর উপমা হল হাপরধারীর ন্যায়; তার স্ফুলিঙ্গ তোমার ক্ষতি না করলেও, তার ধোঁয়া অবশ্যই তোমাকে স্পর্শ করবে।" –সুনানে আবূ দাউদ ঃ ২/৬৬৪, হাদীস ৪৮১৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير جلسائكم من يذكر الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم الآخرة عمله. رواه عبد بن حميد وأبو يعلى في مسنديهما، قال البوصيري: رواته ثقات، كما في «إتحاف الخيرة» بذيل «المطالب العالية» ٨: ١٦٣.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী সে, যার দর্শন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; যার কথায় ইলম বৃদ্ধি পায় এবং যার আমল তথা কাজ-কর্ম তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" –মুসনাদে আব্দুব্‌নু হুমাইদ, মুসনাদে আবূ ইয়ালা–ইত্‌হাফুল খিয়ারা ঃ ৮/১৬৩

এ ছাড়াও এ বিষয়ের আরো বহু হাদীস রয়েছে, যেগুলো দ্বারা দ্বীনদার, সৎলোকের সংশ্রব অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। আর হক্কানী উলামায়ে কেরাম হলেন সৎ লোকদের শ্রেষ্ঠ।

তা ছাড়া উলামায়ে কেরামের সাথে জনসাধারণের দ্বীন শিক্ষার বিষয়টিও জড়িত। তারা পদে পদে উলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী। সুতরাং তাঁদের ছোহবত গ্রহণ করা এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত পোষণ করা অতি জরুরী। উলামায়ে কেরামের সাথে মহব্বত রাখা মূলত দ্বীনের সাথে মহব্বত রাখা।

তাই কুরআন মাজীদে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও বিজ্ঞ আলেম এবং আল্লাহর পথের পথিকদের সঙ্গী হওয়ার এবং তাঁদের অনুসরন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(সূরা নাহল ঃ আয়াত ৪৩, আম্বিয়া ঃ আয়াত ৭, ফাতেহা ঃ আয়াত ৬-৭, সাথে সূরা নিসা ঃ আয়াত ৬৯, লোকমান ঃ আয়াত ১৫ থেকে উৎসারিত)

দ্বীনী ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم، قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات.

فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه

قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود، وغيره، وإسناده صالح.

"হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এক সফরে আমাদের একজন মাথায় পাথর লেগে জখম হল। পরে তাঁর উপর গোসল ফরয হল। তখন তিনি সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার জন্যে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ মনে কর? তারা বললেন, আমরা তা মনে করি না। কেননা, তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম। তখন তিনি গোসল করলেন আর মারা গেলেন।

"(জাবের রাঃ বলেন) সফর থেকে ফেরার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হয়। তখন তিনি ইরশাদ করেন ঃ তারা তাকে (না জেনে মাসআলা দিয়ে) কতল করেছে; আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কতল করুন! তাদের যখন জানা ছিল না, তখন তারা কেন (যারা জানে তাদেরকে) জিজ্ঞেস করল না। বস্তুত অজ্ঞতার চিকিৎসা হল জিজ্ঞাসা করা।" –সুনানে আবূ দাউদ ঃ ৪৯, হাদীস ৩৩৬

অন্যত্র আছে ঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم.

"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের থেকে এই ইলমকে এক সাথে ছিনিয়ে নেবেন না; বরং উলামায়ে কেরামকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নেবেন। এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ তাআলা একজন আলেমকেও অবশিষ্ট রাখবেন না। তখন লোকেরা জাহেলদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে মুরব্বী বানাবে। লোকেরা তাদেরকে দ্বীনী মাসআলা জিজ্ঞেস করবে আর তারা না জেনে

ফাত্ওয়া দেবে। পরিণামে তারাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথ ভ্রষ্ট করবে।" –সহীহ বুখারী ঃ ১/২০, হাদীস ১০০, সহীহ মুসলিম ঃ ২/৩৪০, হাদীস ২৬৭৩

সুতরাং উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া, তাঁদের সাথে উঠাবসা করা, তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, সর্বোপরি তাদের সাথে মহব্বত রাখা আবশ্যক, যা পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ দ্বারা অতি সুস্পষ্ট।

আলেমের মজলিস হাজার রাকাআত নফল থেকেও উত্তম

١٧-حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة، وعيادة ألف مريض، وشهود ألف جنازة، فقيل: يا رسول الله! ومن قراءة القرآن؟ فقال: وهل ينفع القرآن إلا بالعلم.

১৭–"কোন আলেমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার রাকাআত নামায, এক হাজার রোগী দেখা-শুনা এবং এক হাজার জানাযায় উপস্থিত হওয়ার চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, এবং কুরআন তেলাওয়াত থেকেও ? উত্তরে তিনি বললেন, ইলম ছাড়া কি কুরআন উপকারী হতে পারে?"

প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। উলামায়ে কেরামের মজলিসে উপস্থিত হওয়াও দ্বীন অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। সে হিসেবে তাঁদের মজলিসে অংশগ্রহণ করাও সাওয়াবের কাজ নিঃসন্দেহে।

তবে পূর্বোক্ত বক্তব্য লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও আসলে তা হাদীসে রাসূল নয়।

হাফেয ইরাকী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ هذا الحديث موضوع "এই হাদীসটি জাল।" –তাখরীজে ইহইয়া–ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ১/৯৯

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ)ও একই কথা বলেছেন। –কিতাবুল মাওযূআত ঃ ১/১৬১

আল্লামা তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা মুরতাযা যাবীদী এবং আল্লামা শাওকানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম তাঁর রায়ের সাথে একমত পোষণ করেছেন।

–তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ২০, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৬২, আল মাসনূ ঃ ৯৫, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৫/১৭৩, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৩৫৭, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৩৪, আত তালীকাতুল হাফেলা ঃ ১১৯

একজন আলেমকে সম্মান করা সত্তরজন নবীকে সম্মান করার সমতুল্য

١٨–من أكرم عالما فقد أكرم سبعين نبيا، ومن أكرم متعلما فقد أكرم سبعين شهيدا، ومن أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته.

১৮–"যে ব্যক্তি কোন আলেমকে সম্মান করল, সে যেন সত্তরজন নবীকে সম্মান করল। যে ব্যক্তি কোন তালেবে ইল্‌মকে সম্মান করল, সে যেন সত্তরজন শহীদকে সম্মান করল। আর যে ব্যক্তি ইল্‌ম ও উলামায়ে কেরামের সাথে মহব্বত রাখবে, জিন্দেগীতে তার কোন গুনাহ লেখা হবে না।"

এটিও ইল্‌ম, তালেবে ইলম ও উলামায়ে কেরামের ফযীলতসম্বলিত একটি প্রসিদ্ধ উক্তি। যা লোক সমাজে হাদীসে রাসূল রূপে পরিচিত; অথচ হাদীসের কোন কিতাবে তার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং একে হাদীসে রাসূল বলা যায় না।

হাফেয যাহাবী (রহঃ)-এর মতে এটি আব্দুর রহ্‌মান ইবনে মুহাম্মাদ *আল-বালখী নামক একজন মিথ্যুক বর্ণনাকারীর জালকৃত।*

আল্লামা ইবনে আররাক (রহঃ)ও হাফেয যাহাবী (রহঃ)কে সমর্থন

করেছেন। –তালখীসুল ওয়াহিয়াত–তানযীহুশ শরীয়া ঃ ১/২৭৯-২৮০, মীযানুল ইতিদাল ঃ ২/৫৮৭

আলেমের পিছনে নামায যেন নবীর পিছনে নামায

১৯–من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي.

১৯–"যে ব্যক্তি একজন খোদাভীরু আলেমের পিছনে নামায পড়ল, সে যেন একজন নবীর পিছনে নামায পড়ল।"

শরীয়তে দ্বীনদার আলেমের পিছনে নামায আদায়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে পূর্বোক্ত উক্তিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়; যদিও তা বহু লোকের নিকট তাঁর হাদীস হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। মুহাদ্দেসীনে কেরাম এর কোন সনদই খুঁজে পাননি।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন, "এর কোন ভিত্তিই নেই।" –আল মাসনূ ঃ ১৮৬, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১২১

আরো দ্রষ্টব্য ঃ আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৩৬০, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ৪০, কাশফুল খাফা ঃ ২/২৫৭

চার হাজার চারশ চৌচল্লিশ নামায!

২০–الصلاة خلف العالم بأربعة ألاف وأربعمئة وأربع وأربعين صلاة.

২০–"একজন আলেমের পিছনে নামায পড়া চার হাজার চার শত চৌচল্লিশ গুণ অধিক সাওয়াব।"

সকল মুহাদ্দেসীনে কেরাম একবাক্যে এটিকে বাতিল ও জাল হাদীস বলেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, হাফেয সাখাবী, আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা শাওকানী এবং আল্লামা কাউকজী

(রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৩১৬, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ২০, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৭৮, আল মাসনূ ঃ ১১৯, কাশফুল খাফা ঃ ২/২৯, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৩৬৮, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৪৮

এই উম্মতের আলেম বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য

٢١-علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل.

২১—"আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য।"

উলামায়ে কেরামের ফযীলত ও দায়িত্ব বয়ান করতে গিয়ে অনেককেই হাদীসে নববী হিসাবে এ বাক্যটি বলতে শোনা যায়। অথচ হাদীস ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করলে হাদীস হিসেবে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস হল العلماء ورثة الأنبياء "আলেমরা নবীগণের ওয়ারিস।" তাই উলূমে নবুওয়তের হেফাযত ও সংরক্ষণ; এর প্রচার ও প্রসার এবং এর হেদায়াত ও নির্দেশনা অনুযায়ী হকের লালন ও বাতিলের দমনের দায়িত্ব তাঁদের উপরই বর্তায়। অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يحمل هذا العلم من خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين. رواه غير واحد بطرق كثيرة منهم ابن عبد البر في مقدمة التمهيد ١:٥٩، قال العلائي في «بغية الملتمس» ص٣٤: هذا حديث حسن غريب صحيح.

অর্থাৎ ইলমে নবুওয়তের ধারক-বাহক হল প্রতি যুগের স্থলাভিষিক্ত আদেল, মুত্তাকী ও আমানতদার ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা রোধ করবে অতিরঞ্জন -কারীদের তাহরীফ ও বিকৃতি; জাহেল ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা এবং রুখবে বাতিলপন্থীদের যত মিথ্যাচার ও ছলচাতুরি। —তামহীদ ঃ ১/৫৯

যাহোক, এক্ষেত্রে এ ধরনের সহীহ হাদীস লেখায় ও কথায় স্থান পাওয়া উচিত।

আর আলোচ্য উক্তিটি (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) ভিত্তিহীন। বিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একে ভিত্তিহীন বলেছেন। তন্মধ্যে যারকাশী, দামেরী, ইবনে হাজার আসকালানী, সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী এবং শাওকানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

---

(١) يستهين بعضُ الناس من حكم الجهابذة على هذا الخبر بكونه لا أصل له، قائلين إن معناه صحيح مستفاد من الجمع بين حديثين :

الأول: حديث الصحيحين :«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم». (البخاري ومسلم)

الثاني: حديث: العلماء ورثة الأنبياء المذكور. وعليهم في هذا الصنيع مآخذ أذكر بعضها:

أ- إذا أنتم أقررتم بأن هذا اللفظ لا أصل له فكيف تروون هذا الخبر بلفظ: علماء أمتي ...»، أليس ذلك تصريحاً منكم أنكم تنسبون إليه صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ بعينه، وقد اعترفتم أنه لا أصل له.

ب - لو أن الحديثين المذكورين يفيدان ما يفيده الخبر المذكور فهلا اكتفيتم بهما.

ج- أهم ما في الخبر المذكور تشبيه علماء هذه الأمة بأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، والحديثان المذكوران لا يدلان -لا من قريب ولا من بعيد- على سواغية التشبيه المذكور، وهذا التشبيه هو مقصودكم الأول من الاستشهاد بهذا الخبر. ومطلق الاشتراك لا يُجوز تشبيهَ العلماء بالأنبياء لا سيما باللفظ المذكور الذي يُوحي -باديء ذي بدء- بالإقلال من شأن أولئك الأنبياء عباد الله المصطفين، عليهم الصلاة والسلام.

والحديث الأول يشير -بظاهره، وليس مراداً- إلى تشبيه خلفاء هذه الأمة بأنبياء بني إسرائيل، فهل تقولون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خلفاء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»!! فهل الخلفاء، وفيهم خلفاء بني أمية وبني العباس، كأنبياء بني إسرائيل؟!!

د-سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العلماء ورثة الأنبياء»، فكيف تستدركون عليه فتقولون: «العلماء كالأنبياء»؟!! ما هو الذي ألجأكم إلى ذلك؟

–আত্ তাযকিরা ঃ ১৬৭, আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৩৪০, আদ্দুরারুল মুন্তাসিরা ঃ ১৪৩, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ২০, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৮২, আল মাসনূ ঃ ১২৩, কাশফুল খাফা ঃ ২/৬৪, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৩৬৮, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৫১

আলেম ও তালেবে ইলমের বরকতে কবরের আযাব মাফ

٢٢–إن العالم والمتعلم إذا مرا على قرية، فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما.

২২–"যখন কোন আলেম বা তালেবে ইলম কোন জনপদ অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ তাআলা (তাঁদের বরকতে) চল্লিশ দিনের জন্য সে জনপদের কবরস্থানের আযাব মাফ করে দেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে এটি লোকসমাজে প্রচলিত। অথচ তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও জাল।

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) এবং আল্লামা কাউকজী (রহঃ) বলেনঃ لا أصل له "এর কোন ভিত্তিই নেই।" –আল মাসনূ ঃ ৬৫, কাশফুল খাফা ঃ ১/২২১, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৪২, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ২৬

জান্নাতীরাও আলেমের মুখাপেক্ষী

٢٣–إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة، وذلك أنهم يزورون الله كل جمعة، فيقول: تمنوا علي ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء، فيقولون: ما ذا نتمنى على ربنا ؟ فيقولون: تمنوا كذا كذا. فهم محتاجون إليهم في الجنة.

২৩–"জান্নাতবাসীরা জান্নাতে গিয়েও উলামায়ে কেরামের প্রয়োজন অনুভব করবে। তা এইভাবে যে, প্রতি শুক্রবারে জান্নাতীরা যখন আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন, তোমাদের মনে যা চায় তাই আমার নিকট কামনা কর।

"জান্নাতীরা তখন উলামায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বলবে, (আমাদেরকে বলে দিন) আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট কী কী কামনা করব? তারা বলবেন, তোমরা (আল্লাহ তাআলার নিকট) অমুক অমুক বস্তু কামনা কর। সুতরাং তারা জান্নাতে গিয়েও উলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী হবে।"

উলামায়ে কেরাম হলেন দ্বীনের ধারক বাহক, নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীর অবর্তমানে উম্মতের সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যাস্ত। কুরআন মাজীদে এবং বহু সহীহ হাদীসে উলামায়ে কেরামের ফযীলত, গুরুত্ব এবং তাঁদের প্রয়োজনীয়তার কথা এসেছে। ৯৫-৯৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

তবে উপরের বক্তব্যটি হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়; যদিও বহু মানুষের মুখে তা হাদীসে রাসূল হিসেবে প্রসিদ্ধ।

আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন, এটি জাল হাদীস। –মীযানুল ইতিদাল ঃ ৩/৪৩৬-৪৩৭

আল্লামা তাহের পাটনী, ইমাম সয়ূতী, ইবনে আররাক, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা শাওকানী (রহঃ) প্রমুখও একই কথা বলেছেন।

–তাযকেরাতুল মাওযূআত ঃ ১৮, যাইলুল মাওযূআত ঃ ৪০, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ১/২৭৬, আল মাসনূ ঃ ৬৪-৬৫, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৩৬৫

শবে বরাতের গোসল

২৪–"যে ব্যক্তি বরাতের রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোসল করবে, তার গোসলের প্রতি ফোটা পানির পরিবর্তে তার আমলনামায় ৭০০ (সাতশত) রাকাআত নফল নামাযের সাওয়াব লেখা হবে।"

শবে বরাত বা শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত একটি বরকতময় রাত। এর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত

হয়েছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীতে দেখা যেতে পারে।[১]

উল্লেখ্য, শবে বরাতের আমল সম্পর্কে অনেকেই চরম বাড়াবাড়ি কিংবা শিথিলতার শিকার। কেউ তো শবে বরাতে শরীয়তের স্বীকৃত আমলকে অস্বীকার করেছে। আবার কেউ কেউ স্বীকৃত নয় এমন অনেক কিছুকেই নিজেদের পক্ষ থেকে পালন করে যাচ্ছে। এমনকি সেগুলো প্রচলনের জন্যে জাল হাদীস বর্ণনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না।

শবে বরাতে গোসলের ফযীলতসম্বলিত বক্তব্যটিও অনুরূপ একটি জাল হাদীস। এর কোনই ভিত্তি নেই।

দ্রষ্টব্য ঃ যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা, যাইলু তানযীহিশ শরীয়া, মাহে শা'বান ও শবে বরাত ঃ ফাযায়েল ও মাসায়েল।

শবে কদরের গোসল

২৫—"যারা শবে কদরে ইবাদতের নিয়তে সন্ধ্যায় গোসল করবে, তাদের পা ধোয়া শেষ হতে না হতেই পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"

শরীয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। তাই পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে অথবা স্বাস্থের প্রয়োজনে যে কোন সময় গোসল করতে কোন বাধা নেই। অবশ্য শরীয়ত যেমন পবিত্রতা অর্জনের জন্যে গোসল ফরয করেছে তেমনি সম্মিলিত ইবাদতের সময় গোসল করাকে এমনকি সুগন্ধি ব্যবহার করাকে সুন্নাত ও মুস্তাহাব বলেছে। যেমন ঃ জুমুআ ও দুই ঈদের দিনে। আর যেখানে সম্মিলিত ইবাদতের বিধান নেই, সেখানে গোসলেরও নির্দেশ নেই।

১—লাতায়িফুল মাআরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযায়েফ ঃ ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) ১৫১-১৫৭

শবে কদরে যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকে সম্মিলিত কোন ইবাদতের বিধান নেই, তাই শরীয়তে বিশেষভাবে এ রাতে গোসলের হুকুম থাকার কথা নয়; তার উপর গোসলের ফযীলতের কথা তো কল্পনাই করা যায় না।

তাই শবে কদরে গোসলের ফযীলত সম্পর্কে আলোচিত হাদীসটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দ্রষ্টব্য ঃ যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা, যাইলু তানযীহিশ শরীয়া, হাশিয়াতু তাহতাভী আলাল মারাকী ঃ ২২৯, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৩/৪২৭, আল বাহরুর রায়িক ঃ ২/৫২

অবশ্য শবে কদরের ফযীলত এবং এ রাতে ইবাদতের গুরুত্ব একটি অতি সুস্পষ্ট এবং প্রমাণিত বিষয়।

শবে কদরের ফযীলত

শবে কদরের বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে একটি পূর্ণ সূরা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"আমি একে (কুরআন মাজীদকে) নাযিল করেছি শবে কদরে। আপনি কি জানেন শবে কদর কী? শবে কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল) আপন প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে অবতীর্ণ হয়। (আর এ রাত) আগা-গোড়া শান্তি যা সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।" –সূরা কদর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

"যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে, সাওয়াবের আশায় দণ্ডায়মান হবে অর্থাৎ ইবাদত করবে, তার পিছনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।" –সহীহ্ বুখারী ঃ ১/২৭০ হাদীস ২০১৪

লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত্র কোনটি এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

"হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।" –সহীহ্ বুখারী ঃ ১/২৭০, হাদীস ২০১৭

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ذكره المنذري وقال : إسناده حسن إن شاء الله.

"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন এক মাস উপস্থিত হয়েছে, যার মধ্যে এমন এক রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত হল, সে যেন সকল মঙ্গল থেকেই বঞ্চিত হল। আর একমাত্র বঞ্চিত ব্যক্তিই সে রাতের মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।" –সুনানে ইবনে মাজা ঃ ১/১১৯, হাদীস ঃ ১৬৪৪

ত্রিশ তারাবীর ত্রিশ ফযীলতসম্বলিত জাল হাদীস [১]

২৬–"একদা হযরত আলী (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযানের তারাবীর ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইরশাদ করেন ঃ

"১. যে ব্যক্তি রমযানের প্রথম রাতের তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার পাপসমূহ এইভাবে মুছে দেবেন, যেন সে সদ্য-প্রসূত-শিশু।

২. যে ব্যক্তি রমযানের দ্বিতীয় রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে এবং তার মুসলমান পিতা-মাতাকেও ক্ষমা করে দেবেন।

৩. যে ব্যক্তি রমযানের তৃতীয় রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহর আরশ থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করতে থাকবে যে, তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেছে; সুতরাং তুমি নতুন করে কাজ আরম্ভ কর।

৪. যে ব্যক্তি রমযানের চতুর্থ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, তাকে আসমানী চার কিতাব তথা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন তেলাওয়াত করার সমপরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হবে।

৫. যে ব্যক্তি রমযানের পঞ্চম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, তার আমলনামায় মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসায় নামায পড়ার পরিমাণ সাওয়াব লেখা হবে।

৬. যে ব্যক্তি রমযানের ষষ্ঠ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, সে ফেরেশতাদের কেবলা বাইতুল মা'মূর তাওয়াফ করার সাওয়াব পাবে এবং সমস্ত পাথর তার জন্যে মাগফেরাতের দুআ করতে থাকবে।

১–উক্ত জাল হাদীসটি বহুল প্রচলিত একটি লিফল্যাট থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ জাল হাদীসটি 'দুররাতুস সালেহীন ঃ ৮৭-৮৮ (বাংলা), দুররাতুন নাসেহীন-এর উর্দূ অনুবাদ 'কুররাতুল ওয়ায়েযীন ঃ ১/ ৩১-৩৪ সহ কয়েকটি কিসসা কাহিনীর অনির্ভরযোগ্য পুস্তকেও রয়েছে।

৭. যে ব্যক্তি রমযানের সপ্তম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, সে ঐ ব্যক্তির সমান সাওয়াব পাবে, যে ফেরাউন ও হামানের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আঃ)-এর যুদ্ধ দেখেছে এবং হযরত মূসা (আঃ)কে সাহায্য করেছে।

৮. যে ব্যক্তি রমযানের অষ্টম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ন্যায় রহমত বর্ষণ করবেন।

৯. যে ব্যক্তি রমযানের নবম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাবর ইবাদত করার সাওয়াব দান করবেন।

১০. যে ব্যক্তি দশম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দুনিয়া ও আখেরাতে রহমত বর্ষণ করবেন।

১১. যে ব্যক্তি একাদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, দুনিয়া থেকে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে আখেরাতে যাবে, যেন সে সদ্য-প্রসূত-শিশু।

১২. যে ব্যক্তি রমযানের দ্বাদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, কিয়ামতের ময়দানে তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।

১৩. যে ব্যক্তি রমযানের ত্রয়োদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, কিয়ামতের ময়দানে সে সকল অনিষ্ট হতে মুক্ত থাকবে এবং মুসীবত তার কাছেও আসবে না।

১৪. যে ব্যক্তি রমযানের চতুর্দশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, ফেরেশতারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, সে তারাবীর নামায আদায় করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

১৫. যে ব্যক্তি রমযানের পঞ্চদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলার আরশ ও কুরসী বহনকারী ফেরেশ্তারা তার জন্যে দু'আ করবে।

১৬. যে ব্যক্তি রমযানের ষষ্ঠদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির ফরমান লিখে দেবেন।

১৭. যে ব্যক্তি রমযানের সপ্তদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নবীদের সমান সাওয়াব দান করবেন।

১৮. যে ব্যক্তি রমযানের অষ্টাদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, পুরস্কারস্বরূপ একজন ফেরেশ্তা ঘোষণা করবে যে, তার ও তার পিতা-মাতার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা থাকবেন।

১৯. যে ব্যক্তি ঊনবিংশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করবেন।

২০. যে ব্যক্তি রমযানের বিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদ ও সালেকীনের সাওয়াব দান করবেন।

২১. যে ব্যক্তি রমযানের একুশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতের মধ্যে একটি নূরের বালাখানা তৈরী করবেন।

২২. যে ব্যক্তি রমযানের বাইশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে তাকে এমনভাবে উঠাবেন যে, তার কোন দুশ্চিন্তা এবং ভয় থাকবে না।

২৩. যে ব্যক্তি রমযানের তেইশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর তৈরী করবেন।

২৪. যে ব্যক্তি রমযানের চব্বিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার চব্বিশটি দুআ কবুল করবেন।

২৫. যে ব্যক্তি রমযানের পঁচিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কবরের আযাব দূর করে দেবেন।

২৬. যে ব্যক্তি রমযানের ছাব্বিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশ বছরের ইবাদতের সাওয়াব দ্বারা তাকে পুরস্কৃত করবেন।

২৭. যে ব্যক্তি রমযানের সাতাশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, সে আলোর গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।

২৮. যে ব্যক্তি রমযানের আটাশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তার মর্যাদাকে একহাজার গুণ বৃদ্ধি করবেন।

২৯. যে ব্যক্তি রমযানের ঊনত্রিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এক হাজার কবূল হজ্জের সাওয়াব দান করবেন।

৩০. যে ব্যক্তি রমযানের ত্রিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের সর্বপ্রকার ফল খেতে হুকুম করবেন, সালসাবীল নদীতে গোসল করতে বলবেন এবং হাউজে কাউসারের পানি পান করতে বলবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্বোধন করবেন যে, আমি তোমার প্রভু এবং তুমি আমার বান্দা।"

বহু পাঠক এ দীর্ঘ রেওয়ায়াতটি দেখামাত্রই এর অসারতা বুঝতে পেরেছেন; তবুও নিম্নে বিষয়টির আরো সামান্য ব্যাখ্যা প্রদান করা হল।

আমরা যাকে 'তারাবীর নামায' বলে থাকি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাকে 'কিয়ামে রমযান' বলা হত। পরবর্তীতে তারাবীহ নামকরণ করা হয়।

'তারাবীহ' শব্দটি 'তারবীহাতুন'-এর বহু বচন। তার অর্থ হল, একবার আরাম করা।

হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে যখন সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মতিতে নিয়মিতভাবে একই জামাআতে তারাবীর নামায শুরু হল, তখন তিনিই ইমাম সাহেবকে (হাফেয সাহেবকে) প্রতি চার রাকাআত অন্তর আরামের জন্যে বিরতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই বিরতিকেই 'তারবীহা' বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে এ নামাযে কয়েকটি তার্বীহা থাকাতে তার নাম তারাবীহ্ হয়ে যায়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তাকে 'কিয়ামে রমযান' বলা হত। তাই কোন সহীহ হাদীসে 'তারাবীহ' শব্দ পাওয়া যায় না।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে ঃ

من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াবের নিয়তে রমযান মাসে ইবাদত করবে, তার আগের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।"-সহীহ বুখারী ঃ ১/২৬৯, হাদীস ২০০৯

অন্য হাদীসে এ ইরশাদও রয়েছে ঃ

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াবের নিয়তে শবে কদরে ইবাদত করবে, তার আগের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" -সহীহ বুখারী ঃ ১/২৭০, হাদীস ২০১৪

উভয় হাদীসে 'কিয়াম' দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাত জেগে নামায এবং নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকা; যদিও তাতে শব্দের ব্যাপকতায় অন্যান্য নফল ইবাদতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে।

পাঠকগণ যখন অবগত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে রমযান মাসের রাতের নামাযের নাম তারাবীই ছিল না

এবং কোন সহীহ্ হাদীসেও এ শব্দ নেই, তখন আপনারা আশা করি সহজেই বুঝতে পেরেছেন যে, আলোচ্য রেওয়ায়াতটি যা আজকাল হ্যান্ডবিল ইত্যাদির মাধ্যমে খুব প্রচার করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল রেওয়ায়াত। দ্বীন ইসলামের শত্রু অথবা গণ্ড মূর্খ এবং বেদ্বীন ওয়ায়েযরা এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হাদীস বলে প্রচার করছে।

'যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা', 'যাইলু তানযীহিশ শরীয়াতিল মারফূআ' ইত্যাদি কিতাবে উক্ত রেওয়ায়াতটির ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে সারগর্ভ, দলীলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণ পাঠকরাও এর অসারতা ও জাল হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। কেননা, তাতে বহু কথা এমন রয়েছে, যা সুস্পষ্ট বাতিল। একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে যে, এ ধরনের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হতে পারে না। যেমন ঃ নবম রাতে তারাবীর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি উক্ত রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান ইবাদত করার সাওয়াব দান করবেন।"

কোন্ মুসলমান না জানে যে, সকল বুযুর্গ এবং সকল সাহাবীর সারা জীবনের ইবাদতও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের সমান হওয়া তো' দূরের কথা, তার ধারে-কাছেও পৌছতে পারবে না। কাজেই যে কোন ব্যক্তির কোন একটি রাতের তারাবীর সাওয়াব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

আরো মজার ব্যাপার ঘটেছে! সতেরতম রাতের তারাবীর ফযীলতের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি রমযানের সপ্তদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নবীদের সমান সাওয়াব দান করবেন।"

এর পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, এক তারাবীহ দ্বারাই কোন ব্যক্তি সকল নবী থেকে উত্তম হয়ে যাবে। কেননা, সে একাই সকল নবীর সাওয়াব পাবে আর

প্রত্যেক নবীর কাছে তো শুধুমাত্র তাঁর নিজের সাওয়াবই আছে। আল্লাহ তা'আলা রোজ হাশরে এ ধরনের দাজ্জালদের মুখ কালো করে দিন!

শবে কদরের ব্যাপারেও অসামঞ্জস্য কথা বলা হয়েছে! শবে কদর যা রমযানের শেষ দশকের বে-জোড় রাতসমূহের কোন এক রাত। এ রাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ خير من الف شهر "হাজার মাস থেকেও উত্তম।"

সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদত করবে, তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" –সহীহ বুখারী ঃ ১/২৭০, হাদীস নং ২০১৪

কিন্তু আলোচ্য রেওয়ায়াতটির আবিষ্কারক শবে কদরে তারাবীর যে ফযীলত বর্ণনা করেছে, তা অন্যান্য রাতের তারাবীর তুলনায় অনেক কম। বস্তুত ঃ دروغ گو را حافظه نه باشد "মিথ্যুকের স্মরণশক্তি থাকে না।"

তারাবীর ফযীলতসম্বলিত সুদীর্ঘ রেওয়ায়াতটি জাল হওয়ার জন্যে এ কথাই যথেষ্ট যে, তার কোন সনদ নেই এবং হাদীসের কোন কিতাবেও তা বিদ্যমান নেই।

উলামায়ে কেরাম বিশেষত আয়িম্মায়ে হাদীস এবং আয়িম্মায়ে ফিক্‌হ সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে ঃ

من علامة كون الحديث موضوعا أن الخبر الذي إذا فتش عنه أهل العلم ولم يظفر به في جملة الأخبار، بعد استقرار السنن، فإنه يعلم كذبه، لعلمنا أن الأخبار قد دونت، ورواية الخبر بعد ما دونت الأخبار هي رواية لما دون.

وننظر فإذا لم يوجد ذلك علمنا كذبه، لأنا لم نشاهده كما

لو قال الراوي: (هذا الخبر في الكتاب الفلاني)، فلا نشاهده فيه. قاله القاضي أبو الحسين البصري المتوفي سنة ٤٣٦هـ، في كتابه «المعتمد في أصول الفقه» ٧٩:٢، كما في حاشية «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص ٢٤٣ للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى.

অর্থাৎ জাল হাদীসের একটি আলামত হল হাদীসের কিতাবসমূহে অনুসন্ধান করে মুহাদ্দেসীনে কেরামের তা না পাওয়া। যেহেতু সকল হাদীস সংকলিত হয়েছে। আর সে সংকলনগুলোই হাদীসের একমাত্র উৎস। তাই হাদীসের কিতাবসমূহে তালাশ করা হবে। না পাওয়া গেলে বুঝা যাবে তা মিথ্যা। কেননা আমরা দেখছি যে, হাদীসটি নেই।" –আল্ মুতামাদ ফী উসূলিল ফিক্হ ঃ ২/৭৯–লামাহাত মিন তারীখিস সুন্নাতি ওয়া উলূমিল হাদীস ঃ ২৪৩ (টীকা)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের বুঝ দান করুন এবং জাল হাদীসসমূহ হতে বিরত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ মোতাবেক আমল করত তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন; আমীন।[১]

---

(١)–قال الراقم: هذه نكارات صارخة في هذه الرواية آثرت ذكرها لقربها إلى أذهان العوام وأما أهل الفهم والفقه في الدين ممن عقل عن الله ورسوله فيعلمون فيها نكارات أشد وأشنع، من تلك النكارات التي هي في الظاهر أبشع وأنكر.

فمن ذلك ركة ألفاظه، وركة معناها، ومباينته مزاج النبوة، ومفارقتها الأسلوب النبوي في أحاديث الفضائل التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم وثبتت. وهذه أمور يدركها أهل الفن ممن كثرت مزاولته بالسنة النبوية والأحاديث الثابتة، وطالت ممارسته وصحبته بها، فيميز ما ناسب شأن النبوة ومنهجها مما لا يناسبهما .

فمثل هذه النكارة التي يدركها أصحاب الذوق والوجدان الصحيحين المسلمين بحكم الشرع والعقل: لنكارة قطعية النكارة، حاكمة بقطعية عدم ثبوت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتبيين مثل هذه النكارة بالألفاظ تهوين من أمرها وتخفيف من شأنها في

বিদায়ী জুমুআয় উম্‌রী কাযার সাওয়াব

২৭-من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة.

২৭-"যে ব্যক্তি রমযান মাসের শেষ জুমুআয় ফরয নামাযের মধ্য থেকে কোন একটি কাযা নামায আদায় করবে, সেটি তার জীবনের সত্তর বছরের কাযা নামাযের জন্যে যথেষ্ট হবে।"

এমনিতেই রমযান মাস অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। এই মাসের শেষ দশকের গুরুত্ব আরো বেশী। তার উপর আবার শুক্রবার। সব মিলে রমযানের এই শেষ জুমুআর দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই দিন সম্পর্কে মনগড়া কোন ইবাদত, নামায ইত্যাদি প্রবর্তন করা যাবে। নিজ থেকে কোন ফযীলত আবিষ্কার করা যাবে। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, এই দিনটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে অনেক রসম-রেওয়াজ ও জাল হাদীস সৃষ্টি হয়েছে। রমযান মাসের এই শেষ জুমুআর ফযীলত সম্পর্কে আজগুবি অনেক কিছুরই জনশ্রুতি আছে।[১]

তন্মধ্যে উপরোক্ত জাল হাদীসটি অন্যতম। অনেকের নিকট তা 'উমরী কাযার হাদীস' নামেও প্রসিদ্ধ। মূলত তা জাল হাদীস বৈ কিছুই নয়।

أنظار غيرهم ممن لم يدركوا ما أدركه أولئك. ولا يمكن التوسع في ذلك بأكثر من ذلك في مثل هذه المناسبة.

১-জুমুআতুল ওয়াদার (জুমুআতুল বিদার) আজগুবি বিষয়াবলী বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন ঃ ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان (রদউল ইখওয়ান আন মুহদাসাতি আখিরী জুমুআতি রমযান)

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহঃ) এ কিতাবে 'যাদুল লাবীব', 'আনীসুল ওয়ায়েযীন', 'আওরাদু রাহাতিল আবেদীন' এবং 'মিফতাহুল জিনান' নামক অনির্ভরযোগ্য কয়েকটি পুস্তিকার কতিপয় জাল হাদীস উল্লেখপূর্বক সেগুলোর অসারতা দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات.

"এটি নিশ্চিত বাতিল কথা; কেননা এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে যে, কোন একটি ইবাদত বহু বছরের অনাদায়কৃত ইবাদতের বদল হতে পারে না।" –আল মাসনূ ঃ ১৯১, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১২৫

এই উমরী কাযার হাদীস সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন ঃ هذا موضوع بلا شك "নিঃসন্দেহে এটি জাল হাদীস।" –আল ফাওয়াইদুল মাজমূআ ঃ ৫৪, আল আসারুল মারফূআ ঃ ৮৫

আল্লামা আজলুনী এবং আল্লামা কাউকজী (রহঃ)ও একে জাল ও ভিত্তিহীন বলেছেন। –কাশফুল খাফা ঃ ২/২৭২ , আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৯১

আরো দ্রষ্টব্য ঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ঃ ৫/২৪২, উজালায়ে নাফেয়া ঃ ২৪

রমযানের শেষ জুমুআর নামায সম্পর্কে আরো দু'টি জাল হাদীস ঃ

٢٨–من صلى في آخر جمعة من رمضان أربع ركعات قبل الظهر كانت كفارة لفوائت عمره.

২৮–"যে ব্যক্তি রমযানের শেষ জুমুআয় যোহরের পূর্বে চার রাকাআত নামায পড়বে, তা তার সারা জীবনের কাযা নামাযের কাফফারা হয়ে যাবে।"

এটিও জাল হাদীস। দ্রষ্টব্য ঃ রদউল ইখওয়ান ঃ ৪১-৪৪–আত তালীকাতুল হাফেলা আলাল আজবিবাতিল ফাযেলা ঃ ৩২

٢٩–من فاتته صلوات ولا يدري عددها فليصل يوم الجمعة أربع ركعات نفلا بسلام واحد، ويقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة آية الكرسي سبع مرات، وإنا أعطيناك الكوثر خمس عشرة مرة.

قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن فاتته صلوات سبع مئة سنة كانت هذه الصلاة كفارة لها»، قالت الصحابة: إنما عمر الإنسان -أي من هذه الأمة- سبعون سنة أو ثمانون سنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت كفارة لما فاته وما فات من الصلوات من أبيه وأمه ولفوائت أولاده ... ».

২৯–"যার এত অধিক নামায কাযা হয়েছে যে, তার রাকাআত সংখ্যা জানা নেই, সে যেন জুমুআর দিনে এক সালামে চার রাকাআত নফল নামায পড়ে নেয়, যার প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর সাত বার আয়াতুল কুরসী, পনের বার সূরা কাউসার পড়বে।

"হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শোনেছি যে, সাতশ' বছরের নামায কাযা হয়ে থাকলেও উক্ত নামায তার জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে। এ কথা শোনে সাহাবীগণ বললেন, মানুষ তো সত্তর/আশি বছরের হায়াত পেয়ে থাকে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তার নিজের, পিতা-মাতার ও সন্তানদের কাযা নামাযের জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে।"

এটি যে একটি জাল রেওয়ায়াত তা সাধারণ অনুভূতিসম্পন্ন লোকের কাছেও অস্পষ্ট নয়। তথাপি বিস্তারিত জানার জন্যে দেখা যেতে পারে : রদউল ইখওয়ান : ৪০-৪৪–আত তালীকাতুল হাফেলা : ৩১-৩২

আযান ও ইকামতের শব্দসমূহের শেষ অক্ষর সাকিন হবে

٣٠-الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم.

৩০–"আযান, ইকামত ও তাকবীরে জযম হবে।"

আযান, ইকামত ও তাকবীরের বাক্যের শেষ অক্ষরটিতে জযম হওয়ার পক্ষে অনেকে উক্তিটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। তারা একে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবেই উপস্থাপন করে থাকেন। বাস্তবে এটি হাদীস নয়; বরং প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী (রহঃ, ইন্তেকাল ৯৫হিঃ)-এর উক্তি।

আল্লামা সাখাবী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

لا أصل له في المرفوع ... إنما هو من قول إبراهيم النخعي.

"মারফূ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই। ... ; বরং এটি ইবরাহীম নাখায়ী (রহঃ)-এর উক্তি।" –আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ১৯৩

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী এবং আল্লামা লাখনোভী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একই মত পোষণ করেছেন।

মোটকথা, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় এবং বাক্যটির যে অর্থ করা হয় তাও ঠিক নয়। কেননা, সাধারণত মনে করা হয় যে, এখানে جزم (জয্ম) শব্দটি সাকিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উক্তিটির এরূপ অর্থ করা হয় যে, "আযান, ইকামত ও তাকবীরের শেষ অক্ষর সাকিন করে পড়তে হবে।"

অথচ জযম শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও তাবেঈদের যুগে এই অর্থে ব্যবহৃত হত না; বরং এ স্থলে জযম দ্বারা উদ্দেশ্য হল অস্থানে মদ না করা। অর্থাৎ আযান, ইকামত ও তাকবীরের শব্দগুলোতে যেখানে মদ বা টান নেই সেখানে টেনে না পড়া এবং যেখানে টান আছে সেখানে অতিরিক্ত না করা। অবশ্য একথা ঠিক যে, আযান, ইকামত ও তাকবীরের শব্দগুলোর শেষ বর্ণ সাকিন হবে। তবে এ মাসআলাটির দলীল ইবরাহীম নাখায়ীর (রহঃ) উক্ত কথাটি নয়; বরং মাসআলাটির ভিন্ন দলীল রয়েছে, যা মাআরিফুস সুনান সহ অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ আত্তালখীসুল হাবীর ঃ ১/২২৫, আলহাভী লিল্ফাতাভী ঃ ২/৭১, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ৩৮, আদ্দুরারুল মুনতাসিরা ঃ ১০৪, আল মাসনূ ঃ ৮৩, মাওযূআতে কুবরা ঃ৫৬, আসসিআয়া ঃ ২/১৪৯, ফাতাওয়া শামী ঃ ১/৩৮৬, ৪১৮

আযানের সময় কথা বললে ঈমান যাওয়ার আশংকা রয়েছে

٣١-من تكلم عند الأذان خيف عليه زوال الإيمان.

৩১-"যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলবে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।"

আযানের সময় নিয়ম হল আযানের জবাব দেওয়া। মুআযযিন যে শব্দগুলো বলবে, শ্রোতারাও সে শব্দগুলোই বলবে। তবে حي على الصلاة (হায়্যা আলাসসালাহ) এবং حي على الفلاح (হায়্যা আলাল ফালাহ) বলার পর শ্রোতারা لا حول ولا قوة إلا بالله (লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) পড়বে। তারপর আযান শেষে যে কোন দরূদ পাঠ করবে। অবশেষে আযানের এ দুআ পাঠ করবে ঃ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدان الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

এগুলো সবই সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে 'আযানের সময় কথা বললে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে' এ কথাটি কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

আল্লামা সাগানী (রহঃ) একে জাল বলেছেন। -রিসালাতুল মাওযূআত ঃ ১২, কাশফুল খাফা ঃ ২/২২৬, ২৪০

আযানের সময় কথা বললে ৪০ বছরের নেকী নষ্ট হয়ে যায়

কোন কোন এলাকায় এ কথাও প্রসিদ্ধ আছে যে ঃ

৩২-"আযান দেওয়ার সময় এবং আযান শ্রবণের সময় দুনিয়াবী কোন কথা বললে চল্লিশ বছরের নেকী নষ্ট হয়ে যায়।"

এ কথাও ঠিক নয় এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। –যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা

সহীহ হাদীসের আলোকে আযানের সময় শ্রোতাদের দায়িত্ব পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। সে মোতাবেক আমলে যত্নবান হওয়াই উচিত।

৩৩–আযান বা ইকামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনে আঙ্গুলে চুমো খাওয়া ...

আযান কিংবা ইকামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসলে কোন কোন লোককে তর্জনী আঙ্গুলদ্বয়ে চুমো খেয়ে তা চোখে বুলিয়ে দিতে দেখা যায়।

তাদের এই আমলটি মূলত 'মুসনাদে দায়লামী' (যা বাতিল ও মাওযূ রেওয়ায়াতে ভরপুর)-এর নিম্নোক্ত জাল রেওয়ায়াতের উপর নির্ভরশীল ঃ

إن أبا بكر لما سمع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، قاله، وقبل باطن الأنملتين السبابتين، ومسح عينيه، فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي.

"হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন মুআযযিনকে 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলতে শোনলেন, তখন তিনিও তা বললেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ে চুমো খেয়ে তা চোখে বুলিয়ে নিলেন। (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার দোস্তের ন্যায় আমল করবে, তার জন্যে আমার সুপারিশ অবধারিত।"

হাফেয সাখাবী (রাঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ এটি প্রমাণিত নয়। –আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৪৫০-৪৫১

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

الأحاديث التي رويت في تقبيل الأنامل وجعلها على العينين عند سماع

اسمه صلى الله عليه وسلم عن المؤذن في كلمة الشهادة كلها موضوعات.

"মুআয্যিনের শাহাদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনে আঙ্গুলে চুমো খাওয়া এবং তা চোখে মুছে দেওয়ার ব্যাপারে যতগুলো রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে সবগুলোই জাল ও বানোয়াট।" –তাইসীরুল মাকাল–ইমাদুদ্দীন ঃ ১২৩, প্রকাশকাল ২১–১৯৭৮ –রাহে সুন্নত ঃ ২৪৩

এটা জাল হাদীস–শুধু তাই নয়; বরং এ ব্যাপারে কোন সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদ থেকেও কিছু বর্ণিত নেই।

আল্লামা লাখনোভী (রহঃ)ও এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার পর লেখেন ঃ

والحق أن تقبيل الظفرين عند سماع اسم النبي فى الإقامة وغيرها كلما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام مما لم يرو فيه خبر ولا أثر، ومن قال به فهو المفتري الأكبر، فهو بدعة شنيعة لا أصل لها في كتب الشريعة، ومن ادعى فعليه البيان، ولا ينفع الجدال المورث إلى الخسران.

"সত্য কথা হল, ইকামত কিংবা অন্য কোথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শ্রবণ করামাত্রই নখে চুমো খাওয়া (এবং তা চোখে বুলিয়ে দেওয়া) সম্পর্কে কোন হাদীস বা সাহাবীর কোন আসর বা আমল বর্ণিত হয়নি। যে তা দাবী করবে সে চরম মিথ্যাবাদী এবং এটি একটি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট বিদআত; শরীয়তের কিতাবসমূহে যার কোন ভিত্তিই নেই।" –সিআয়া ঃ ২/৪৬

মোল্লা আলী কারী, আল্লামা তাহের পাটনী এবং আল্লামা আজলূনী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামও হাফেয সাখাবী (রহঃ)-এর মত উল্লেখপূর্বক তদনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

–আল মাসনূ ঃ ১৬৮-১৭০, তাযকেরাতুল মাওযূআত ঃ ৩৪, আল

ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/৩৯, কাশফুল খাফা ঃ ২/২০৬-২০৭, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল মাওযূআ

আরো দ্রষ্টব্য ঃ আল মাদ্‌খাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফ ঃ ৫৩[১]

১–যে ভাইদের মধ্যে এ আমলটি প্রচলিত তারা একটু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে আন্তরিকভাবে ভেবে দেখুন, যদি এ আমলটি হাদীস বা সাহাবী কর্তৃক আমলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য মোতাবেক এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস বা সহীহ আসর (সাহাবীদের উক্তি) বর্ণিত নেই; সবই জাল ও বানোয়াট। তাই এ আমল তরক করে মাসনূন আমলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। যেমন আযানের জবাব দেওয়া; আযান শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা। এরপর আযানের দুআ পড়া।

আর যদি তারা এ আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ করে থাকেন তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে, তা মহব্বত ও শ্রদ্ধা নিবেদনের আদব মোতাবেক হতে হবে। আর তাঁর প্রতি মহব্বতের আদব আমাদেরকে তাঁরই শরীয়ত থেকে শিখতে হবে। নতুবা নিজের মনচাহি পদ্ধতিতে যদি মহব্বত নিবেদন শুরু করা হয় তাহলে সুন্নতের বিপরীত কার্যকলাপের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিকৃষ্টতম কাজ-বিদআতের শিকার হতে হবে।

আর যদি অনুমানভিত্তিক এবং মহব্বত প্রকাশের দাবীতেই এ আমল করা হয় তাহলে কেউ এরূপও বলতে পারে যে, নামাযের তাশাহহুদ ও দরূদের যে যে স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক আসবে সেখানেও এ আমল সুন্নত বা মুস্তাহাব হবে? তেমনিভাবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের সময়ও সরাসরি বা ইঙ্গিতে যে যে স্থানে তাঁর নাম মুবারক আসবে সেখানেও এ আমল সুন্নত বা মুস্তাহাব হবে?

কেউ এ কথাও বলতে পারে যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারকের মহব্বতের ভিত্তিতেই এ আমল করা হয়ে থাকে (এবং প্রত্যেক মুসলমানের ভিতর রাসূলের মহব্বত থাকা জরুরী এবং আছেও) তাহলে মুআয্‌যিনের মুখে চুম্বন করা উচিত যার ঠোঁট ও মুখ থেকে এ মুবারক নাম উচ্চারিত হয়েছে। আপন বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে তো তাঁর মুবারক নাম উচ্চারিত হয়নি কিংবা তাতে লেখাও নেই–একে কেন চুম্বন কর?

মোটকথা, কেবল অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে কোন ইবাদত সাব্যস্ত হয় না। ইবাদত শুধু শরীয়তদাতার শিক্ষা ও হেদায়াতের আলোকেই সাব্যস্ত হতে পারে। তাই এ আমলের ব্যাপারে যখন জাল রেওয়ায়াত ব্যতিরেকে কোন সহীহ হাদীস ও কোন সাহাবীর আসরও নেই তদুপরি এ আমলকে সুন্নত মনে করা বা এ কাজে সাওয়াবের আশা করা কোন আশেকে রাসূল বা আশেকে সুন্নতের পক্ষ থেকে হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ ও জ্ঞান দান করুন এবং নবীর মহব্বত ও ইশ্‌কের অসার দাবী নয়, বরং নবীর মহব্বত ও ইশকের হাকীকত দান করুন এবং সুন্নতের অনুসরণের নেয়ামত দ্বারা আমাদেরকে সৌভাগ্যবান করুন। আমীন।

....

وقد وقع هنا عن الملا علي القاري رحمه الله تعالى، في كتابه «الموضوعات الكبرى» -دون «المصنوع»- أمر اقتضى التنبيه، وذلك أنه ذكر أولا الحديثَ المبحوثَ عنه ثم قال: «ذكره الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال السخاوي: لا يصح، وأورده الشيخ أحمد الرداد في كتابه «موجبات الرحمة» بسند فيه مجاهيل، مع انقطاع، عن الخضر عليه السلام، وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه البتة».

ثم عقبه القاري قائلا: «وإذا ثبت رفعه على الصديق فيكفي العمل به، لقوله عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين».

وفي هذا ذهول شديد من القاري رحمه الله تعالى، فإن الروايةَ للحديث المذكور واحدة، مشتملة على القسم المرفوع والقسم الموقوف معا، ولم يرو فيه عمل الصديق رضي الله تعالى عنه بإسناد آخر غير سند الديلمي المذكور الذي ورد به الحديثُ، القسمُ المرفوعُ منه والموقوفُ، والذي قال فيه السخاوي: لا يصح، يعني أنه موضوع، كما هو المفهومُ من هذا الإطلاق في كتب الضعفاء والموضوعات.

وإذا كان عمل الصديق لم يرو إلا بهذا الإسناد الموضوع فمن أين يتأتى للقاري أن يقول: «وإذا ثبت رفعه على الصديق ... »!!، ثم بعد ثبوت الرواية عن الصديق -كما يزعمه القاري- كيف تكون موضوعة؟!!

ولا عذر له في قول السخاوي في آخر البحث: «وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه البتة»، فإن السخاوي إنما قال ذلك لأنه أورد في أثناء بحثه عن الحديث روايات عن بعض الصوفية وأشباههم أن التقبيل المذكور كان من عملهم، وكان ذلك ثابتا عنهم، فلأجل هذا قيد عدم الصحة بقوله: (رفعه)، ولا يعني بذلك أن رواية الديلمي المذكورة صحيحة موقوفة، كيف وإنها رواية واحدة موضوعة، لا روايتان، أحدهما مرفوعة، وهي موضوعة، والأخرى موقوفة، وهي صحيحة!!، ولذا قال السخاوي عند ما تكلم على رواية الديلمي: «لا يصح»، وأطلق ذلك ولم يقيده بقوله: (رفعُه).

ولما نقل العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في حاشية «المصنوع» لعلي القاري ص١٦٩-١٧٠، قوله المذكور عن «الموضوعات الكبرى» له، عقبه قائلا:

«فكان تعقبه لا معنى له إلا الخطأ، إذ لم يصح إسناده إلى أبي بكر، ثم هو مرفوع كما

মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা

٣٤-من تكلم بكلام الدنيا فى المسجد أحبط الله أعماله أربعين سنة.

৩৪-"যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে আল্লাহ তাআলা তার চল্লিশ বছরের নেক আমল বরবাদ করে দিবেন।"

এটি লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়।

আল্লামা সাগানী (রহঃ) রিসালাতুল মাওযূআত ঃ পৃষ্ঠা ৫, আল্লামা কাউকজী (রহঃ) আল লুউলুউল মারসূ ঃ পৃষ্ঠা ৭৮-এ একে জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ), আল্লামা আজলূনী (রহঃ) এবং আল্লামা শাওকানী (রহঃ) সাগানী (রহঃ)-এর বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

-আল মাসনূ ঃ ১৮২, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১১৭, কাশফুল খাফা ঃ ২/২৪০, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/৪৪

এ বিষয়ের আরেকটি জাল হাদীস ঃ

٣٥-الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش.

سبق نصه في التعليقة السابقة، والمؤلف يطيب له في كثير من التعقيات حبُّ الاستدراك ولو بتأويل بعيد لا يقوم عليه دليل.

ولا تغتر بقول الطحطاوي في حاشيته على «مراقي الفلاح» آخر (باب الأذان)، بعد ذكره هذا الحديث عن كتاب الفردوس: «وكذا رُوِي عن الخضر، ويمثله يعمل في فضائل الأعمال»، فهو كلام مردود بما قاله الحفاظ، وقد نقل ابن عابدين في «رد المحتار» ١:٢٦٧ بطلان هذا الحديث. وقال الحافظ ابن تيمية في «منهاج السنة» ٣:١٧ :«إن كتاب الفردوس فيه من الأحاديث الموضوعة ما شاء الله ! ...». انتهى ما نقلته من حاشية «المصنوع».

هذا، وإن العجلوني رحمه الله تعالى -كعادته- قد تبع ذهول القاري المذكور، فنقله عنه كما هو، فلا ينبغي الاغترار بذلك، وراجع إن شئت كتاب «المنهاج الواضح» (راه سنت) لمولانا الشيخ سرفراز خان صفدر حفظه الله تعالى ورعاه ص - ٢٤.

৩৫–"মসজিদে (দুনিয়াবী) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন পশু ঘাস খেয়ে খতম করে ফেলে।"

এটিও একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উক্তি।–গিযাউল আল্‌বাব শরহু মান্‌যূমাতিল আদাব ঃ ২/২৫৭–আল মাসনূ ঃ ৯৩ (টীকা)

কাশফুল খাফা ঃ ১/৩৫৪, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৬২, আল-মুগনী আন হাম্‌লিল আস্‌ফার ফিল আস্‌ফার–ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন ঃ ১/২২৩, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/৪৪ ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৩/৩১ ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসের কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি।

উপরোক্ত জালহাদীস এভাবেও বর্ণিত আছে ঃ

٣٦–الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

৩৬–"মসজিদে (দুনিয়াবী) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে।"

এটিও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। –গিযাউল আলবাব শরহু মানযূমাতিল আদাব ঃ ২/২৫৭–আল মাসনূ ঃ ৯৩ (টীকা)

আল্লাহর ঘর মসজিদ হল পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মসজিদের ভিত্তিই হল নামাযের জন্য এবং যিকির, তালীম ও অন্যান্য দ্বীনী আমলের জন্যে। একে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের স্থান বানানো অথবা এ উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া হারাম। তবে কোন দ্বীনী কাজের উদ্দেশ্যে অথবা উযরবশত আরামের জন্যে মসজিদে যাওয়ার পর প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়াবী কোন বৈধ কথাবার্তা বলা জায়েয। তার বৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

দ্রষ্টব্য ঃ সহীহ বুখারী ঃ ১/৬৩, ৬৪ ও ৬৫, মুসাফফা–রদ্দুল মুহতার (শামী) ঃ ১/৬৬২, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৭৮

আংটি পরে নামায পড়ার ফযীলত

ৣ৭–صلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم.

৩৭–"আংটি পরা অবস্থায় এক রাকাআত নামায আংটিবিহীন সত্তর রাকাআতের সমান সাওয়াব।"

উক্তিটি হাদীস নয়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) একে জাল বলেছেন।

–আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৩১৩, আল মাসনূ ঃ ১১৮, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৭৮, কাশফুল খাফা ঃ ২/২৫, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/২৪২, আল-লূউলুউল মারসূ ঃ ৪৭

পাঁচ ওয়াক্ত জামাআতের পাঁচ প্রকার সাওয়াব

ৣ৮–من صلى صلاة الصبح في جماعة فكأنما حج مع آدم خمسين حجة، ومن صلى صلاة الظهر فى الجماعة فكأنما حج مع نوح أربعين حجة أو ثلاثين حجة ...

৩৮–"যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করল, সে যেন হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে পঞ্চাশবার হজ্ব করল। আর যে ব্যক্তি যোহরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করল, সে যেন হযরত নূহ (আঃ)-এর সাথে ৩০/৪০ বার হজ্ব করল ... ।"

আল্লামা সাগানী (রহঃ) একে জাল বলেছেন। –রিসালাতুল মাওযূআত ঃ ৬, কাশফুল খাফা ঃ ২/২৫৭-২৫৮

মুহাদ্দেস মুহাম্মাদ তাহের পাটনী (রহঃ) এবং আল্লামা শাওকানী (রহঃ)ও একে জাল বলেছেন। –তাযকেরাতুর মাওযূআত ঃ ৩৯, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/৫৫

জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ফযীলত ও গুরুত্বসম্বলিত নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত বহু হাদীস রয়েছে। দ্বীনী ইলমের দৈন্যের কারণে

Contents

কতিপয় ইমাম ও ওয়ায়েয সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে এধরনের জাল হাদীস বলে বেড়ান যা অতি জঘন্য গুনাহর কাজ।

পাগড়ীসহ দু'রাকাআতে ৭০ রাকাআত

٣٩-ركعتان بعمامة أفضل من سبعين من غيرها

৩৯-"পাগড়ীবিশিষ্ট দু'রাকাআত নামায, পাগড়ীবিহীন সত্তর রাকাআতের চেয়েও উত্তম।"

পাগড়ী আরবের একটি ঐতিহ্যবাহী পোশাক। ইসলামপূর্ব যুগেও আরবে এই পাগড়ীর ব্যবহার ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ী ব্যবহার করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগেও পাগড়ীর ব্যাপক ব্যবহার পাওয়া যায়। তাঁরা এই পাগড়ী অভ্যাসগত এবং শুধু পোশাক হিসেবেই পরিধান করতেন।

তাঁরা প্রায় সবসময়ই পাগড়ী পরা অবস্থায় থাকতেন। বিশেষত কোন মজলিস বা অনুষ্ঠানে যেতে পাগড়ীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এমনিভাবে নামাযেও তাদের মাথায় পাগড়ী থাকত। এমন নয় যে, শুধু নামাযেই পরতেন অথবা কেবলমাত্র ফরয নামাযে। পাগড়ীকে নামাযের সাথে এরূপ নির্দিষ্ট করে নেওয়া, মূলত তার স্বাভাবিক ব্যবহাররীতির পরিপন্থী।[১]

এই পাগড়ীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ফযীলতপূর্ণ হাদীসের উদ্ভব ঘটেছে। তন্মধ্যে উপরোক্ত হাদীসটি অন্যতম। সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যেও এ হাদীসের যথেষ্ট চর্চা রয়েছে। মূলত তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়; বরং মিথ্যুকদের বানানো জাল হাদীস।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এ উক্তিটির ব্যাপারে বলেনঃ هذا

১-ইমদাদুল ফাতাওয়া ঃ ১/২৫৭, নফউল মুফতী ওয়াসসায়েল ঃ ২৪৪-২৪৬, আদ-দিআমা ফিল কালামি আলা আহাদীসি ওয়া আসারিল ইমামা।

كذب، هذا باطل "এটি একটি মিথ্যা এবং বাতিল কথা।" –শরহু জামেয়িত তিরমিযী, ইবনে রজব (রহঃ) ঃ ২/৮৩ (পাণ্ডুলিপি)

হাফেয সাখাবী (রহঃ) নামাযে পাগড়ী বাঁধার ফযীলতসম্বলিত যে তিনটি হাদীস প্রমাণিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত হাদীসটিও রয়েছে। –আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৩৪৬

যাইলুল মাকাসিদিল হাসানায় হাফেয সাখাবী (রহঃ)-এর উক্তি উল্লেখপূর্বক বিস্তারিতভাবে সেগুলোর অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে।

পাগড়ী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন ঃ

আদ-দিআমা ফিল কালামি আলা আহাদীসি ওয়া আসারিল ইমামা।

বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাআতে ৭০ রাকাআত

٤٠-ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب.

৪০–"বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাআত নামায, অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাকাআতের চেয়েও উত্তম।"

কুরআন মাজীদে এবং নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত হাদীসে বিবাহের অনেক ফযীলত এসেছে। তবে বিবাহের ফযীলতসম্বলিত উপরোক্ত কথাটি হাদীস নয়; যদিও উক্তিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে লোকমুখে প্রসিদ্ধ।

ইমাম ইবনুল জাওযী, মুহাদ্দেস শাওকানী, আল্লামা কাউকজী (রহঃ) সহ অন্যান্য হাদীস বিশেষজ্ঞগণও একে জাল বলেছেন।

দ্রষ্টব্য ঃ কিতাবুল মাওযূআত ঃ ২/১৬৪, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ১২৫, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ২/২০৫, আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/১৫৬, আল-লুউলুউল মারসূ ঃ ৩৯

একই বিষয়ে আরো জালহাদীস

٤١-ركعتان من المتأهل خير من اثنتين وثمانين ركعة من العزب.

৪১–"বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাআত নামায অবিবাহিত ব্যক্তির বিরাশি রাকাআতের চেয়েও উত্তম।"

ইবনুল জাওযী, হাফেয যাহাবী, হাফেয ইবনে হাজার, আল্লামা শাওকানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একে বাতিল ও জাল বলেছেন।

–আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/১৫৬, মীযানুল ইতিদাল ঃ ৪/১০০, লিসানুল মীযান ঃ ৬/২৭ আরো দ্রষ্টব্য ঃ ফয়যুল কাদীর ঃ ৪/৩৮, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ২/২০৫

প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ্ব পালন

٤٢-إن الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحج في كل سنة ستمئة ألف، فإن نقصوا أكملهم الله عز وجل من الملئكة، وإن الكعبة تحشر كالعَروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها.

৪২–"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রতি বছর ছয় লক্ষ হাজী হজ্ব পালন করবে। হাজীর সংখ্যা কম হলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশ্তাদের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দেবেন। কাবা শরীফকে হাশরের ময়দানে নববধুর মত সজ্জিত করে উপস্থিত করা হবে। আর যারা হজ্ব পালন করেছে তারা কাবার আঁচল ধরে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে; এরপর কাবা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তারাও কাবার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

কাবা শরীফের বহু মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই এবং তা হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়।

এ সম্পর্কে হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেন ঃ لم أجد له أصلا "আমি এর

কোন ভিত্তিই পাইনি।" –তাখ্‌রীজে ইহ্‌ইয়া–ইহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীন ঃ ১/৩৫২

মোল্লা আলী কারী, আল্লামা কাউকজী, মুরতাজা যাবীদী এবং আল্লামা শাওকানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম ইরাকী (রহঃ)-এর কথা সমর্থন করেছেন।

–আল মাসনূ ঃ ৬৩, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ২৭, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৪/২৭৬, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/১৪২

নফল নামাযের ফযীলত

নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ঈমানের পরেই নামাযের স্থান। সর্বাধিক পালনীয় ইবাদতসমূহের অন্যতম হল নামায। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের পাশাপাশি অনেক নফল নামাযও রয়েছে এবং সেগুলোরও বহু ফযীলত এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" –সূরা বাকারা ঃ ৪৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, যখন কোন বিপদাপদ দেখা দিত তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন ঃ

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ে পেরেশান হলেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।" –সুনানে আবু দাউদ ঃ ১/১৮৭, হাদীস ১৩১৫, মুসনাদে আহমাদ ঃ ৬/৫৩৭, হাদীস ২২৭৮৮

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণও বিভিন্ন সমস্যায় নফল নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করতেন।

এ ছাড়াও নফল নামাযের যথেষ্ট গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। কিয়ামতের

দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব নেওয়া হবে এবং ফরয নামাযের ঘাটতি দেখা দিলে নফল নামায দ্বারা সে ঘাটতি পূরণ করা হবে, ফরযের পরিপূরক হিসেবে তা গণ্য হবে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك.

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। তা যথাযথ হলে সে কামিয়াব ও সফলকাম হবে। নামাযের হিসাব যথাযথ না হলে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফরয নামাযে কোন ঘাটতি দেখা দিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করবেন ঃ দেখ আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না। এরপর নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর অনুরূপ নিয়মে তার সকল আমলের হিসাব নেওয়া হবে।" –জামে তিরমিযী ঃ ১/৯৪, হাদীস ৪১৩, সুনানে নাসায়ী ঃ ১/৫৪-৫৫, হাদীস ৪৬৫

অন্যত্র এই নফল নামাযের ফযীলত সম্পর্কে আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سئلني أعطيته، وإن استعاذ بي أعذته.

"বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। আর আমি কাউকে ভালবাসলে আমি

তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই; যা দ্বারা সে দেখে, শোনে, ধরে ও চলে। (যেহেতু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সকল কাজ-কর্ম আল্লাহ তাআলারই সন্তুষ্টি মোতাবেক প্রকাশ পায়, এ জন্য এ কথা বলা হয়েছে যে, আমিই যেন তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই। কেননা, যখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিপরীত সে ব্যক্তি কান দ্বারা কিছু শোনে না, চোখ দ্বারা কিছু দেখে না, তাঁর বিধানের খেলাফ হাত-পা নাড়ে না; বরং যা কিছু করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও হুকুমের আওতায় থেকে করে; তখন আর চোখ, কান, হাত ও পা নিজের থাকল না; কার্যত সবই আল্লাহ তাআলারই হয়ে গেল।)

"যদি সে আমার কাছে চায় তা হলে আমি তাকে দান করি; যদি সে আমার আশ্রয় কামনা করে তা হলে তাকে আশ্রয় দেই।" –সহীহ বুখারী ঃ ২/৯৬৩

উপরোক্ত ফযীলত সকল নফল নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ছাড়াও প্রত্যেক নফল নামাযের জন্যে পৃথক পৃথক বহু ফযীলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যা একত্রিত করতে হলে বিরাট কলেবরের স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন হবে।

এখানে আমরা (নির্ভরযোগ্য-সূত্রে-বর্ণিত) হাদীসের আলোকে প্রমাণিত কতিপয় নফল নামাযের নাম উল্লেখ করছি। (এগুলোর পৃথক পৃথক ফযীলত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।)

১–তাহাজ্জুদ, ২–তাহিয়্যাতুল উযূ, ৩–ইশরাক ও চাশত, ৪–তাহিয়্যাতুল মসজিদ, ৫–সালাতুল হাজত, ৬–ইস্তেখারার নামায, ৭–তওবার নামায, ৮–মুসীবতের নামায, ৯–সূর্যগ্রহণের নামায, ১০–ইস্তিসকা তথা বৃষ্টি কামনার নামায, ১১–সালাতুত তাসবীহ ইত্যাদি।

তা ছাড়া একটি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আওয়াবীন নামাযের ফযীলতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু ফযীলতের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে এ ধরনের রেওয়ায়াত মোতাবেক আমল করা যায় এবং কতক সাহাবায়ে কেরাম থেকে মাগরিবের পর কিছু নফল পড়ার কথাও প্রমাণিত আছে। তাই নেককারগণ আওয়াবীনের নামাযের ইহতেমাম করে থাকেন।

হাদীসের আলোকে প্রমাণিত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ বিভিন্ন নফল নামায থেকে উম্মতকে মাহরূম করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ের বিশেষ পদ্ধতির নফল নামাযের আবিষ্কার হয়েছে অসংখ্য এবং এসব বানোয়াট নফল নামাযের জন্যে জাল করা হয়েছে অনেক অনেক ফযীলতসম্বলিত রেওয়ায়াত। এই ক্ষুদ্র পরিসরে কতিপয় অতিপ্রসিদ্ধ নামায সম্পর্কীয় রেওয়ায়াতের ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের কিছু মতামত উল্লেখ করা হল।

সপ্তাহের দিবারাত্রের নফল নামায

সপ্তাহের সকল দিনরাতে বিশেষ পদ্ধতির বিশেষ ফযীলতপূর্ণ বহু নামাযই আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন ঃ

৪৩-"যে ব্যক্তি শনিবার দিন প্রতি রাকাআত সূরা ফাতেহা, তিনবার সূরা ইখলাস এবং একবার আয়াতুল কুরসী দিয়ে ৪ রাকাআত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে হজ্জ ও উমরার সাওয়াব দান করবেন। প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে এক বছর দিনে রোযা এবং রাতে নামায আদায়ের নেকী দান করবেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে একজন শহীদের সাওয়াব দান করবেন এবং সে ব্যক্তি নবী ও শহীদদের সাথে আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করবে।"

শনিবার রাতেরও এ ধরনের একাধিক নামায রয়েছে। এমনিভাবে সপ্তাহের অন্যান্য দিন ও রাতে এ ধরনের বহু নামাযের কথা পাওয়া যায়, যার অনেকগুলোই সমাজে প্রচলিত আছে। এ প্রকার নামায সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের ব্যাপারে মুহাদ্দেসীনে কেরামের বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) দিবারাত্রের বিভিন্ন নামাযের ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে ঃ

وليس يصح في أيام الأسبوع ولياليه شيء.

"সপ্তাহের দিবারাত্রের নামায সম্পর্কীয় কোন বর্ণনাই প্রমাণিত নয়।"

–তাখরীজে ইহ্ইয়া–ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ঃ ১/২৯২, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৩/৩৮১, আল আসারুল মারফূআ ঃ ৫৬

মুহাদ্দেস আল্লামা মাজ্দুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব ফিরোযাবাদী (রহঃ)ও বলেছেন ঃ لا يصح في صلاة الأسبوع شيء. "সপ্তাহের নামায সম্পর্কে কোন বর্ণনাই সঠিক নয়। অর্থাৎ এ নামায সম্পর্কীয় সবগুলো হাদীসই জাল।" –আল্ ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৭২, তায্কিরাতুল মাওযূআত (পাটনী রহঃ) ঃ ৪১

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) সপ্তাহের দিবারাত্রের এ জাতীয় কয়েকটি নামায সংক্ষেপে উল্লেখ করার পর বলেন ঃ "এইভাবে রবিবার দিন, রবিবার রাত, সোমবার দিন, সোমবার রাত, মঙ্গলবার দিন, মঙ্গলবার রাত এবং অনুরূপভাবে সপ্তাহের অবশিষ্ট দিন ও রাতের (নামাযের) হাদীসগুলো জাল করা হয়েছে।" –আল মানারুল মুনীফ ঃ ৫০, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১৫৪, আল আসারুল মারফূআ ঃ ৫৭-৫৮

অন্যত্র তিনি আরো বলেন ঃ

أحاديث صلوت الأيام والليالي، كصلاة يوم الأحد، وليلة الأحد، ويوم الإثنين، وليلة الإثنين، إلى آخر الأسبوع، كل أحاديثها كذب.

"দিবারাত্রের নফল নামায সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ, যেমন ঃ রবিবার দিনের নামায, রবিবার রাতের নামায, সোমবার দিনের নামায, সোমবার রাতের নামায–সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত সবকটি দিনের সবগুলো হাদীস মিথ্যা ও জাল।"–আল মানারুল মুনীফ ঃ ৯৫, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১৬৪, আল আসারুল মারফূআ ঃ ৫৮

এ ছাড়াও বহু মুহাদ্দেসীনে কেরাম এ প্রকার নামায হাদীসসিদ্ধ নয় বলে জানিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো জাল হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

ইমাম ইবনুল জাওযী, ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়া, হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে আররাক, মুহাম্মাদ তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, মুরতাযা যাবীদী, আল্লামা শাওকানী, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী এবং মুহাদ্দেস কামালুদ্দীন কাউকজী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্রষ্টব্য ঃ আল মানারুল মুনীফ ঃ ৪৮-৫০, তাখরীজে ইহ্ইয়া–ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ঃ ১/২৮৮-২৯২, আল-লাআলিল মাসনূআ ঃ ২/৪৮-৫২, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ২/৮৪-৮৭, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ৪১-৪৩, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ১৫৪-১৫৫, ১৬৪-১৬৫, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৩/৩৭২-৩৮২, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/৬৯-৭২, আল আসারুল মারফূআ ঃ ৪৭-৫৮ এবং আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৪৭

বছরের অন্যান্য সময়ের নামায

সপ্তাহের দিবারাত্রের ন্যায় বছরের অন্যান্য ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাস, দিন ও রাতে আদায়যোগ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির নির্দিষ্ট ফযীলতসম্পন্ন বহু নামায আবিষ্কৃত হয়েছে। নিম্নে এসব নামায এবং হাদীস সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হল।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ফযীলতের মাস, দিন বা রাতের ইবাদতের ব্যাপারে একটি মৌলিক বিধান জেনে নেওয়া প্রয়োজন। বিধানটি হল, কোন মাস, দিন বা রাতের বিশেষ ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা এ কথা অনিবার্য হয় না যে, উক্ত সময়ে কোন বিশেষ ধরনের ইবাদতও থাকবে; বরং কোন বিশেষ ইবাদতকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলতে হলে স্বতন্ত্র দলীল থাকা জরুরী। এ ক্ষেত্রে সাধারণ নফল নামাযের ফযীলতসম্বলিত হাদীসসমূহ যথেষ্ট নয়। কে না জানে জুমু'আর রাতের কত ফযীলত! তবে যেহেতু এতে কোন সুনির্দিষ্ট ইবাদত নেই; তাই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي.

"তোমরা (সপ্তাহের) অন্যান্য রাত বাদ দিয়ে শুধু জুমুআর রাতকে নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট করো না।" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/৩৬১, হাদীস ১১৪৪

বুঝা গেল, শুধু দিন বা রাতের ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা বিশেষ কোন ইবাদত প্রমাণিত হয়ে যায় না। নতুবা জুমুআর রাতের ইবাদত এবং জুমুআর দিনের রোযার বিশেষত্বকে হাদীস শরীফে অস্বীকার করা হত না।[১]

তেমনিভাবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণভাবে নামায পড়ার কথা প্রমাণিত হলে এতে করে সে নামাযের কোন বিশেষ পদ্ধতিকে নিজ থেকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলা যাবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিশেষ পদ্ধতির স্বপক্ষে কোন স্বতন্ত্র দলীল না থাকবে। কারণ ইবাদতের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তাওকীফী তথা একমাত্র ওহী দ্বারা প্রমাণযোগ্য, কিয়াস বা যুক্তি দ্বারা কোন ইবাদত বা তার ধরন নির্ধারণ করার অবকাশ শরীয়তে নেই।[২]

এই মূলনীতি জানার পর এখন সপ্তাহের দিবারাতের ন্যায় বছরের অন্যান্য নামাযের প্রসঙ্গে আসা যাক। বছরের অন্যান্য ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাস, দিন ও রাতে আদায়যোগ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির বিশেষ ফযীলতসম্পন্ন নামায কম আবিষ্কৃত হয়নি। এমনকি ফযীলতবিশিষ্ট মাস, দিন ও রাত ছাড়াও বিভিন্ন সময়ের বিশেষ পদ্ধতির বহু নামায এবং এগুলোর স্বপক্ষে বহু হাদীস জাল করা হয়েছে। আরবী বার মাসের ভিন্নভিন্ন শিরোনামে মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহু নামায ও হাদীস বানানো হয়েছে। এসব আবিষ্কৃত নামায ও জাল হাদীসের বর্ণনা দেওয়া হলে তাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা ছাড়া আর কোন উপকার হবে না। তাই যেসব মাস, দিন ও রাতের ফযীলত শরীয়তে প্রমাণিত নয় সেসব সময়ের মনগড়া নামায ও হাদীসের অসারতা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজনই নেই। তাতে গ্রন্থের কলেবরই শুধু বৃদ্ধি করা হবে। এগুলোর অসারতা সামান্য বোধসম্পন্ন পাঠকের নিকটও অস্পষ্ট নয়। তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে ফযীলতপূর্ণ মাস, দিন ও রাতের বিশেষ পদ্ধতির নামায ও

১–হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ঃ ২/৫৩, ফাতহুল মুলহিম ঃ ৩/১৫৬

২–আল-ই'তিসাম ঃ ১/৪৪৫-৫১৪, ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম ঃ ১০৯-১২৭, ঈযাহুল হাককিস সারীহ।

হাদীস সম্পর্কে কোন কোন পাঠকের সংশয় দেখা দিতে পারে। এ পর্যায়ের পাঠকদের উপরোক্ত মৌলিক বিধানটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই যথেষ্ট মনে করছি।

সুতরাং কোন সময়ের শুধু ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা বিশেষ ইবাদত প্রমাণিত হয়ে যায় না। তেমনিভাবে কোন সময়ের শুধু নামায প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা সে নামাযের কোন বিশেষ পদ্ধতিকে নিজ থেকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলার অবকাশ শরীয়তে নেই। তাই এ সব সময়ের ফযীলত লাভের জন্যে অন্য সময় পালনীয় নফল নামায যেমন ঃ তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশ্‌ত ইত্যাদি এবং নফল রোযা, তেলাওয়াত, তাসবীহ্-তাহ্লীল, দরূদ ও ইস্তিগফার ইত্যাদি ইবাদত পালনের প্রতি সচেষ্ট হতে হবে। পক্ষান্তরে নিজ থেকে মনগড়া কোন বিশেষ ইবাদত বা তার বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করা, তাকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব মনে করা বিদআত তথা শরীয়ত প্রবর্তনে দখল দেওয়ার শামিল হবে।

তবুও এ মৌলিক কথাটির পর বছরের অতি প্রসিদ্ধ ফযীলতপূর্ণ কয়েকটি সময়ের নামায ও জাল হাদীস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

শবে মেরাজ

আরবী রজব মাসের ২৭ তারিখ শবে মেরাজ নামে প্রসিদ্ধ। শুধু এ তারিখকেই কেন্দ্র করে নয়; বরং রজবের প্রথম শুক্রবারকেও কেন্দ্র করে বিশেষ নামায উদ্ভাবন করা হয়েছে, যাকে 'সালাতুর রাগায়েব' বলা হয়। অনুরূপ রজবের ১, ১০ ও ১৫ তারিখকেও কেন্দ্র করে বিশেষ পদ্ধতির নামায ও এসংক্রান্ত হাদীস উদ্ভাবন করা হয়েছে।

তবে আমাদের দেশে শবে মেরাজের নামায এবং এর জাল হাদীসই অধিক প্রসিদ্ধ। এগুলোর মান বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে রজব (রহঃ) বলেন ঃ

لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به. والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري، وأبو بكر بن السمعاني، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. إنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم. وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها.

"মাহে রজবে বিশেষ কোন নামায প্রমাণসিদ্ধ নয়। রজবের প্রথম শুক্রবারে সালাতুর রাগায়েবের ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট। বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে এটি একটি নব আবিষ্কৃত নামায। পরবর্তী যুগের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী বিদগ্ধ উলামায়ে কেরাম যারা এটিকে বিদআত আখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ ইসমাঈল আনসারী, আবূ বকর ইবনে সামআনী, আবুল ফযল ইবনে নাসের ও আবুল ফারায ইবনে জাওযী (রহঃ) প্রমুখ। পূর্ববর্তীরা এ নিয়ে আলোচনা করেননি; কেননা তাদের (ইন্তেকালের বেশ) পরে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। চারশত হিজরীরও পরে এটির প্রকাশ ঘটে। তাই পূর্ববর্তীদের নিকট এটির পরিচয় ঘটেনি এবং তারা এ ব্যাপারে কিছু বলে যাননি।" –লাতায়েফুল মাআরিফ ঃ ১৩১

আল্লামা নববী (রহঃ)ও সালাতুর রাগায়েব ও শবে বরাতের বিশেষ পদ্ধতির নামাযকে বিদআত আখ্যা দেওয়ার পর বলেন ঃ

ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب، وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل.

"আবূ তালেব মক্কী (রহঃ) 'কুতূল কুলূব'–এ এবং হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহঃ) 'ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে এ নামায দু'টি এবং সাথে এসংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করার কারণে ধোঁকায় পড়বেন না। কেননা, এ সবগুলোই বাতিল ও ভিত্তিহীন।" –আল্ মাজমূউ শরহুল মুহাযযাব ঃ ৩/৫৪৯

মাহে রজব এবং শবে মেরাজের নামায ও জাল বর্ণনাসমূহের অসারতা আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখা যেতে পারে ঃ ইবনে দেহ্ইয়া (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত 'আদাউ মা-ওয়াজাব', হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) কৃত 'তাবয়ীনুল আজব', আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)-এর 'মা সাবাতা বিসসুন্নাহ্ ফী আয়্যামিস সানাহ্'।

আরো দ্রষ্টব্য ঃ আল মাওযূআত ঃ ২/৪৬-৪৯, আল মানারুল মুনীফ ঃ ৯৫-৯৭, তাখরীজে ইহ্ইয়া-ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ঃ ১/২৯৬, আল লাআলিল মাসনূআ ঃ ২/৫৫-৫৯, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ২/৮৯-৯০, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৩/৪২২-৪২৫, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/৭৩-৭৫, আল আসারুল মারফূআ ঃ ৫৮-৭০

শবে বরাত

বছরের ফযীলতপূর্ণ সময়ের মধ্যে শবে বরাত অন্যতম। শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাতই হল শবে বরাত। নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত হাদীসের আলোকে এ রাতের ফযীলত সুপ্রমাণিত। তাই এ রাতে বিশেষভাবে তেলাওয়াত, নামায, যিকির-আযকার, ইস্তিগফার, তাসবীহ্-তাহলীল ইত্যাদি ইবাদতে মনোনিবেশ করা উচিত। তবে এ রাতে বিশেষ ফযীলতবিশিষ্ট নির্দিষ্ট পদ্ধতির কোন নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই এবং এসংক্রান্ত যেসব হাদীস কোন কোন অনির্ভরযোগ্য পুস্তকে পাওয়া যায় সবগুলোই জাল।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহঃ) শবে বরাতের প্রমাণিত দিকটির আলোচনা শেষে এ প্রকৃতির নামায ও মনগড়া হাদীসের অসারতা বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেন ঃ

قد مر غير مرة أنه لا عبرة بذكر أمثال هذه الصلوات في الإحياء، وقوت القلوب، والغنية وغيرها من كتب الصوفية، وقد قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «حديث صلاة نصف شعبان حديث باطل».

"এ বিষয়টি একাধিকবার আলোচিত হয়েছে যে, ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, কূতুল কুলূব, গুন্য়াতুত তালেবীন ইত্যাদি গ্রন্থে এ ধরণের নামাযের যে উল্লেখ এসেছে এর কোন মূল্য নেই। হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) 'তাখরীজে ইহ্ইয়া' গ্রন্থে শবে বরাতের নামাযের হাদীসকে বাতিল আখ্যা দিয়েছেন।" –আল আসারুল মারফূআ ঃ ৮২

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ

কিতাবুল মাওযূআত ঃ ২/৪৯-৫২, আল মানারুল মুনীফ ঃ ৯৮-৯৯, তাখরীজে ইহ্ইয়া–ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ঃ ১/২৯৬, আল লাআলিল মাসনূআ ঃ ২/৫৯-৬০, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ২/৯২-৯৪, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১৬৫, ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৩/৪২৫-৪২৭, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/৭৫-৭৬, আল আসারুল মারফূআ ঃ ৮২-৮৫

শবে মেরাজ ও শবে বরাত ছাড়াও বছরের অন্যান্য ফযীলতপূর্ণ সময় যেমন ঃ আশুরা তথা ১০ মহররম, শবে কদর, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত ইত্যাদি সম্পর্কেও নানা পদ্ধতির নামায ও হাদীস আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ সবের খণ্ডনে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই; বরং শবে মেরাজ ও শবে বরাতের আলোচনা থেকেই আশা করি পাঠকমহল এসব ক্ষেত্রেও রাহনোমায়ী পাবেন।[১]

তবুও আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহঃ)-এর একটি উক্তি দ্বারা এ আলোচনার ইতি টানছি। তিনি আল আসারুল মারফূআ'র ভূমিকায় বলেন ঃ

قد سألني بعض الناس عن صلاة يوم عاشوراء وكميتها وكيفيتها، وما يترتب عليها من ثوابها، فأجبت بأنه لم ترد في رواية معتبرة صلاة معينة

১–বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দেখা যেতে পারে ঃ কিতাবুল মাওযূআত ঃ ২/৪৫, ৫২-৫৬, আল লাআলিল মাসনূআ ঃ ২/৫৪, ৬০-৬৩, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ২/৮৯, ৯৪-৯৫, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ৪৩, ৪৬, ৪৭, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ১/৭৬-৭৯, আল আসারুল মারফূআ ঃ ৮৬-৯০

كما وكيفا في هذا اليوم وغيره من أيام السنة المباركة. وكل ما ذكروه فيه مصنوع، موضوع لا يحل العمل به مع اعتقاد ثبوته والاعتماد عليه مع اعتقاد ترتب أجره المخصوص عليه.

"আমাকে আশুরার নামাযের ধরন, রাকাআতসংখ্যা ও সাওয়াবের ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল। আমি জবাব দিলাম যে, আশুরা এবং বছরের অন্যান্য বরকতপূর্ণ দিনে নির্দিষ্ট রাকাআতে বিশেষ নিয়মের কোন নামায নির্ভরযোগ্য কোন রেওয়ায়াতে আসেনি। এ সম্পর্কে যা উল্লেখ রয়েছে সবই বানোয়াট ও জাল। এগুলোর উপর আস্থা, সুনির্দিষ্ট সাওয়াবের আকীদা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে–এ বিশ্বাসের সাথে আমল করা যাবে না।" –আল আসারুল মারফূআ ঃ ৮

পরিশেষে আবারো বলছি, আমাদের আলোচনা সাধারণ নফল ইবাদত বা নফল নামাযের ব্যাপারে নয়। নফল নামাযের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন, নফল নামাযের সাধারণ নিয়মে যে কোন সূরা মিলিয়ে, যত রাকাআত ইচ্ছা সে পড়তে পারে; কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ফযীলতপূর্ণ মাস, দিন বা রাতের নির্দিষ্ট পদ্ধতির নির্দিষ্ট সাওয়াববিশিষ্ট কোন নামায শরীয়তে প্রমাণিত নেই এবং এ সংক্রান্ত যে সব হাদীস রয়েছে, সবগুলোই জাল। সর্বাবস্থায়ই তা পরিত্যাজ্য। তাই ঐ সব হাদীসে বর্ণিত নিয়ম ও সাওয়াবের প্রতি লক্ষ্য না করে সাধারণভাবে ইবাদত করাই কাম্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং শরীয়তসিদ্ধ ইবাদত পালনে মনোনিবেশ করার তাওফীক দান করুন; আমীন।

স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ

٤٤–حب الوطن من الإيمان

৪৪–"স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ।"

জন্মভূমির মহব্বত, জন্মভূমির প্রতি মনের টান, হৃদয়ের আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত বিষয়, একটি মহৎগুণ। অন্তরে জন্মভূমির ভালবাসা, মায়া-মহব্বত, তার দিকে মনের আগ্রহ থাকা ঈমানপরিপন্থী কিছু নয়; কিন্তু ঈমান ও দেশের প্রশ্নে ঈমানকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

তবে উপরোক্ত বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মাদ সাগানী (রহঃ) একে জাল বলেছেন। –রিসালাতুল মাওযূআত ঃ ৭

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

لا أصل له عند الحفاظ

"হাফেযে হাদীস মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট এর কোন ভিত্তি নেই।" –আল মাসনূ ঃ ৯১

আরো দ্রষ্টব্য ঃ আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ২১৮, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ১১, আদ্দুরারুল মুন্তাসিরা ঃ ১১০, মিরকাতুল মাফাতীহ ঃ ৪/৫, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৬১, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৩৩

৪৫–মুমিনের ঝুটা ওষুধ

٤٥–سؤر المؤمن شفاء

মানুষের মুখে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মুমিনের উচ্ছিষ্ট ওষুধ এবং তারা একে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস জ্ঞান করে থাকে; অথচ এটি তাঁর হাদীস নয়।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন ঃ

ليس له أصل مرفوع.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে তার কোন ভিত্তি নেই। –আল মাসনূ ঃ ১০৬

আল্লামা মুহাম্মাদ নাজমুদ্দীন গাযযী (রহঃ)ও বলেছেন যে, এটি হাদীস নয়। –কাশফুল খাফা ঃ ১/৪৫৮

খাবার শেষে পাত্র পরিষ্কার না করা, একসাথে খাওয়ার সময় অন্যের উচ্ছিষ্ট খাবার বা পানীয় বস্তু ঘৃণা করা খুবই নিন্দনীয়। তাই খাবার শেষে পাত্র ভালভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া এবং অন্যের উচ্ছিষ্টকে ঘৃণা না করা উচিত। এমনকি আল্লাহওয়ালাদের উচ্ছিষ্ট দ্বারা বরকত অর্জনের প্রমাণও পাওয়া যায়।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجائتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي : الشَرَبة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا.

"ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি আর খালেদ ইবনে ওয়ালীদ মাইমূনা (রাঃ)-এর কাছে গেলে তিনি পাত্রে করে আমাদের জন্যে দুধ হাজির করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করেন। আমি ছিলাম তাঁর ডান দিকে আর খালেদ বাম দিকে। তাই তিনি আমাকে বলেন, আগে পান করার হক তোমারই, তবে তুমি ইচ্ছা করলে খালেদকে অগ্রাধিকার দিতে পার। আমি (ইবনে আব্বাস) বললাম, আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না।" –জামে তিরমিযী ঃ হাদীস ৩৬৮৪

৪৬–মুমিনের থুথু ওষুধ

٤٦-ريق المؤمن شفاء

মানুষের মুখে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মুখের লালা বা থুথু ওষুধ

এবং তারা একে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মনে করে থাকে। বস্তুত 'মুমিনের থুথু ওষুধ' কথাটি হাদীস নয়। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

ليس له أصل مرفوع

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। –আল মাসনূ ঃ ১০৬

আল্লামা আজলূনী (রহঃ)ও বলেছেন যে তা হাদীস নয়। –কাশফুল খাফা ঃ ১/৪৩৬

থুথু সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত যা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الانسان الشيء منه، أو كانت به قَرْحَةٌ أو جَرْحٌ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا. ـ ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها-«باسم الله، تربة أرضنا، بريق بعضنا، ليشفى به سقيمنا، بإذن ربنا».

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেউ কোন আঘাত বা রোগ-বালাইয়ের অভিযোগ করলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলীতে থুথু দিয়ে জমিতে রাখতেন। এরপর উক্ত স্থানে থুথু ও ধূলিমাখা আঙ্গুলী বুলাতে বুলাতে বলতেন ঃ باسم الله، تربة أرضنا، بريق بعضنا، يشفى به سقيمنا، بإذن ربنا. (আল্লাহর নামে আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের মাটি ও থুথু দ্বারা আমাদের রোগীরা আরোগ্যলাভ করে থাকে।) –সহীহ মুসলিম ঃ ২/২২৩, হাদীস ২১৯৪, সহীহ বুখারী ঃ ২/৮৫৫, হাদীস ৫৭৪৫

৪৭–পাকস্থলি সকল রোগের কেন্দ্র ...

٤٧-المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء.

"পাকস্থলী রোগকেন্দ্র এবং ওষুধের মূলকথা হল পরিহার করে চলা।"

লোকমুখে প্রচলিত একটি কথা। অনেকেই এটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী মনে করে থাকে; মূলত এটি তাঁর বাণী নয়।

এটি একটি ডাক্তারী উপদেশমূলক কথা। হারেস ইবনে কালাদা নামে একজন নামজাদা আরব্য ডাক্তার ছিলেন। তিনি এটি বলেছেন।

পাকস্থলী রোগের প্রধান কেন্দ্র। পাকস্থলী আক্রান্ত হলে অন্যান্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রভাব পড়ে। সংযত থাকা, বেছে চলা এবং অখাদ্য-কুখাদ্য পরিহার করা–এসবগুলো কথাই সঠিক, বাস্তবসম্মত। তাই বলে একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। তিনি যা বলেছেন, করেছেন বা সমর্থন জানিয়েছেন শুধুমাত্র সেগুলোকেই হাদীস বলা যাবে।

দ্রষ্টব্য ঃ আল-মাসনূ ঃ ১৭২, আল-মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১১০, আত তাযকিরা ঃ ১৪৫, আল-মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৪৫৫, কাশফুল খাফা ঃ ২/২১৪, আল-লুউলুউল মারসূ ঃ ৭৩

লবণের মাঝে ৭০ রোগের ওষুধ

٤٨–عليكم بالملح، فإنه شفاء من سبعين داء.

৪৮–"তোমরা লবণ ব্যবহার কর। কেননা তা সত্তরটি রোগের ওষুধ।"

হাদীস হিসেবে এর যথেষ্ট জনশ্রুতি আছে; কিন্তু বাস্তবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। এটি একটি জাল হাদীস, যার পুরো বাক্যটি নিম্নরূপ ঃ

إذا أكلت فابدأ بالملح، واختم بالملح، فإن الملح شفاء من سبعين داء: الجنون، والجذام، والبرص ...

"আহারের শুরু ও শেষ লবণ দিয়ে কর। কেননা লবণ সত্তরটি রোগের ওষুধ। যথা ঃ পাগলামী, কুষ্ঠ, শ্বেত ... ।"

ইমাম বাইহাকী, ইবনুল জাওযী, ইবনুল কায়্যিম, হাফেয সুয়ূতী এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একে জাল বলেছেন। –দালায়েলুন নুবুওয়্যা ঃ ৭/২২৯, আল-মানারুল মুনীফ ঃ ৫৫, আল-লাআলিল মাসনূআ ঃ ২/৩৭৪-৩৭৫, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ২/২৪৩, ৩৩৯

এ সম্পর্কিত আরেকটি জাল হাদীস

٤٩–من أكل الملح قبل الطعام وبعد الطعام، فقد أمن من ثلاثمئة وستين نوعا من الداء، أهونها الجذام والبرص.

৪৯–"যে ব্যক্তি খাবারের আগে ও পরে লবণ খায়, সে তিনশত ষাটটি রোগ হতে নিরাপদ থাকে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন হল কুষ্ঠ ও ধবল।"

হাফেয সুয়ূতী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহঃ) একে জাল বলেছেন। –যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ঃ ১৪২, আল মাসনূ ঃ ৭৪ (টীকা), তানযীহুশ শরীয়া ঃ ২/২৬৬

নখ কাটার নিয়ম

٥٠–بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمسبحته اليمنى، وختم بإبهامه اليمنى، وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام.

৫০–"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতের তর্জনী হতে নখ কাটা আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন। বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন।"

নখ কাটার তরতীব ও নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ প্রমাণস্বরূপ হাদীস হিসেবে একে উল্লেখ করে থাকেন; অথচ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। নখ কাটার নির্দিষ্ট নিয়ম ও দিনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন কিছু বর্ণিত নেই।

ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ফাতহুল বারী ঃ ১০/৩৫৭–এ বলেন ঃ "নখ কাটার নিয়ম সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই।"

আল্লামা সাখাবী (রহঃ) আল-মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৩৬২–এ বলেন, "নখ কাটার ব্যাপারে নির্দিষ্ট দিন ও নিয়মসম্বলিত কোন হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাবেত নেই। এক্ষেত্রে হযরত আলী (রাঃ)-এর নামে যে পংক্তিটি উল্লেখ করা হয়, তা সম্পূর্ণ বাতিল।"

হাফেয ইরাকী (রহঃ) তারহুত তাসরীব শরহুত তাকরীব–এ বলেন, "নখ কাটা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদীস সাবেত নেই।" –ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ২/৪১১

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সকল ভাল কাজে ডানকে প্রাধান্য দিতেন। তাই এতটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, ডানদিক থেকে নখ কাটা মুস্তাহাব। এছাড়া যে কোন নিয়মই নির্ধারণ করা হোক না কেন তাকে সুন্নত বলার কোন অবকাশ নেই।

উপরোক্ত বিষয়াবলী বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ তাখরীজে ইহ্‌ইয়া–ইহ্‌ইয়া ঃ ১/১৪১, আল মাজমূ শরহুল মুহাযযাব ঃ ১/৩৩৯, ফাতহুল বারী ঃ ১০/৩৫৭-৩৫৯, আল মাসনূ ঃ ১৩০, কাশফুল খাফা ঃ ২/৯৬, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৫৬, ইত্‌হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ২/৪১১

৫১–যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান

٥١–من ليس له شيخ فشيخه إبليس.

যে ব্যক্তি তার মুরুব্বী তথা দ্বীনদার উস্তাদ, পিতা-মাতা অথবা কোন হক্কানী বুযুর্গের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না, সে ব্যক্তি

সাধারণত শয়তানের ফাঁদে পড়ে থাকে। এ জন্যে হক্কানী উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া এবং নেককারদের সোহবত অবলম্বন করার প্রতি শরীয়ত গুরুত্বারোপ করেছে।

তবে উল্লিখিত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়; কোন হক্কানী বুযুর্গের অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তিমাত্র।

ইমামুল আউলিয়া খাজা নিযামুদ্দীন (রহঃ)-এর মালফূযাত তথা বাণী সংকলন 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ' এ আছে ঃ "মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেয বাদায়ূনী তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন ঃ من ليس له شيخ فشيخه الشيطان (যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান) এটি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস? হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) বলেন, না; এটি মাশায়েখের বাণী।"–ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ–আসসুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল চিশতিয়্যাতিল আলিয়্যা ঃ ৫৯, খাইরুল ফাতাওয়া ঃ ১/৩৬১

অনেকে উপরোক্ত কথাটি হাদীস মনে করে নামমাত্র বাইআতকে (পীরের হাতে হাত দেওয়াকে) ফরযে আইন মনে করে থাকে, যা নিতান্তই ভুল। পক্ষান্তরে অনেকে হক্কানী উলামা মাশায়েখের সোহবত ও সংশ্রবের মোটেও প্রয়োজনবোধ করে না, যা আরো মারাত্মক ভুল।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন ঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ঃ ৫/২৩৬-২৩৮, তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ–মাওলানা আব্দুল মালেক

যে নিজকে চিনল সে রবকে চিনল

৫২–من عرف نفسه فقد عرف ربه

৫২–"যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে, সে আপন প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করেছে।"

উপরোক্ত উক্তিটি হাদীস নয়; অবশ্য এ বাক্যের অর্থ ও ভাব সঠিক, যা

কুরআন কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টির তরজমা ও তাফসীর থেকে স্পষ্ট। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

"এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?" –সূরা হা-মীম সাজ্‌দা ঃ ৫৩

অর্থাৎ বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরো নিকটবর্তী খোদ মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাযুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরী হলে ইস্পাত নির্মিত স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের মাথায় আশ্চর্যজনক এক দেমাগ ও মস্তিষ্ক রাখা হয়েছে; যাতে বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-আকাঙ্খা, জযবা-আবেগ অনুভূতিসহ বহু শক্তি প্রদান করা হয়েছে। ইল্‌ম ও জ্ঞানার্জনের জন্য পঞ্চইন্দ্রিয়ের ন্যায় আজীব বস্তু আল্লাহ্ তাআলা দান করেছেন। এর প্রতিটির সৃষ্টিকৌশল, সুক্ষ্মতা, নিপুনতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অবগত হলে হয়রান ও হতভম্ব হয়ে যেতে হয়।

এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যাঁর জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং তাঁর কোন সমকক্ষ

হতে পারে না। فتبرك الله احسن الخلقين

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وفي انفسكم ط افلا تبصرون.

"এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে), তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" –সূরা যারিআত ঃ ২১

আলোচ্য আয়াতেও মানুষের ব্যক্তিসত্তায় বিরাজমান কুদরতের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-পৃষ্ঠের সৃষ্টিবস্তুর কথা বাদ দিলেও খোদ মানুষের অস্তিত্ব, দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের এক একটি বিশাল ভাণ্ডার দেখতে পাব। আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যে সব নিদর্শন রয়েছে সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান হয়েছে। এ কারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগত বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে তবে তার আল্লাহ্ তাআলাকে চিনতে দেরী হবে না; আল্লাহ্ তাআলা যেন তার দৃষ্টির সামনে উপস্থিত–এমন মনে হবে।

কীভাবে একফোঁটা বীর্য বিভিন্ন ভূ-খণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? এরপর কীভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কীভাবে তাতে অস্তি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? এরপর কীভাবে এই নিষ্পাপ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাতে দুনিয়ার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কীভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কীভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্নরূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর

হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেজাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ তাআলার কুতরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فتبرك اللهُ احسنُ الخلقين.

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষের বাইরে ও দূরে নয়–খোদ তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ তাআলাকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ افلا تبصرون। অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী জ্ঞানবুদ্ধি দরকার হয় না; দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এ জন্যই কোন বুযুর্গ বলেন ঃ

من عرف نفسه فقد عرف ربه

"যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে, সে আপন প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করেছে।" সুতরাং এটি কোন একজন বুযুর্গের বাণীমাত্র; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) একে (যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে, ... পরিচয় লাভ করেছে।) জাল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو في شيء من كتب الحديث، ولا يعرف له إسناد.

"এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়, হাদীসের কোন কিতাবেও তা নেই এবং তার কোন সনদও নেই।" –মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১৬/৩৪৯

তা ছাড়া ইমাম নববী (রহঃ)ও এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয় বলে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী মুহাদ্দেসগণ তাদের কথার সাথে একমত হয়েছেন। কেউ কেউ তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকলেও হাদীস না হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।

আবুল মুযাফফার ইবনে সামআনী (রহঃ) এ সম্পর্কে তার অভিমত দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এটি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুআয রাযীর উক্তি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

দ্রষ্টব্য ঃ আত্ তাযকিরা ঃ ১২৯, আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৪৯০-৪৯১, আদ্দুরারুল মুন্‌তাসিরা ঃ ১৭৩, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ১১, আল মাসনূ ঃ ১৮৯, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১২২, কাশফুল খাফা ঃ ২/২৬২, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৮৬, রিসালাতুল মাওযূআত (সাগানী) ঃ ৪

প্রতি ৪০ জনে একজন ওলী

٥٣-ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي الله، لا هم يدرون به، ولا هو يدري بنفسه.

৫৩–"সমবেত প্রতিটি জামাআতেই আল্লাহ তা'আলার একজন ওলী থাকেন। তারাও জানে না সে কে, এমনকি সে নিজেও জানে না।"

এ কথাটি নিম্নোক্ত শব্দে অধিক প্রসিদ্ধ ঃ

৫৪-"প্রতি চল্লিশ জনে একজন আল্লাহর অলী থাকেন।"

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস ইবনে আবিল ইযয (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

لا أصل له، وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا، وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق.

অর্থাৎ এটির কোন ভিত্তি নেই। আর কথাটিও বাতিল। কেননা কখনো গোটা জামাআতই হয় বে-দ্বীন, ফাসেক।"

মোল্লা আলী কারী (রহঃ)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন এবং বলেন ঃ

لا أصل له، وهو كلام باطل.

"এটি একটি বাতিল কথা এবং এর কোন ভিত্তিই নেই।" –শরহুল আকীদাতিত ত্বহাবিয়া ঃ ৩৪৭-৩৪৮, আল মাসনূ ঃ ১৬১, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১০৬, কাশফুল খাফা ঃ ২/১৯৪

আল্লাহ তাআলার সাথে বিশেষ মুহূর্ত ...

٥٥–لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل.

৫৫–"আল্লাহ তাআলার সাথে আমার এমন সময় নির্ধারিত আছে, তখন কোন নৈকট্যশীল ফেরেশ্‌তা বা কোন নবীও (আমার নিকট আসার) সুযোগ পায় না।"

হাদীস হিসেবে উক্তিটির যথেষ্ট জনশ্রুতি আছে। বিশেষত তরীকতপন্থীদের মধ্যে তা অধিক শোনা যায়; অথচ তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) উক্তিটি বর্ণনা করার পর বলেন ঃ "এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়।" –আল মাসনূ ঃ ১৫১, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১০২

আরো দ্রষ্টব্য ঃ কাশফুল খাফা ঃ ২/১৭৩-১৭৪, আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৪২০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ঃ ৫/৯০

৫৬–মরার আগে মর

٥٦–موتوا قبل أن تموتوا.

এটি একটি নসীহতমূলক কথা। কোন হাদীস নয়। সচরাচর সূফিয়ায়ে কেরাম এ উপদেশ বাক্যটি অধিক ব্যবহার করে থাকেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ إنه غير ثابت "হাদীস হিসেবে এটি প্রমাণিত নয়।"

–আল মাসনূ ঃ ১৯৮, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১২৯, আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৫১০, কাশফুল খাফা ঃ ২/২৯০

অবশ্য মৃত্যুর কথা অধিক স্মরণ করা এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক সহীহ্ হাদীস রয়েছে। উক্ত ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের স্থলে এগুলোই বর্ণনা করা উচিত। নিম্নে দুটি হাদীস প্রদত্ত হল ঃ

عن مجاهد، عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور، فقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سَقَمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله! ما اسمك غدا. رواه البخاري، وابن حبان، والترمذي، واللفظ للترمذي.

"মুজাহিদ (রহঃ) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীর ধরে ইরশাদ করেন, তুমি মুসাফির কিংবা পথিকের ন্যায় দুনিয়াতে বসবাস কর এবং নিজকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর।

"এরপর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, সকাল হলে তুমি সন্ধ্যার আশা করো না। অর্থাৎ সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না। তেমনি সন্ধ্যা হলে সকালের আশা করো না। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে কাজে লাগাও এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাও। কেননা, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি জান না আগামী কাল তোমার নাম কী হবে ? (জীবিত না মৃত)।" –সহীহ্ বুখারী ঃ ২/৯৪৯, হাদীস ৬৪১৬, জামে তিরমিযী ঃ ২/৫৯, হাদীস ২৩৩৩, সহীহ্ ইবনে হিব্বান ঃ ২/৪৭১-৪৭২, হাদীস ৬৯৮

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت. رواه النسائي، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ অধিক পরিমাণে সকল মজা বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা স্মরণ কর।" –জামে তিরমিযী ঃ ২/৫৭, হাদীস ২৩০৭, সুনানে নাসায়ী ঃ ১/২০২, হাদীস ১৮২৪

৫৭–আন্না-সু কুল্লুহুম হালকা ...

٥٧–الناس كلهم هلكى إلا العـالمون، والعـالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم.

"আলেমগণ ব্যতীত সকল মানুষই ধ্বংসের পথে; আবার আমলদার আলেমগণ ব্যতীত খোদ আলেমরাও ধ্বংসের পথে; আমলদার আলেমরাও ধ্বংসের পথে, তবে যারা ইখলাসওয়ালা; আর ইখলাস ওয়ালারা আছেন ভীষন ভয়ের মধ্যে।"[১]

এটি সামান্য শব্দের ব্যবধানে শাইখ সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী (রহঃ, ইন্তেকাল ২৮৩ হিঃ)-এর উক্তি। (ইক্তিযাউল ইল্‌মিল আমাল ঃ ২৮-২৯)

কিন্তু লোকমুখে তা হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ; অথচ তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়।

আল্লামা সাগানী (রহঃ)সহ একাধিক হাদীস বিশারদ একে জাল বলেছেন। –রিসালাতুল মাওযূআত ঃ ৫, কাশফুল খাফা ঃ ২/৩১২

ইল্‌ম, আমল ও ইখলাসের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কুরআন মাজীদ

১–এ জাল হাদীসটি কোথাও هلكى, কোথাও موتى, কোথাও غرقى শব্দে বলা হয়ে থাকে।

ও নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে। সেগুলো বাদ দিয়ে এ ধরণের জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের পিছনে পড়া কোন জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না।

৫৮—আযানের দুআয় 'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ' বৃদ্ধি

মুআযযিনের আযানের জবাব শেষে যে কোন দরূদ পাঠ করে শ্রোতারা যে দুআ পাঠ করে থাকে, সে দুআয় অনেকে উপরোক্ত (والدرجة الرفيعة) অংশটুকু বৃদ্ধি করে থাকে। সাধারণত লোকেরা একে হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ মনে করে থাকে; অথচ তা হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ নয়।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ "এই হাদীসের (আযানের দুআসম্বলিত) কোন সনদসূত্রেই (والدرجة الرفيعة)-এর উল্লেখ নেই।" –আত তালখীসুল হাবীর ঃ ১/২১০

আল্লামা সাখাবী (রহঃ) বলেন ঃ

لم أره في شيء من الروايات

"এ অংশটুকু আমি কোন রেওয়ায়াতেই দেখিনি।" –আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ২৫৪

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) বলেন ঃ

وزيادة والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم الراحمين، لا أصل لهما.

"ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ বৃদ্ধি করা এবং 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' দ্বারা শেষ করা, এ দু'টির কোন ভিত্তিই নেই।"

–শরহুল মিনহাজ ঃ ২/১১৪, রদ্দুল মুহতার ঃ ১/৩৯৮, আস সিআয়া ঃ ২/৪৭, মিরকাতুল মাফাতীহ ঃ ২/১৬৩, কাশফুল খাফা ঃ ১/৪০২, মাআরিফুস সুনান ঃ ২/২৩৮-২৩৯

৫৯–আযানের দুআয় 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' বৃদ্ধি

আযানের দুআর শেষাংশে অনেকে 'ইয়া আরহামার রাহিমীন'ও বৃদ্ধি করে থাকে এবং একে হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ মনে করে থাকে; অথচ এটিও হাদীসে বর্ণিত আযানের দুআর অংশ নয়।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

يا أرحم الراحمين ليست أيضا في شيء من طرقه.

অর্থাৎ আযানের দুআসম্বলিত হাদীসের কোন সূত্রে 'ইয়া আরহামার রাহিমীন'ও নেই। –আত তালখীসুল হাবীর ঃ ১/২১০

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ)-এর এ সম্পর্কে একটি উক্তি ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

وزيادة والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم الراحمين، لا أصل لهما.

"'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ' বৃদ্ধি করা এবং 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' দ্বারা সমাপ্ত করা, এ দু'টির কোনটিরই ভিত্তি নেই।" –শরহুল মিনহাজ ঃ ২/১১৪, রদ্দুল মুহ্তার ঃ ১/৩৯৮, আস সিআয়া ঃ২/৪৭

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

وأما زيادة يا أرحم الراحمين، فلا وجود لها في كتب الحديث.

"হাদীসবিষয়ক কোন গ্রন্থে 'ইয়া আর-হামার রাহিমীন' অংশটুকুর কোন অস্তিত্বই নেই।" –মিরকাতুল মাফাতীহ ঃ ২/১৬৩, আরো দ্রষ্টব্য ঃ মাআরিফুস সুনান ঃ ২/২৩৯

৬০–নামায শেষে 'হায়্যিনা রাব্বানা বিসসালাম ...

আমরা নামায শেষে হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে থাকি ঃ

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

কিন্তু আমাদের অনেকেই এ দুআটির সাথে আরো কিছু বাক্য বৃদ্ধি করে থাকে। তারা ومنك السلام (ওয়া মিনকাস সালাম)-এর পর وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دارك دار السلام. বাক্যটি বৃদ্ধি করে থাকেন। এটি হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ নয়।

আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

وأما ما يزاد بعد قوله «ومنك السلام» من نحوه «وإليك يرجع السلام ...» فلا أصل له، بل مختلق بعض القصاص.

"আর 'ওয়া মিনকাস সালাম'–এর পর যে 'ইলাইকা ইয়ারজিউস সালাম ... বৃদ্ধি করা হয়, এর কোন ভিত্তি নেই; বরং এগুলো কোন কিসসা-কাহিনীকারদের বানানো।" –মিরকাতুল মাফাতীহ ঃ ২/৩৫৮, আস সিআয়া ঃ ২/২৫৮

উক্ত দুআটিতে কেউ কেউ আবার وتباركت-এর পর وتعاليت ও বৃদ্ধি করে থাকেন। এটিও হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ নয়। –কাশফুল খাফা ঃ ১/১৮৬

একটি জরুরী সতর্কীকরণ

এখানে কতক পাঠকের সংশয় হতে পারে যে, দুআ একটি ইবাদত; শরীয়ত দুআর ব্যাপারে এ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে যে, দুআর ধারা ও আদব বজায় রেখে যেকোন ভাষায় যেকোন শব্দে মানুষ দুআ করতে পারে। এরপরও এ তাহকীকের কী অর্থ হতে পারে যে, অমুক দুআর অমুক শব্দ কোন হাদীসে নেই?

এ সংশয়ের সমাধান এই যে, অবশ্যই এ কথা ঠিক যে, দুআর ধারা ও আদব বজায় রেখে মানুষ যেকোন ভাষায় যেকোন শব্দে দুআ করতে পারে; তবে দুআর মৌলিক নীতিমালায় নিম্নোক্ত তিনটি ধারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

১. যেসব স্থানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ

থেকে সহীহ্ হাদীসে দুআ বর্ণিত আছে–যাকে 'দুআয়ে মাছূর' বা 'মাছূর দুআ' বলা হয়–সেখানে মাছূর দুআর প্রতি যত্নবান হওয়াই সুন্নাত; হাদীসে বর্ণিত দুআ পরিত্যাগ করে অন্যসব দুআ অবলম্বন করা আদৌ ঠিক নয়; বরং তা পরিত্যাজ্য। (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ২২/৫২৫, তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ঃ ৫/৫৭৮ , মুনাজাতে মকবূল ঃ ৮৮-৮৯)

২. মাছূর দুআগুলো যে শব্দে বর্ণিত সেগুলোতে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করা ছাড়া হুবহু সেভাবেই রেখে আমল করা শ্রেয়। নিজের পক্ষ থেকে যদিও তাতে কমানো-বাড়ানোর অবকাশ রয়েছে; তবে এরূপ করা অনুত্তম। (ফাতহুল বারী ঃ ১১/১১৬, লামেউদ দারারী ঃ ৩/৩৫২, মুনাজাতে মকবূল ঃ ৮৮-৮৯)

৩. মাছূর দুআয় যদি কেউ কোন বাক্য বৃদ্ধি করে তাহলে অতিরিক্ত বাক্যকে মাছূর দুআর অংশ মনে করা নাজায়েয। অর্থাৎ এরূপ মনে করা যে, এস্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুআ শিক্ষা দিয়েছেন এ অংশটুকু তার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ অংশটুকু তাঁর থেকে প্রমাণিত নেই। তাই একে তাঁর তালীমের অংশ সাব্যস্ত করা কীভাবে সহীহ হবে?

ভালভাবে বিষয়টি বুঝতে হবে। এক হল মাছূর দুআর মধ্যে কোন বাক্য বাড়িয়ে পড়ে নেওয়া; আরেক হল বর্ধিত অংশকে মাছূর দুআর অন্তর্ভুক্ত মনে করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিক্ষা দিয়েছেন বলে জ্ঞান করা–উভয়টি এক নয়। প্রথমটি যদিও অনুত্তম, তথাপি তা জায়েয; কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেননা এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করা হয়। এ জন্যই দেখা যায় উলামা ও মুহাদ্দেসীনে কেরাম আপন আপন রচনাবলীতে এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান যে, যেসব দুআ মাছূর নয় কিংবা কোন শব্দ বা বাক্য মাছূর তথা হাদীসে বর্ণিত নয়–সেগুলোকে মাছূর না হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত না হওয়ার কথা প্রমাণভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন; যাতে দ্বীনের সবকিছুই হুবহু সে আঙ্গিকেই সংরক্ষিত থাকে যে আঙ্গিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন।

মায়্যিতের জন্যে খতমে তাহ্লীল

٦١-من هلل سبعين ألف مرة، وأهداه للميت يكون براءة للميت من النار.

৬১–"সত্তর হাজার বার কালিমা (لا إله إلا الله) পাঠ করে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করলে সে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।"

এ কথাটি অনেকের মুখে হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিসেবে অতি প্রসিদ্ধ। বহু এলাকার মানুষকেই তা বলতে শোনা যায়; অথচ তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ ليس هذا حديثا صحيحا، ولا ضعيفا

"এটি সহীহ কিংবা যয়ীফ কোন সনদেই বর্ণিত নেই।" –মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ২৪/৩২৩

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কালিমা পাঠ করা একটি সাওয়াবের কাজ। আর মৃত ব্যক্তির নামে ঈসালে সাওয়াব করলে তা পৌঁছে থাকে, যা শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু এ নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং উক্ত সাওয়াবের কথা কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও নয়।

ইবাদতে কোন বিদআত নেই

٦٢-كل بدعة ضلالة إلا بدعة فى العبادة.

৬২–"প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা, তবে ইবাদতসংক্রান্ত হলে ভিন্ন কথা।"

শরীয়ত প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আকীদা ও ইবাদতসংক্রান্ত বিদআতই হল নিকৃষ্টতম বিদআত। এ দু'টি বিষয়েই সবচেয়ে অধিক বিদআত সংঘটিত হয়েছে। তাই ইবাদতসংক্রান্ত বিদআতকে গোমরাহীর আওতামুক্ত রাখা মূলত শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষায় বিকৃতি সাধন করা, যার উদ্দেশ্য

শরীয়তে হ্রাস-বৃদ্ধি সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনেকে এটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে পেশ করে থাকে। বাস্তবে তা আদৌ তাঁর হাদীস নয়। কথাটির সনদ তথা বর্ণনাসূত্রে রয়েছে একাধিক মিথ্যাবাদী।

হাফেয সুয়ূতী, মুহাদ্দেস তাহের পাটনী এবং মোল্লা আলী কারী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একে জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

–যাইলুল লাআলী ঃ ৪৮, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ১/৩২০, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ১৬, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৯২, আল মাসনূ ঃ ১৩৫, কাশফুল খাফা ঃ ২/১২০, আল লুউলুউল মারসূ ঃ ৬০

পৃথিবী ষাড়ের শিঙের উপর

٦٣–إن الأرض على صخرة، والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة، فتحركت الأرض، وهي الزلزلة.

৬৩–"পৃথিবী একটি পাথরের উপর। পাথরটি একটি ষাড়ের শিং-এর উপর। যখন বলদ শিং হেলায় তখন পাথর নড়ে উঠে, সাথে সাথে পৃথিবীও প্রকম্পিত হয়। আর এটিই ভূমিকম্প।"

অনেকে একে হাদীস মনে করে থাকে। বাস্তবে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। হাদীসে নববীর সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) এবং ইমাম আবূ হায়্যান (রহঃ) প্রমুখ হাদীসবিদগণ একে অবাস্তব ও জাল বলেছেন।

ভূমিকম্প আল্লাহ তা'আলার কুদরতের একটি নিদর্শন। বিজ্ঞানের একজন সাধারণ পাঠকেরও জানা আছে যে, এর বাহ্যিক কারণ কী? এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

দ্রষ্টব্য ঃ আলমানারুল মুনীফ ঃ ৭৮, আলইসরাঈলিয়াত ওয়ালমাওযূআত ঃ ৩০৫

কিসসা-কাহিনী

আমাদের দেশে ভিত্তিহীন ও জাল হাদীসের এক বিশাল উৎস হল কিসসা-কাহিনী বা ঘটনাবলী। এ পথে মানুষের মাঝে কত যে অলীক, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা সত্য বা হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে এর কোন ইয়ত্তা নেই! হাদীসের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সামান্য হলেও তাতে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। ভেবে দেখে এটি তাঁর হাদীস কি না। পক্ষান্তরে অন্যান্য কিসসা-কাহিনী বা ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন প্রকার তদন্ত, যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজনই বোধ করে না। কোন ওলী, বুযুর্গের জীবন-চরিত সম্পর্কে যার কাছে যা কিছু শোনে বা যে কোন বই-পুস্তকে যা কিছু পায় তা-ই বিশ্বাস করে ফেলে বা বর্ণনা করতে শুরু করে। একটু ভেবেও দেখে না যে, এটি সত্য কি অসত্য, প্রমাণিত কি অপ্রমাণিত। অথচ এরূপ করা মোটেও ঠিক নয়।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كفى بالمرأ كذبا أن يحدث بكل ما سمع.

"কেউ মিথ্যুক হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে সব-ই (যাচাই-বাছাই ছাড়া) বলে বেড়ায়।" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/৮, হাদীস ৫

তাই কিসসা-কাহিনী বা ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কমপক্ষে এতটুকু যাচাই তো অবশ্যই করতে হবে যে, তা কোন বাতিল বা মিথ্যা কথা তো নয়; এমন তো নয় যে, তা কুরআন, হাদীস, দ্বীন ও শরীয়তের বিধানাবলী এবং ঈমান-আকীদা পরিপন্থী।

বলা বাহুল্য, কিসসা-কাহিনীর বিশাল ভাণ্ডারে অনেক কথাই অমূলক, ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। অনেকগুলোই শরীয়তের বিধিবিধান, ঈমান-আকীদা তথা দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস্য-বিষয়ের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। এ সব ঈমান-আকীদা পরিপন্থী চমকপ্রদ আশ্চর্য কিসসা-কাহিনী দ্বারা কেউ কেউ

ওয়াযের মাহফিলও গরম করে থাকেন। তাই যার তার কাছে কোন কিসসা-কাহিনী শোনে বা যে কোন পুস্তকে দেখে তা সঠিক জ্ঞান করা যাবে না; বরং যাচাই-বাছাইয়ের পর মিথ্যা, বাতিল ও অলীক কিসসা-কাহিনী, ঘটনাবলী আমাদেরকে পরিহার করতে হবে। নিম্নে এরূপ দু'টি ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

১. একদা রাবেয়া বাসরী (রহঃ) একহাতে আগুন অপর হাতে পানি নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? রাবেয়া বাসরী (রহঃ) বললেন, পানি দিয়ে জাহান্নামের আগুন নেভাতে এবং আগুন দিয়ে জান্নাত জ্বালিয়ে দিতে যাচ্ছি। কেননা মানুষের ঈমান-আকীদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা জান্নাতের লোভে এবং জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করছে। (নাউযুবিল্লাহ)

২. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর কাছে এক বৃদ্ধা তার মৃত ছেলে জীবিত হওয়ার জন্যে দুআ চায়। তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তার হায়াত শেষ হয়ে গেছে। তাই জীবিত হবে না। আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেন, তার হায়াত শেষ হয়েছে বলেই তো আপনার কাছে বলছি। মোটকথা, দুআ কবূল না হওয়ায় তিনি রাগান্বিত হয়ে মালাকুল মওতের হাত থেকে রূহের থলে ছিনিয়ে নেন। এরপর থলের মুখ খুলে দিলে সকল রূহ বেরিয়ে যায় এবং মুরদারা জীবিত হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ)

ইসরাঈলী রেওয়ায়াত

'ইসরাঈলিয়াত' বা 'ইসরাঈলী রেওয়ায়াত' সেসব রেওয়ায়াতকে বলা হয় যেগুলো ইয়াহুদী বা নাসারা থেকে আমাদের কাছে পৌঁচেছে। সেগুলোর কিছু সরাসরি বাইবেল বা তালমূদ থেকে নেওয়া হয়েছে; কিছু এসবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে; কিছু সেসব মৌখিক রেওয়ায়াত যেগুলো আহলে কিতাবদের মাঝে পূর্ব থেকেই বর্ণিত হয়ে আসছিল এবং আরবের ইয়াহুদ-নাসারার মাঝে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

বাইবেল, তালমূদ, মুসনা বা যে কিতাবই ইয়াহুদ-নাসারার হাতে আছে তা অবশ্যই ইঞ্জীল ও তাওরাত এবং অন্যান্য আসমানী সহীফার আসল রূপ ও অবস্থায় নেই; বরং শব্দ-অর্থের হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিকৃতির কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ রূপ ও অবস্থার সাথে অনেক বিরোধপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এমন একটি বাস্তব ও সুস্পষ্ট কথা যা ন্যায়বান কোন ইয়াহুদ-নাসারাও স্বীকার করতে বাধ্য এবং এই বিকৃতির ইতিহাস, কারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর মুসলমানদের রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে যা যথার্থ, প্রামাণ্য ও বে-নযীর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

যখন তাদের মূল গ্রন্থাবলীর অবস্থা এই তাহলে সেগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থাবলীর কী করুণ দশা হবে তা আর বলার অপেক্ষাই রাখে না! মুসলমানদের ন্যায় রেওয়ায়াতের সঠিক সূত্রপরম্পরা বিদ্যমান না থাকায় তাদের মৌখিক রেওয়ায়াতে জাল, বানোয়াট ও প্রচলিত অবাস্তব অনেক কিছুই বাস্তবতা ও সত্যতার রূপ লাভ করেছিল।

এসব কারণেই ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের ভাণ্ডার সব ধরনের সত্য-মিথ্যায় ভরপুর ছিল। সেগুলোতে সত্য ও বাস্তব কথা যা ছিল তার চেয়ে বহুগুণে বেশী ছিল মিথ্যা, খুরাফাত ও অবাস্তব কথাবার্তা, কিচ্ছা-কাহিনী। নসীহত-উপদেশ ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকথার বিপরীতে মিথ্যা, বানোয়াট, বাতিল, উদ্ভট ও অবাস্তব বিষয়াবলীতে ছিল পরিপূর্ণ। তাই মুসলমানদের কাছে তাদের যতসামান্য যা পৌঁচেছে সেগুলোকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১. সেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াত যেগুলোর সত্যতা কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেমন ফিরআউনের পানিতে ডোবার ঘটনা, যাদুকরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হযরত মূসা (আঃ)এর সফলতা, তাঁর তূর পাহাড়ে গমন করা ইত্যাদি।

২. সেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াত যেগুলোর অসত্যতা বা মিথ্যা হওয়ার কথা কুরআন মাজীদ, সহীহ হাদীস বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেমন, হযরত সুলাইমান (আঃ) শেষ যুগে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হন। (নাউযুবিল্লাহ) এ বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে মিথ্যা। কেননা কোন

একজন নবী থেকে এরূপ কর্ম সংঘটিত হতেই পারে না। তারা তো সর্বপ্রকার গুনাহ থেকেই নিষ্পাপ হয়ে থাকেন–কুফর ও শিরক পর্যায়ের গুনাহ্র তো প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া কুরআন মাজীদে এ অপবাদটি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করা হয়েছে।

অনুরূপ হযরত দাউদ (আঃ)এর ব্যাপারে মনগড়া ও উদ্ভট কাহিনী রয়েছে যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর সিপাহসালার উরিয়ার স্ত্রীর উপর আসক্ত হয়েছিলেন। এ বর্ণনাও বিভিন্ন কারণে বাতিল। তন্মধ্যে একটি সুস্পষ্ট কারণ এই যে, সকল আসমানী দ্বীনের ঐকমত্যপূর্ণ ধারা হল আম্বিয়া (আঃ)এর নিষ্পাপ ও গুনাহমুক্ত হওয়া; অথচ উক্ত ঘটনাটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ জাতীয় ইসরাঈলী রেওয়ায়াতসমূহ নিঃসন্দেহে মিথ্যা। এগুলো রেওয়ায়াত করা জায়েয নেই। এগুলোকে শরীয়তের বিধান বা দ্বীনী আকীদাসমূহের ভিত্তি বানানোর তো প্রশ্নই আসে না।

৩. সেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াত যেগুলোর সত্যাসত্য দলীলাদির মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। কুরআন হাদীসে সেগুলো সত্য বলে সাব্যস্ত করা হয়নি; আবার মিথ্যাও বলা হয়নি।

এ প্রকার ইসারাঈলী রেওয়ায়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

حدثوا عن بني إسرائيل، فإنه كانت فيهم الأعاجيب.

"বনী ইসরাঈল থেকে (ঘটনাবলী) বর্ণনা কর। কেননা তাদের অনেক আশ্চর্যজনক (উপদেশমূলক) ঘটনাবলী রয়েছে।" –কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমাদ ঃ ১৬

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم.

"যখন আহ্লে কিতাব তোমাদের নিকট কোন কিছু বর্ণনা করে তখন

তোমরা তাদেরকে বিশ্বাসও করো না; আবার অবিশ্বাসও করো না; বরং বল, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তার কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি। তাহলে কোন সত্য বিষয়কে মিথ্যা বলার (যদি তা বাস্তবে সত্য হয়ে থাকে) এবং কোন মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকার করার আশংকা থাকবে না।" –সহীহ বুখারী ঃ ২/১০৯৪, হাদীস ৭৩৬২

সারকথা, ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী নিম্নরূপ ঃ

(ক) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের সত্যতা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো বিশ্বাস করা জরুরী।

(খ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের অসারতা কুরআন হাদীস বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত সেগুলো অবিশ্বাস করা জরুরী।

(গ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের ব্যাপারে কুরআন হাদীসে সত্যতারও কোন দলীল-প্রমাণ নেই; আবার মিথ্যা হওয়ারও কোন দলীল-প্রমাণ নেই সেসব রেওয়ায়াতের ব্যাপারে নিরব ভূমিকা পালন করা জরুরী। এ প্রকার রেওয়ায়াত সম্পর্কে এই ঈমান রাখা জরুরী যে, এর প্রকৃত ইলম আল্লাহ তাআলাই জানেন। এ প্রকার ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সাধারণত ইতিহাস, পৃথিবী সৃষ্টির আদি-অন্ত, পূর্ববর্তী জাতির কিসসা-কাহিনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি সম্পর্কিত।

(ঘ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াত নসীহতপূর্ণ এবং তাতে বাতিল কিছু নেই–সেগুলো বর্ণনা করা জায়েয।

(ঙ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াতে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন ফায়েদা নেই সেগুলো তৃতীয় প্রকারভুক্ত হলেও সেগুলো নিয়ে অধিক চর্চা বা আলোচনা করা সমীচীন নয়; বরং এগুলোর গবেষণার পিছনে সময় নষ্ট করা জায়েয নেই।

(চ) শরীয়তের আহকাম ও বিধানাবলীর ব্যাপারে ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের কোন মূল্য নেই। কেননা, এ সংক্রান্ত ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের কোনটি যদি

অবিকৃত থেকেও থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে পূর্বযুগে অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের সাথে তার মিলও থেকে থাকে, তথাপি এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শরীয়তে মুহাম্মাদীর আবির্ভাবের মাধ্যমে তা রহিত হয়ে গেছে। তাই আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে এখন শুধু কুরআন ও সুন্নাতের উপর নির্ভর করতে হবে। তাওরাতের উপরও নয়; ইঞ্জীলের উপরও নয়। ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের তো কোন প্রশ্নই আসে না!![1]

সুনানে দারেমীতে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت، فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال أبو بكر رضي الله عنه ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فنظر عمر رضي الله عنه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله تعالى من غضب الله، ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني.

رواه الدارمي، والحديث صحيح لغيره.

১–আররিসালা-ইমাম শাফী (রহঃ) ঃ ৩৯৮-৪০০, ফাতহুল বারী ঃ ৮/২০, উমদাতুল কারী ঃ ১৮/৯৪, আলআকীদাতুত ত্বহাবিয়া ঃ ২৭০, ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১৩/৩৬৬-৩৬৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ১/৫, আত্তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন ঃ ১/৬১-৬২, আল্ইসরাঈলিয়াত ওয়া আসারুহা ফী কুতুবিত তাফাসীর–ডঃ রামযী না'অনা'অ; আল্ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফাসীর ঃ ১০৬-১০৭, উলূমুল কুরআন-জাস্টিজ মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ঃ ৩৪৫-৩৪৮

"জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রাঃ) তাওরাতের একটি নোসখা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তাওরাতের একটি নোসখা। তিনি নিরব থাকলেন। এরপর উমর (রাঃ) তা পড়তে থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তা দেখে আবূ বকর (রাঃ) বলেন, হে উমর! তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের অবস্থা দেখছ না?! উমর (রাঃ) তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর ক্রোধ থেকে এবং তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আশ্রয় কামনা করি; আমি একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যাঁর কুদরতি হাতে মুহাম্মাদের জান! যদি তোমাদের মাঝে (আল্লাহ তাআলার নবী) মূসা (আঃ)-এরও আগমন ঘটে এবং তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ কর তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। খোদ মূসা যদি আমাকে পেতেন তা হলে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন।" –সুনানে দারেমী ঃ ৩/১৯১, হাদীস ৪৫৮

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرءون محضا، لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله، وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ماجاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.

"তোমরা কীভাবে আহলে কিতাবের নিকট কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের কিতাব যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা তোমরা তেলাওয়াত করে থাক এবং এর মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির কোন আশংকাই নেই। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের একথা জানিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আসমানী কিতাবে বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং নিজ হাতে কিতাব রচনা করে বলেছে ঃ এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত; যাতে এর বিনিময়ে কিছু কামাই করতে পারে। তোমাদের নিকট যে ইল্‌ম পৌঁচেছে তা কি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করা থেকে তোমাদেরকে বাঁধা দান করে না। আল্লাহ্ তাআলার কসম! আমি তাদের একজনকেও দেখিনি যে, তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে সে ব্যাপারে তোমাদের নিকট জিজ্ঞেস করে।"–সহীহ্ বুখারী ঃ ২/১০৯৪, হাদীস ৭৩৬৩

সাহাবায়ে কেরাম এবং আয়িম্মায়ে দ্বীন থেকে যেসব ইসরাঈলী বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো শরীয়তের এই পরিধিতে সীমাবদ্ধ। কোন বাতিল ও মিথ্যা ইসরাঈলী রেওয়ায়াত তাঁরা কখনো বর্ণনা করেননি এবং শরীয়তের কোন বিষয়ে কোন প্রকারেরই ইসরাঈলী রেওয়ায়াত গ্রহণ করেননি; কিন্তু পরবর্তীতে কতক ব্যক্তি এব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা এবং সাহাবায়ে কেরাম ও আয়িম্মায়ে দ্বীনের কর্মপন্থার উপর অটল থাকতে পারেননি; তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে এবং এ ব্যাপারে তারা চরম শিথিলতার পরিচয় দিয়েছেন। কোন ধরণের চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা সর্বপ্রকার ইসরাঈলী রেওয়ায়াত বর্ণনা করে। যা আদৌ কাম্য ছিল না।

ইসরাঈলী রেওয়ায়াত এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কীয় এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আপনি অনুমান করতে পারেন যে, কিসসা-কাহিনী ও ইতিহাসের কিতাবে; এমনকি কতক তাফসীর গ্রন্থেও অসংখ্য পরিমাণে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যেগুলোর অসত্যতা সুপ্রমাণিত। তাই এ প্রকার ইসরাঈলী রেওয়ায়াত পরিহার করা ওয়াজিব। অথচ আমরা

কতক জাহেল কিসসা-কাহিনীকার, ওয়ায়েয-বক্তা বা লেখককে দেখতে পাই যে, তারা কুরআন মাজীদ, সহীহ হাদীস, সহীহ সীরাতে নববী, সঠিক হেকায়াতে সাহাবা ইত্যাদির পরিবর্তে লোকদেরকে এসব আজে-বাজে ও উদ্ভট ইসরাঈলী রেওয়ায়াতই পরিবেশন করে থাকেন এবং এগুলোতেই তারা অধিক তৃপ্তিলাভ করে থাকেন।

এ প্রকৃতির ইসরাঈলী রেওয়ায়াতসমূহ নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হওয়া খুবই জরুরী। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অন্য বিষয়ে রচিত পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বানিয়ে দেওয়া হলে এর প্রতি অবহেলারই নামান্তর হবে। আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে; তন্মধ্যে দু'টি গ্রন্থ অত্যন্ত উপকারী ও নির্ভরযোগ্য।

১. মুহাম্মাদ রমযী না'অনা'অ কৃত আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়া আসারুহা ফী কুতুবিত তাফসীর।

২. মুহাম্মাদ আবু শুহ্বা কৃত আল্ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফাসীর।

উর্দূ ভাষায় মাওলানা আসীরাদ্রভীর গ্রন্থটিও এ বিষয়ের একটি ভাল রচনাই বলতে হয়; যদিও প্রায় সবই ডঃ মুহাম্মাদ আবু শুহ্বার গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট কায়মনোবাক্যে এই দুআ করছি যে, তিনি আমাদেরকে সর্বপ্রকার বাতিল, মিথ্যা ও উদ্ভট কথা বর্ণনা করা এবং এসবের প্রচার-প্রসার থেকে হেফাযত করুন। আমীন।[১]

---

(١) **تنبيهان مهمان** : الأول: من المعلوم عند البصراء بعلوم الحديث أن من الرواة من يخطئ فيرفع الموقوف وهماً، مع أنه لا يصح مرفوعاً، فكذلك من الرواة غير المتقنين من يخطئ فيسمع أحدا من الصحابة أو التابعين يحدث بشيء من الإسرائيليات فيختلط عليه الأمر ويجعله مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عنه بريء. فما نبه أئمة الحديث على كون أصله إسرائيليا غير ثابت مرفوعاً يعتمد قولهم ولا يلتفت إلى خطأ من أخطأ فجعله مرفوعاً.

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত সম্পর্কীয় ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনাসমূহ

ভূমিকা ঃ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম নন; বরং তাঁদের উত্তরসূরী উলামায়ে কেরামের মধ্যেও এমন বহু মহামনীষীর আগমন ঘটেছে এই ধরাধামে, যাঁদের মর্যাদা, গৌরব, কীর্তি ও অবদান যথাযথভাবে ব্যক্ত করার জন্যে অনেক সময় অভিধান ভাণ্ডারে শব্দ অনুসন্ধান করে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে নবী রাসূলগণের কথা তো বলাই বাহুল্য।

আর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান বর্ণনার ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কী করা যেতে পারে ?

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সব যাহেরী ও বাতেনী গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন এবং যেসব মর্যাদায় আসীন করেছেন, তাঁর সীরাত মুবারক

الثاني: بعض الروايات المزعوم كونها إسرائيلية لم يثبت كونها إسرائيلية أيضاً، فهناك من الروايات ما نسبت إلى كعب ووهب مثلاً، وهما منها بريئان، فهو إما مزورة عليهما أو نسبت إليهما خطأ، ويظن بعض الناس أن كل ما روي من طريقهما ونحوهما فهو من الإسرائيليات، وهذا ظن سوء، بل ما صح نقله عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، أو ثبت وجوده في كتبهم وصحائفهم فهو من الإسرائيليات التي تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة.

وأما ما لم يصح نقله عنهم أو لم يثبت وجوده في كتبهم فكونه من الإسرائيليات مشكوك أو منتف، فافهم ذلك ولا تهم.

এবং তিনি নিজেই সেগুলোর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

তাঁর সীরাত মুবারকের যে অংশটুকু বিপুল বর্ণনা এবং নির্ভরযোগ্যসূত্রে আমাদের নিকট পৌঁচেছে এবং যা আজো আমাদের হাতে বিদ্যমান রয়েছে, শুধু তা-ই তাঁর সুমহান মর্যাদা বুঝাতে সক্ষম। তা ছাড়া তিনি নিজেই আপন ফযীলত ও মর্যাদার সবচেয়ে বড় সাক্ষী। তাঁর সীরাত মুবারকের মাহাত্ম্য, পূর্ণাঙ্গতা, বিশ্বজনীনতা ও স্থায়িত্বও তাঁর মর্যাদা ও পরিপূর্ণতার কম বড় সনদ নয়।

তাঁর সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব যা অর্জনকৃত নয়, তাতে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ না রেখে যদি তাঁর চরিত্র মাধুর্য্য, তাঁর শামায়েল ও অভ্যাস, তাঁর অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মধ্যকার সম্পর্ক, তাঁর ইবাদত, লেনদেন, আচারব্যবহার এবং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁর অতুলনীয় শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি সামান্যতম দৃষ্টিপাত করা হয়, তা হলে নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে ঃ

بعد از خدا بزرگ تر × توئ قصه مختصر

খোদার পরে শ্রেষ্ট তুমি,
সংক্ষেপে মোরা এই তো জানি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে মানবতা কত ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল! সেই মযলূম মানবতাকে তাঁর সীরাত ও শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে মানবতার সুউচ্চ আসনে আসীন করেছেন! তাঁর সীরাতকে আদর্শ হিসেবে বরণ করে, তাঁর শিক্ষাকে পাথেয় করে মানবতা উন্নতির চরম শীর্ষে পৌঁচেছে!

পক্ষান্তরে যারা তাঁর সীরাত মুবারক এবং অনুপম শিক্ষা-দীক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা অনেক কিছুই হারিয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে চরম ক্ষতির শিকার হয়েছে। এসব বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা উপলব্ধির জন্যে যথেষ্ট। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে তাঁর নবুওয়তের অবদান অবলোকনেও রিসালাতে মুহাম্মাদীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রতিভাত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, তাঁর প্রতি আল্লাহ তাআলার মহব্বত, করুণা ও ইহসানের কথা খোদ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন। এ সবের এক বিশাল অংশ তাঁর হাবীবের মুখেও প্রকাশ করিয়েছেন। আবার অনেক কিছুই তাঁর প্রত্যক্ষ সীরাতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, যেগুলো শুধু তাঁর সীরাত পাঠের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত হক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি বড় হক এ-ও যে, উম্মত তাঁর পবিত্র সীরাত এবং অনুপম শিক্ষা যথাযথভাবে অর্জন করে তা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে বরণ করবে। তাঁর মাহাত্ম্য ও অবদানসমূহ জেনে সেগুলো আলোচনা করবে।

মোটকথা, সঠিকভাবে সেগুলোর জ্ঞানার্জন করা এবং যথাযথভাবে স্ব-স্ব জীবনে তা বাস্তবায়িত করা সত্যিই এক মহান ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এসবের জন্যে জানমালের পাশাপাশি মানবীয় কামনা-বাসনাকেও উৎসর্গ করতে হয়, যা সাধারণত মানুষের পক্ষে কষ্টকর।

মানব প্রকৃতির এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান তার কুটিল জাল বিস্তার করে আসছে আবহমান কাল থেকে। সে বহু সাধারণ মানুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত, অনুপম শিক্ষা এবং তাঁর সুপ্রমাণিত শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদানসমূহ থেকে দূরে নিয়ে যায়। এরপর তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন কিসসা-কাহিনী চর্চায় লাগিয়ে দেয়, যা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়; বরং ভিত্তিহীন ও জাল। যদি নির্ভরযোগ্যসূত্রে সেগুলো প্রমাণিতও হত, তবুও সেগুলোর দ্বারা কখনো তাঁর পূর্ণত্ব, মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সুষমার বহিঃপ্রকাশ ঘটত না।

শয়তানের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য হল, যাতে মানুষ তাঁর পবিত্র সীরাত ও অনুপম শিক্ষাকে আদর্শ বানানোর সৌভাগ্য অর্জন করতে না পারে

এবং তাঁর আসল ও সুপ্রমাণিত মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদানসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা (যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও উদ্দেশ্য তা) থেকে মানুষ চির বঞ্চিত হয়ে যায়। এব্যাপারে শয়তান তার উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সফলও হয়েছে। نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে আয়াত, সহীহ হাদীস, সীরাত সম্পর্কীয় সহীহ রেওয়ায়াত ও বর্ণনাসমূহের উপরই নির্ভর করা উচিত। যদি এসব পরিহার করে শুধু বাতিল, মিথ্যা, জাল ও ভিত্তিহীনই নয়; বরং দুর্বল বর্ণনারও আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তা হলে তাতে অমুসলিমদের নিকট এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা ছাড়া আর কিছুই হবে না যে, আমাদের নবীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এমন, যা দুর্বল বর্ণনা ছাড়া প্রমাণ করা যায় না! (নাঊযুবিল্লাহ)

পাঠকদের নিকট আবেদন থাকবে, তারা যেন কুরআন, হাদীস, শরীয়ত ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর অনুপম শিক্ষা অর্জন করেন এবং সেখান থেকেই সীরাত, শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতসমূহের ইল্‌ম গ্রহণ করেন।

ভূমিকাস্বরূপ এ আলোচনা বার-বার অধ্যয়ন করুন। এরপর নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

ভালভাবে বুঝে রাখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে যে অবগত, সে কথিত কিসসা-কাহিনী, মিথ্যা, জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতসমূহ পড়ে নির্দ্বিধায় বলবে যে, এগুলোর চর্চা, প্রচার ও প্রসার করা নবুওয়তের সাথে গোস্তাখি ছাড়া আর কিছুই নয়।

'আল আসারুল মার্‌ফুআ ফিল আখ্‌বারিল মাওযূআ'–এর ভূমিকায় আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহঃ) এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কোন মিথ্যা চালিয়ে দেওয়া হারাম হওয়া সম্পর্কে বহু সহীহ্ হাদীস উল্লেখ

করার পর লেখেন ঃ

قد ثبت من هذه الروايات أن الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة ما لم يقله إليه حرام مطلقا، ومستوجب بعذاب النار، سواء كان ذلك في الحلال والحرام، أو ترغيب وترهيب.

وأيضا ثبت من الروايات المذكورة أنه كما أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا بأن ينسب إليه قولا لم يقله وعملا لم يفعله: من أكبر الكبائر.

كذلك نسبة فضيلة أو مرتبة لم يثبت وجودها في الذات المقدسة النبوية بالآيات، أو الأحاديث المعتبرة، إلى ذاته المطهرة أيضا من أكبر الكبائر.

فليتيقظ الوعاظ المذكورون، وليحذر القصاص والخطباء الآمرون الزاجرون، حيث ينسبون كثيرا من الأمور إلى الحضرة المقدسة التي لم يثبت وجودها فيها، ويظنون أن في ذلك أجرا عظيما، لإثبات فضل الذات المقدسة وعلو قدرها، ولا يعلمون أن في الفضائل النبوية التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة غُنْيَة عن تلك الأكاذيب الواهية.

ولعمري فضائله صلى الله عليه وسلم خارجة عن حد الإحاطة والإحصاء، ومناقبه التي فاق بها جميع الورى كثيرة جدا من غير انتهاء، فأي حاجة إلى تفضيله بالأباطيل، بل هو موجب للإثم العظيم، وضلالة عن سواء السبيل.

অর্থাৎ এ সকল রেওয়ায়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হালাল হারামের বিধিবিধান অথবা উৎসাহ ও ভীতি প্রদান–যে কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জাল করা এবং তিনি যা ইরশাদ করেননি, তা তাঁর প্রতি সম্বন্ধ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম, জাহান্নাম অবধারিত হওয়ার মত অপরাধ।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, কো : কথা বা কাজ

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করা অর্থাৎ তিনি যা বলেননি বা করেননি, তা তিনি 'বলেছেন' বা 'করেছেন' বলে উল্লেখ করা অতি বড় কবীরা গুনাহ (মহাপাপ)।

অনুরূপ আয়াত অথবা নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাঁর যে ফযীলত বা মর্যাদা প্রমাণিত নেই, তা তাঁর প্রতি সম্বন্ধ করাও সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম।

ওয়ায-নসীহতকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত। কিসসা-কাহিনীকার, বক্তাদের সাবধান থাকতে হবে। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন সব বিষয়ের সম্বন্ধ করে থাকেন যা তাঁর ব্যাপারে প্রমাণিত নেই। তারা মনে করেন যে, এভাবে তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণ করার মধ্যে বিরাট সাওয়াব রয়েছে; অথচ কুরআন হাকীম, মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং সহীহ হাদীস দ্বারা এত ফযীলত প্রমাণিত রয়েছে যার ফলে এসব মিথ্যা ও বানোয়াট রেওয়ায়াত বর্ণনার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

আল্লাহ্ তাআলার শপথ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, যা বলে শেষ করা যাবে না! তিনি মর্যাদার দিক দিয়ে সৃষ্টিকুল থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে। কাজেই তাঁর ফযীলত প্রমাণে বাতিল ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা কবীরা গুনাহ (পাশাপাশি এক ধরনের বোকামিও বটে)।" –আল-আসারুল মারফূআ ঃ ৩৬

সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এখন এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত জাল রেওয়ায়াত-সমূহের অসারতা সম্পর্কে জানা যাক।[১]

১–এখানে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)–এর সে উক্তি পুনরায় উল্লেখ করছি, যা বক্ষমান বইটির ভূমিকাতেও রয়েছে। তিনি স্বরচিত গ্রন্থ 'আত তাকাশ্শুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ' পৃষ্ঠা ঃ ৪০৩–এ নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ঃ

إن من أعظم الفِرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يُري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل.

"চরম মিথ্যাচার হচ্ছে, কোন ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে স্বীকার

মুহাম্মাদ নামের সকল ব্যক্তি এবং তাদের পিতাগণ জান্নাতী

٦٤–من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو ومولوده في الجنة.

৬৪–"যে ব্যক্তি বরকতের জন্যে সন্তানের নাম মুহাম্মাদ রাখবে, পিতা ও সন্তান উভয়ই জান্নাতে যাবে।"

শরীয়তে নাম রাখার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। রয়েছে এ সংক্রান্ত অনেক বিধিবিধান, যা হাদীস ও ইসলামী আদব বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে উল্লেখ আছে। কিন্তু কুরআন হাদীস ও উম্মতের ইজমা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, নামকরণের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র পরিচয় লাভ করা। শুধু নামকে ব্যক্তির ফযীলত, মর্যাদা, জান্নাতলাভ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায় মনে করার কোন সুযোগ শরীয়তে নেই।

যাহোক, 'মুহাম্মাদ' নাম রাখার ফযীলতসম্বলিত পূর্বোক্ত উক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

হাফেয যাহাবী (রহঃ) একে জাল গণ্য করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)ও এ মতকে সমর্থন করেছেন। –মীযানুল ইতিদাল ঃ ১/৪৪৭, লিসানুল মীযান ঃ ২/১৬৩-১৬৪

এ পর্যায়ে আরো বহু ভিত্তিহীন ও জাল হাদীস লোক মুখে প্রচলিত আছে। যেমন ঃ

৬৫–"আমার নামে সন্তানের নাম রাখ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা

করবে অথবা স্বপ্নে যা দেখেনি তা দেখার দাবী করবে; কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমন কথা চাপিয়ে দেবে যা তিনি বলেননি।"

এরপর থানভী (রহঃ) উক্ত হাদীসের আলোচনায় হাদীস বয়ানে অসতর্কতার ব্যাপারে সাবধান করতে গিয়ে বলেন ঃ "যদি প্রবল সুধারণার কারণে কারোর সন্দেহই না হয় যে, বর্ণনাকারী ভুল বর্ণনা করেছেন, তা হলে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। কোন কোন বুযুর্গের বেলায় এরূপই ঘটেছে। এ পথেই তাঁদের বক্তৃতা ও রচনায় কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের সতর্ক করার পরও যদি কেউ এ জাতীয় হাদীস বর্ণনায় অটল থাকে, যেমনটি সিংহভাগ জ্ঞানপাপীদের অভ্যাস, তা হলে তাকে দোষমুক্ত মনে করার কোন সুযোগ নেই।"

কসম করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার নামের সাথে যার নাম মিলবে আমি কখনো তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাব না।"

নামের ব্যাপারে এ ধরণের বেশ কিছু জনশ্রুতি রয়েছে। কোনটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়।

এ ধরনের উক্তির অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন ঃ كل ما ورد فيه فهو موضوع "মুহাম্মাদ নাম রাখার ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে, সবই জাল।" –তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ ঃ ১/১৭৪

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

لم يصح في فضل التسمية بمحمد حديث.

"মুহাম্মাদ নাম রাখার ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদীসই প্রমাণিত নয়।" –তানযীহুশ শরীয়া ঃ ১/১৭৪

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ)ও সেগুলোর অসারতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। –আল মানারুল মুনীফ ঃ ৫৭, ৬১

আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন ঃ সিফরুস সাআদা ঃ ২৫৮, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ৮৯, তানযীহুশ শরীয়া ঃ ১/১৭২-১৭৪, আল মাওযূআতুল কুবরা ঃ ১৫৭, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৫৭৯

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন নবী, সাহাবী, ওলী-বুযুর্গ ও নেককার ব্যক্তিবর্গের নামের সাথে নাম মিলিয়ে রাখা ভাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم.

"তাঁরা (পূর্ববর্তী লোকেরা) নিজেদের নবী ও নেককারদের নামে নাম রাখত।" –সহীহ মুসলিম ঃ ২/২০৭, হাদীস ২১৩৫

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن

"তোমরা নবীদের নামে নাম রাখ এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।" –সুনানে আবী দাউদ ঃ ৬৭৬, হাদীস ৪৯৫০, সুনানে নাসায়ী ঃ ২/১০৫, হাদীস ৩৫৬৫, আল আদাবুল মুফরাদ ঃ ২৮৪, হাদীস ৮১৪

মেরাজে জিবরাঈল (আঃ)-এর সঙ্গ ত্যাগ

৬৬–মেরাজকেন্দ্রিক একটি ভিত্তিহীন কথা লোকমুখে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) এই বলে সামনে অগ্রসর হতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, আমি আর এক কদম অথবা আর এক চুল পরিমাণ অগ্রসর হলে আমার ডানাসমূহ জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।"

এরূপ ধারণা করাও ঠিক নয়। এগুলো কিসসা-কাহিনীকারদের মনগড়া বানানো কথা।

প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহঃ) বলেন ঃ

ومن الغلو المذموم أيضا: زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى تأخر جبريل، وقال: لو تقدمت خطوة لاحترقت. وهذا كذب قبيح، والواقع أن جبريل عليه السلام لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة لحظة واحدة، كان معه في سدرة المنتهى وفي غيرها.

"এরূপ ধারণা করা নিকৃষ্টতম বাড়াবাড়ি যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহায় পৌঁছেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) পিছনে হটে যান এবং বলেন, যদি আমি আর এক পা অগ্রসর হই তা হলে জ্বলে যাব।" এটি একটি মিথ্যা ও বাজে কথা।

"বস্তুত উক্ত রাতে জিবরাঈল (আঃ) এক মুহূর্তের জন্যেও রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' এবং অন্যান্য স্থানেও তিনি তাঁর সাথে ছিলেন।" –আল বুসীরী মাদেহুর রাসূলিল আযাম ঃ ৭২

জুতা নিয়ে আরশ গমন

লোকমুখে মেরাজ সম্পর্কে আরো একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মেরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরশে মুআল্লা'য় প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলতে চাইলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

٦٧–يا محمد! لا تخلع نعليك، فإن العرش يتشرف بقدومك متنعلا، ويفتخر على غيره متبركا.

৬৭–"হে মুহাম্মাদ! আপনি জুতা খুলবেন না। (জুতা নিয়েই আরোহন করুন) কেননা, আপনার জুতা নিয়ে আগমনে আরশ ধন্য হবে। এটি বরকত লাভের কারণে অন্যের উপর গর্ববোধ করবে।"

কথাগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ তো আছেই, কোন কোন বক্তার মুখেও শোনা যায়। এমনকি কতিপয় সীরাত গ্রন্থকারও তা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তা প্রমাণিত নয়। সবগুলোই মনগড়া ও বানানো কথা।

ইমাম রযীউদ্দীন আল-কায্‌ভীনী (রহঃ)–কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা নিয়ে আরশ গমন এবং আল্লাহ তাআলার সম্বোধন (হে মুহাম্মাদ! আপনার জুতায় আরশ ধন্য হয়েছে) ইত্যাদি প্রমাণিত কি না। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ

أما حديث وطئ النبي صلى الله عليه وسلم العرش بنعله، فليس بصحيح ولا ثابت، بل وصوله إلى ذِروة العرش لم يثبت في خبر صحيح، ولا حسن ولا ثابت أصلا، إنما صح في الأخبار انتهاؤه إلى سدرة المنتهى فحسب.

"জুতা পায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরশ গমনের হাদীস প্রমাণিত নয়। এমনকি তিনি (খালি পায়ে) আরশে পৌঁচেছেন এমন কথাও কোন নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত নেই। সহীহ বর্ণনা মতে তিনি শুধু সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেছেন।" –সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ–শরহুল মাওয়াহেব ঃ ৮/২২৩

অপর এক মুহাদ্দেসের ভাষ্য ঃ

قاتل الله من وضع أنه رقى العرش بنعله، ما أعدم حياءه، وما أجرأه على سيد المتأدبين، ورأس العارفين، قال: وجواب الرضي القزويني هو الصواب، فقد وردت قصة الإسراء والمعراج مطولة ومختصرة عن نحو أربعين صحابيا، وليس في حديث أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان تلك الليلة في رجليه نعل، وإنما وقع ذلك في نظم بعض قصاص جهلة...، ولم يرد في خبر ثابت، ولا ضعيف أنه رقى العرش، وافتراء بعضهم لا يلتفت إليهم.

"আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করুন, যে বলে তিনি জুতা নিয়ে আরশে আরোহন করেছেন। কত ঔদ্ধত্য! কত বড় স্পর্ধা!! যিনি শিষ্টাচারীদের সরদার, যিনি আরেফবিল্লাহগণের মধ্যমণি, তাঁর ব্যাপারে এমন কথা! তিনি আরো বলেন যে, রযীউদ্দীন আল-কাযভীনীর উত্তরই সঠিক। প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ তথা ঊর্ধ্ব জগতে গমনের ঘটনা বর্ণিত আছে। এঁদের কারো হাদীসে এ কথা উল্লেখ নেই যে, সে রাতে তাঁর পায়ে জুতা ছিল। এ কথা কতক গণ্ডমূর্খ কিসসা-কাহিনীকারদের কাব্যে এসেছে। ... কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বা দুর্বলসূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এ কথা নেই যে, তিনি আরশে আরোহন করেছেন। এটি কারো বানানো কথা, এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যায় না।" –শরহুল মাওয়াহেব ঃ ৮/২২৩

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মাক্কারী (রহঃ) স্বরচিত গ্রন্থ 'ফাত্হুল মুত্আল ফী মাদ্হি খাইরিন নিআল'–এ উপরোক্ত কথাটিকে জাল বলে জানিয়েছেন।
–আল আসারুল মারফূআ ঃ ৩৭

আরো দ্রষ্টব্য ঃ গায়াতুল মাকাল ফীমা য়াতাআল্লাকু বিন্নিআল ঃ আল্লামা লাখনোভী (রহঃ)

রাতের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরে সুঁই পাওয়ার ঘটনা

٦٨–كانت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه في ليلة مظلمة فسقطت من يدها إبرة، ففقدت، فالتمسها ولم تجد، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت لمعة أسنانه فأضائت الحجرة ورأت عائشة رضي الله عنها بذلك الضوء إبرة.

৬৮–"একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) রাতের অন্ধকারে তাঁর বিছানায় ছিলেন। আম্মাজী আয়েশা (রাঃ)-এর হাত থেকে একটি সুঁই পড়ে গেলে খোঁজাখুঁজির পরও তা পাচ্ছিলেন না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলে তাঁর দাঁতের নূরের ঝলকে পুরো কামরা আলোকিত হয়ে যায়; ফলে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সে নূরে তাঁর সুঁইটির সন্ধান পান।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযীলত সম্পর্কে যে সব ভিত্তিহীন ও বাতিল কথা প্রসিদ্ধ হয়েছে তন্মধ্যে এটি অন্যতম।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহঃ) এটাকে জাল আখ্যা দিয়ে বলেন ঃ

ومنها ما يذكره الوعاظ عند ذكر الحسن المحمدي أنه في ليلة من الليالي سقطت من عائشة رضي الله عنها، إبرته ففقدت...، وهذا، وإن

كان مذكورا في «معارج النبوة» وغيره من الكتب الجامعة للرطب واليابس فلا يستند بكل ما فيها إلا النائم والناعس، ولكنه لم يثبت رواية ودراية.

"ফযীলতসংক্রান্ত জাল ও মনগড়া রেওয়ায়াতসমূহের অন্যতম একটি রেওয়ায়াত, যা বক্তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করে থাকেন, তা হল কোন এক রাতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাত থেকে একটি সুঁই পড়ে যায় ... ।

"উক্ত রেওয়ায়াতটি বানোয়াট ও জাল; যদিও তা 'মাআরেজে নবুওয়্যাহ' সহ এমন কিছু সীরাতগ্রন্থে উল্লেখ আছে, যেগুলোতে শুদ্ধ-অশুদ্ধ সবধরনের কথাই স্থান পেয়েছে। এ প্রকার গ্রন্থাদির সবকিছুকে গাফেল ব্যক্তিই প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারে। তাছাড়া পূর্বোক্ত কথাটির সূত্র ও বক্তব্য কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়।" –আল আসারুল মারফূআ ঃ ৪৬

আল্লামা সায়্যিদ সুলাইমান নদভী (রহঃ)ও উক্ত রেওয়ায়াতটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন।–সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঃ ৩/৪২৯

শাইখুল হাদীস সরফরায খান সফদর সাহেবও এটিকে জাল হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। –নূর ও বাশার ঃ ৮৫-৮৭

উক্ত জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত দ্বারা সে সব লোক আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস পেয়ে থাকে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দৃশ্য নূরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস রাখে। তারা বলে যে, তিনি দৃশ্য নূরের সৃষ্টি বলেই তো হযরত আয়েশা (রাঃ) রাতের আঁধারে তাঁর নূরে হারানো সুঁচ খুঁজে পেয়েছিলেন।

উক্ত রেওয়ায়াতটি যদি জাল না হয়ে হাদীস হিসেবে প্রমাণিতও হত; তথাপি তাতে এমন কোন কথা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃশ্য নূরের সৃষ্টি ছিলেন, তাঁর উপস্থিতিতে দৃশ্য অন্ধকার দূর হয়ে যেত। যদি তা-ই হত তবে তো তিনি পূর্ব থেকেই সেখানে ছিলেন, তাঁর আলোতেই সুঁচ পাওয়া যেত। সহসা দাঁত থেকে নূর বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

বুঝা গেল দৃশ্য নূরের সৃষ্টি হওয়ার কারণে সুঁচ পাওয়া গেছে এমন নয়; বরং ঘটনাটি প্রমাণিত হলে তা একটি মুজিযাই হত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শুয়ে থাকতাম আর আমার উভয় পা তাঁর সামনে ছড়ানো থাকত। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন আমার পায়ে হালকা চাপ দিতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম এবং তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা প্রসারিত করতাম। সে যুগে ঘরে বাতি (জ্বালাবার মত কিছু) ছিল না। (তাই অন্ধকারে আমি দেখতে পেতাম না যে, তিনি কখন সিজদা করছেন)।" –সহীহ বুখারী ঃ ১/৫৬, সহীহ মুসলিম ঃ ১/১৯৮

বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেও বাহ্যিক অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার জন্যে দৃশ্য নূরের (আলোর) প্রয়োজন হত।

আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না

٦٩–لولاك لما خلقت الأفلاك.

৬৯–"আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমানসমূহ (কোন কিছুই) সৃষ্টি করতাম না।"

এটি লোকমুখে হাদীসে কুদ্সী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ।

অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞরা এব্যাপারে একমত যে, এটি একটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত, মিথ্যুকদের বানানো কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

ইমাম সাগানী, আল্লামা পাটনী, মোল্লা আলী কারী, শাইখ আজলূনী, আল্লামা কাউকজী, ইমাম শাওকানী, মুহাদ্দেস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক

আল-গুমারী এবং শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম এটিকে জাল বলেছেন। [১]

–রিসালাতুল মাওযূআত ঃ ৯, তাযকিরাতুল মাওযূআত ঃ ৮৬, আল-মাসনূ ঃ ১৫০, কাশফুল খাফা ঃ ২/১৬৪, আল-লুউলুউল মারসূ ঃ ৬৬, আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৪১০, আল-বূসীরী মাদেহুর রাসূলিল আযম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ ৭৫, ফাতাওয়া আযীযিয়া ঃ ২/১২৯–ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ঃ ১/৭৭

কেউ কেউ বলেন যে, এই রেওয়ায়াত যদিও জাল; কিন্তু এর মূল বিষয়বস্তু (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতিরেই এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে পয়দা করার ইচ্ছা না করলে তিনি কোন কিছুই পয়দা করতেন না) সঠিক।

অথচ আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়া ও সমগ্র জগতকে কেন সৃষ্টি করলেন, তা ওহী ছাড়া জানার কোন উপায় নেই। ওহী শুধু কুরআন ও হাদীসেই সীমাবদ্ধ। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের আয়াত কিংবা সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত না হবে যে, একমাত্র তাঁর খাতিরেই সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আকীদা রাখার কোন সুযোগ নেই। অথচ জানা কথা যে, এটি কুরআন মাজীদের কোন আয়াত; কিংবা কোন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। এটিও উপরে বর্ণিত জাল রেওয়ায়াত অথবা এ ধরণের বাতিল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ

---

(١) وممن أنكر هذه الرواية حكيم الأمة التهانوي رحمه الله تعالى، إذ قال: « يه حديث كهيں نظر سے نهيں گزری، اور ظاهرا موضوع معلوم هوتی هے ». كذا في «إمداد الفتاوى» ٥:٧٩. وذلك استنكار منه لمتنه كما ترى.

ثم إن مولانا التهانوي لما رأى فيما بعد كلمة علي القاري التي سيأتي بيان بطلانها ووهائها، اعتمدها، كما يظهر من «إمداد الفتاوى» ٥:٧٩ أيضا . ولو علم بطلان ما بناه عليه القاري لما اعتمدها أبدا. فاعلم ذلك ولا تغتر.

করেছে; যাকে তারা আকীদা তথা মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয় বানিয়ে রেখেছে!![1]

–যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা, যাইলু তানযীহিশ শারীয়াতিল মারফূআ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া প্রসঙ্গ

কেউ কেউ এরূপ উক্তি করে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া ছিল না।

আবার কেউ কেউ এ কথাটিকে হাদীস দ্বারাও প্রমাণ করতে চেষ্টা করে; অথচ তাঁর ছায়া ছিল না বলে যে হাদীস পাওয়া যায়, তা জাল ও ভিত্তিহীন।

জাল হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

٧٠-أخرج الحكيم الترمذي من طريق عبد الرحمن بن قيس الزعفراني

---

(١) وأول من قال بصحة معناه- فيما أعلمه- هو الشيخ علي القاري غفر الله له، فتبعه من جاء بعده، حيث قال في كتاب «الموضوعات الكبير» ص١٠١: «لكن معناه صحيح، فقد روى الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أتاني جبريل، فقال: يا محمد، لولاك ما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت النار. وفي رواية ابن عساكر:لولاك ما خلقت الدنيا».

فأفتى بصحة معناه معتمدا على رواية الديلمي ورواية ابن عساكر، وكأن الأول صحيح البخاري، والثاني صحيح مسلم، حتى لم يحتج إلى البحث عن إسنادهما وعن حال رواتهما!! والواقع أن كلتا الروايتين موضوعتان كأختهما.

فرواية الديلمي نُقل آخرُ إسنادها في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ١:٤٥١، وفيه عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وقد اتهمه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣:٨٤ بخبر منكر، وقال: «حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به»، وأقره في «لسان الميزان» ٤:٢١-٢٢، واتهمه الذهبي أيضا في «الميزان» ٢:٦٢٠، بذلك الخبر وموضع بسطها «ذيل تنزيه الشريعة المرفوعة» للشيخ محمد عبد المالك، فقف عليها هناك.

....

وأما رواية ابن عساكر (في «تاريخ دمشق» ٣: ٥١٧) ففي إسنادها (أبو السكين) وإبراهيم بن اليسع، ويحى البصري، وهم ضعفاء متروكون، وقال الفلاس: «يحى كذاب يحدث بالموضوعات» راجع «ميزان الاعتدال» ٣: ٦٧٨، ٤: ٤١١، و«لسان الميزان» ٧: ٤٢٨.

وقد أوردها ابن الجوزي في «كتاب الموضوعات» ١:٢١٣-٢١٤ وغير ابن عساكر بنفي الإسناد المذكور، ثم قال: هذا حديث موضوع لا شك فيه». وأقره السيوطي في «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ١: ٢٧٢، وابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» ١: ٣٢٤-٣٢٥، فأورده في الفصل الأول من كتاب المناقب.

ويذكرون أيضا لدعم معنى الرواية المذكورة ما رواه الحاكم في «المستدرك» ٢:٦١٥، عن جندل بن والق، ثنا عمرو بن أوس الأنصاري، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: «يا عيسى آمن بمحمد، ومُرْ مَنْ أدركه مِنْ أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسكن».

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» قائلا: أظنه موضوعا على سعيد. وقال في «ميزان الاعتدال» ٣:٢٤٦: «عمرو بن أوس، يجهل حاله، أتى بخبر منكر، أخرجه الحاكم في مستدركه، وأظنه موضوعا، من طريق جندل بن والق، حدثنا عمرو ابن أوس ...». فذكر الحديث المذكور بعينه. وأقره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٤:٣٥٤.

ويذكرون أيضا حديثا آخر رواه الحاكم أيضا في «المستدرك» ٢:٦١٥، عن عبد الله بن مسلم الفهري، ثنا إسماعيل بن مسلمة، أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما اقترف آدم الخطيئة، قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم وكيف

....

عرفت محمدا، ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه، فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك».

قال الحاكم: صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب، وتعقبه الذهبي قائلا: «بل موضوع، وعبد الرحمن واه، رواه عنه عبد الله بن مسلم الفهري، ولاأدري من ذا؟».

ومن الغريب أن الحاكم قال في كتاب «المدخل إلى الصحيح» ١:١٥٤: ما نصه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه».

وقال في آخر باب الضعفاء من هذا الكتاب: «فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب قد ظهر عندي جرحهم، لأنني لا أستحل الجرح إلا مبينا، ولا أجيزه تقليدا، والذي أختار لطالب العلم أن لايكتب حديث هؤلاء أصلا».

والواقع أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس بمثابة ما ذكره عنه الحاكم في المدخل كما يتبين بالنظر الغائر، في كلام الأئمة فيه، ولا هو بمثابة أن يصحح له غرائبه، لا سيما الغرائب المنكرة: فلا سبيل إلى تصحيحها أبدا. وهذا -كما هو ظاهر- من غرائبه المنكرة، فمن وجوه النكارة فيه قصة مغفرة آدم، فالقرآن ينص أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخسرين». وأين هذا مما في الحديث المذكور؟!

ثم إن في الإسناد رجلا آخر مجهولا، وهو عبد الله بن مسلم الفهري أبو الحارث، قال الذهبي في «الميزان» ٢:٥٠٤: «روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب خبرا باطلا، فيه: يا آدم، لو لا محمد ما خلقتك».

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٣:٣٥٩-٣٦٠، بعد نقل كلام الذهبي: «لا

....

أستبعد أنه يكون هو الذي قبله، فإنه من طبقته».

والذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رشيد، قال الذهبي: «متهم بوضع الحديث، قال ابن حبان: حدثنا عنه جماعة، يضع على ليث، ومالك، وابن لهيعة، لايحل كتب حديثه».

فهذا حال إسناده، ومع ذلك فقد صححه التقي السبكي في شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، واستدل به على إباحة التوسل، وإباحة التوسل المشروع لا تتوقف على مثل هذه الرواية الغريبة المنكرة التي هي موضوعة أو شبه موضوعة.

ثم الخبر مع وهائه ونكارته مضطرب سندا ومتنا، كما يظهر بالرجوع إلى كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» للشيخ ابن تيمية (ص١٦٦-١٦٩)، وفي بعض الروايات لا يوجد لفظ: «ولو لامحمد ما خلقتك» وهو المستشهد به في المسألة المبحوث عنها.

فهذه أمثل الروايات التي تذكر بصدد دعم هذه العقيدة (لولاه لم تخرج الدنيا من العدم)، ولينصف القارئ الكريم، هل من الجائز أن ينسب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، شيء بمثل هذه الأسانيد وبمثل هذه الأخبار؟ وهل من الجائز أن تُثْبَتَ فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، بأمثال هذه الواهيات والمناكير؟ وهو سيد ولد آدم، آدم فمن دونه تحت لوائه، وهو الحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدميه، وهو خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، وهو أكرم الأولين والآخرين عند رب العالمين!!

كيف وإن هذه العقيدة: «لو لامحمد لم تخرج الدنيا من العدم» (فالغرض من خلق العالم هو تكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا إرادة خلقه لما خلق العالم) تنقضه ظواهر القرآن الكريم، فالقرآن الكريم ينص: «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون». (سورة الذاريات:٥٦). ويقول: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا». (سورة البقرة:٢٩).

ويقول أيضا: «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنه من لدنا إن كنا فعلين». (سورة الأنبياء: ١٦-١٧).

ويقول: «وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لعبين، ما خلقنهما إلا بالحق ولكن

عن عبد الملك بن عبد الله بن الوليد عن ذكوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى له ظل في شمس ولا قمر. ذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» ج ١ ص ١٢٢.

৭০-"যাকওয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য কিংবা চন্দ্রের আলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া দেখা

أكثرهم لا يعلمون».

ويقول في آية أخرى: «واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ....». (سورة البقرة: ٣٠-٣٣).

فهذه الآيات الكريمة ونحوها نص في أن الله تعالى خلق الإنس والجن ليعبدوه وليخلفوه في الأرض، فخلقهم للتكليف، وخلق ما في الأرض جميعا لأجل المكلفين ولنفعهم، فينتفعوا به ويشكروا خالقه، وخلق العالم كله ليدل على الخالق وأوصافه، فيتفكر المكلفون في خلقه، ويستدلوا به على وحدانيته تعالى وصمديته، وليتزودوا منه للآخرة، فإن الدنيا خلقت لهم وإنهم خلقوا للآخرة.

والعقيدة المذكورة بظاهرها تخالف هذه الحقائق الثابتة من نصوص القرآن الكريم، وباب التأويل غير السائغ لاينبغي أن يفتح، فإن فتحه يؤدي إلى تحريف النصوص وتحريف الحقائق. على أن بالتأويل تنتفي المزية التي يريدون إثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم معتمدا الذوقَ وتلك الأباطيلَ والمناكيرَ.

والفضيلة الثابتة هي ما تشير إليه آية الميثاق التي في سورة آل عمران، (الآية: ٨١) على ما فسر به علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال ابن عباس رضي الله عنه: «ما بعث الله نبيا قط إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره بأخذ الميثاق على أمته إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحيا ، ليؤمنن به ولينصرنه». انظر لتفسير هذه الآية «سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد » ١: ٩٠-٩٣، الباب السادس.

যেত না।”

এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণ জাল। কেননা, প্রথমত তার সূত্রে রয়েছে আব্দুর রহমান ইবনে কাইস যাফরানী, যার সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞদের কঠোর মন্তব্য রয়েছে।

বিজ্ঞ রিজাল শাস্ত্রবিদ আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এবং ইমাম আবূ যুরআ (রহঃ) তাকে মিথ্যুক বলে জানিয়েছেন।

আবূ আলী সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন ঃ

كان عبد الرحمن بن قيس الزعفراني يضع الحديث.

“আব্দুর রহমান ইবনে কাইস যাফরানী হাদীস জাল করত।”

এ ছাড়াও তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসায়ী (রহঃ) প্রমুখ প্রখ্যাত ইমামদের কঠোর উক্তি রয়েছে।

দ্রষ্টব্য ঃ তারীখে বাগদাদ ঃ ১০/২৫১-২৫২, মীযানুল ইতিদাল ঃ ২/৫৮৩, তাহযীবুত তাহযীব ঃ ৬/২৫৮

দ্বিতীয়ত, সাহাবীদের সামনে পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোদে বা চাঁদের আলোতে চলা-ফেরা, উঠা-বসার ঘটনাবলী জীবনে বহুবার ঘটেছে। যদি রোদে বা চাঁদের আলোতে তাঁর ছায়া না-ই হত, তবে বিপুল সংখ্যক সাহাবীর মাধ্যমে তা বর্ণিত হত। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার সবকিছু বর্ণনা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন; অথচ ছায়া না থাকার ব্যাপারে কোন সহীহ্ বর্ণনাই পাওয়া যায় না। একজন সাহাবী থেকেও নির্ভরযোগ্যসূত্রে তা বর্ণিত হয়নি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মিথ্যুকের পূর্বোক্ত বর্ণনাটি সম্পূর্ণ মনগড়া ও জাল।[১]

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার স্বপক্ষে

১–বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন ঃ ইমদাদুল মুফতীন ঃ ২/২৫৮-২৫৯

বহু সহীহ রেওয়ায়াত রয়েছে। পূর্বোক্ত বর্ণনাটি সেগুলোর সাথে সংঘর্ষপূর্ণ বলেও তা পরিত্যাজ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার ব্যাপারে সহীহ রেওয়ায়াতসমূহ ঃ

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة صلاة إذ مد يده ثم أخرها، فقلنا: يا رسول الله رأيناك صنعت في هذه الصلاة شيئا لم تكن تصنعه فيما قبله، قال: أجل إنه عرضت علي الجنة فرأيت فيها دالية قطوفها دانية، فأردت أن أتناول منها شيئا فأوحي إلي أن استأخر فاستأخرت، عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فيها ...الحديث. رواه الحاكم في «مستدركه»، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي في تلخيصه.

"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি সহসা সামনের দিকে হাত বাড়ান; এরপর তা পিছনের দিকে টেনে নেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই নামাযে আপনাকে এমন কাজ করতে দেখেছি, যা ইতোপূর্বে কখনো করেননি।

"তিনি ইরশাদ করেন, হ্যাঁ। আমার কাছে জান্নাত উপস্থিত করা হয়েছিল। তাতে বিশাল বৃক্ষরাজি দেখতে পাই। যেগুলোর ছড়া ঝুঁকানো ছিল। তা থেকে কিছু নিতে চাইলে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হল, আপনি পিছনে সরে দাঁড়ান। আমি পিছনে সরে দাঁড়ালাম। তারপর আমার নিকট জাহান্নাম উপস্থিত করা হল, যা আমার ও তোমাদের সামনেই ছিল। এমনকি তার আগুনের আলোতে আমার ও তোমাদের ছায়া পর্যন্ত আমি দেখেছি।"
–মুস্তাদরাকে হাকেম ঃ ৫/৬৪৮, হাদীস ৮৪৫৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। সাথে উম্মাহাতুল মুমিনীনের বেশ কয়েকজন ছিলেন। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন। এ অসন্তুষ্টি বেশ কিছু দিন স্থায়ী থাকে এবং তিনি যয়নব (রাঃ)-এর নিকট যাতায়াতই বন্ধ রাখেন ঃ

حتى يئست منه، فلما كان شهر ربيع الأول، دخل عليها، فرأت ظله، فقالت: إن هذا لظل رجل، وما يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤:٥٨٨، برقم ٧٦٩١، وقال: فيه سمية أخرج لها أبو داود و غيره ولم يضعفها أحد، وبقية رجاله ثقات.

"এমনকি হযরত যয়নব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। রবীউল আউয়ালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নিকট যান। ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যয়নব (রাঃ) **তাঁর ছায়া দেখতে পান** এবং বলেন, এতো কোন পুরুষের ছায়া বলে মনে হয়। তিনি তো আমার কাছে আসেন না। তা হলে এ ব্যক্তি কে ? ইত্যবসরে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবেশ করেন।" –মুসনাদে আহমাদ ঃ ৭/৪৭৪, হাদীস ২৬৩২৫

তা ছাড়া বহু হাদীসে পাওয়া যায় যে, সাহাবীগণ রোদের কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে তাঁকে ছায়া দান করেছেন। কখনো বা তিনি নিজেই ছায়ার আশ্রয় নিয়েছেন।

বুখারী শরীফে হিজরতের লম্বা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রাঃ) সহ কুবায় বনী আমর ইবনে আউফের নিকট অবস্থান নেন। তখন দিনটি ছিল রবীউল আউয়ালের সোমবার।

আবূ বকর (রাঃ) দাঁড়ানো ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বসা। তাই যারা তাঁকে চিনতেন না, তারা আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হল ঃ

حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে রোদ লাগলে আবু বকর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে **নিজ চাদর দ্বারা তাঁকে ছায়া দান করেন**। এতে লোকেরা তাঁকে চিনতে পায়।" –সহীহ বুখারী ঃ ১/৫৫৫, হাদীস ৩৯০৫

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ

غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاه، فنزل تحت شجرة واستظل بها.

"আমরা নজ্‌দের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। ময়দানে কাঁটাযুক্ত প্রচুর বৃক্ষ ছিল। দুপুরে বিশ্রামের সময় হলে **ছায়া গ্রহণের জন্যে তিনি বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নেন**।" –সহীহ বুখারী ঃ ২/৫৯৩, হাদীস ৪১৩৫

আবার কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া না থাকার বিষয়টি 'হাদীসে নূর' (... আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন...) দ্বারা প্রমাণ করতে চান।

তাদের বক্তব্য হল, 'তিনি যেহেতু নূরের তৈরী আর নূরের কোন ছায়া নেই; তাই তাঁরও কোন ছায়া নেই।'

এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণের জন্যে বেশী কিছু বলার দরকার নেই; কারণ এর ভিত্তিই যেহেতু 'নূরের হাদীস'-এর উপর, যা জাল হওয়ার বিষয়টি ২২০-২২৫পৃষ্ঠায় সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে, তাই এ কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

তা ছাড়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীলসমূহের আলোকে এ কথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে, তিনি একজন মানব ছিলেন; আর মানব মাত্রেরই ছায়া থাকে। অতএব তাঁর ছায়া ছিল না এটি একটি অর্থহীন কথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁর ছায়া থাকার বিষয়টি সুস্পষ্ট। আর ছায়া না থাকা সম্পর্কে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়, তা জাল হওয়ার কথা তো আগেই বলা হয়েছে এবং এর বিপরীতে যেসব সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে–সেগুলোও স্ববিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার কারণে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর মর্যাদা হ্রাস পাবে না। কেননা ছায়া থাকা না থাকার উপর কারো মর্যাদা নির্ভরশীল নয়।

নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহ

'নূর' শব্দের অর্থ এবং এর ব্যবহার

মূল আলোচনার শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি কথা বুঝতে হবে।

ক. 'নূর' একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ 'আলো'। এর বিপরীত শব্দ হল 'যুলমাহ' অর্থাৎ অন্ধকার। অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবীতেও নূর শব্দটি 'দৃশ্যমান নূর' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার রূপক অর্থে অদৃশ্য নূর বা আলো তথা জ্ঞান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তেমনিভাবে 'যুলমাহ' শব্দটিও দৃশ্য অন্ধকারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, আবার রূপক অর্থে অদৃশ্য অন্ধকার তথা মূর্খতা, জুলুম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়।

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফেও এ নূর শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ

وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ.

"তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি কোথাও আগুন জ্বালাল এবং তার চার দিককার সব কিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুলল, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ তার চারদিকের নূর (তথা আলোকে) উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।" –সূরা বাকারা ঃ ১৭

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ، مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ، يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

"তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল তেজোস্কর, আর চন্দ্রকে কিরণময় এবং নির্ধারিত করেছেন তার জন্যে মনযিলসমূহ, যাতে তোমরা বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এই সমস্তকিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি; যথার্থই সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্ঞানসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেন।" –সূরা ইউনুস ঃ ৫

উভয় আয়াতে 'নূর' শব্দটি দৃশ্য নূরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে এ শব্দটি বহু আয়াতে অদৃশ্য নূর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ.

"আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরী করে তাদের অভিভাবক হল তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।" –সূরা বাকারা ঃ ২৫৭

উক্ত আয়াতে নূর ও যুলমাহ তথা আলো ও অন্ধকার উভয় শব্দ অদৃশ্য

আলো ও অন্ধকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এখানে আলো বলতে ঈমানের আলো এবং অন্ধকার বলতে কুফুরীর অন্ধকার বুঝানো হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

"অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" –সূরা তাগাবুন ঃ ৮

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"সুতরাং যেসব লোক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই সফলকাম।" –সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭

উভয় আয়াতে নূর বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে, যা অদৃশ্য নূর। এমনিভাবে হাদীস শরীফে দৃষ্টিপাত করলেও নূর শব্দের উভয় অর্থে ব্যবহার পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، خلق آدم مما وصف لكم.

"ফেরেশতা নূরের সৃষ্টি, জিন অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি। আর আদম যা দ্বারা সৃষ্টি, তা তোমাদেরকে (কুরআন মাজীদে) বলা হয়েছে অর্থাৎ মাটির তৈরী।" –সহীহ মুসলিম ঃ ২/৪১৩, হাদীস ২৯৯৬

এ হাদীসে 'নূর' শব্দটি দৃশ্য নূর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুসনাদে আহমদ–এ হযরত ইর্‌বাস ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إن أم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»٨/٤٠٩: رواه أحمد، (رقم ١٦٧٠١) ورجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن سويد، وقد وثقه ابن حبان.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাতা তাঁকে প্রসবকালে এক নূর অবলোকন করেন, যার দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে যায়।" –মুসনাদে আহমদ ঃ ৪/১২৭ হাদীস নং ১৬৭০১

এ হাদীসেও নূর বলতে বাহ্যিক বা দৃশ্য নূরকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে বহু হাদীসে অদৃশ্য নূরের ক্ষেত্রেও নূর শব্দের প্রয়োগ এসেছে।

সহীহ মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে ঃ

كتاب الله، فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل.

"এটি আল্লাহ তাআলার কিতাব। এতে রয়েছে হেদায়াত ও নূর। যে ব্যক্তি তা আঁকড়ে ধরবে এবং সে মোতাবেক আমল করবে, সে হেদায়াতের উপর থাকবে। আর যে ব্যক্তি তা পেল না, সে পথভ্রষ্ট হল।" –সহীহ মুসলিম ঃ ২/২৮০ হাদীস নং ২৪০৮

উক্ত হাদীসে হেদায়াত এবং ইল্‌মকে নূর বলা হয়েছে, যা স্পষ্টত দৃশ্য নূর নয়; বরং অদৃশ্য নূর। এমনিভাবে জামে তিরমিযী ও সহীহ ইবনে হিববান-এ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শোনেছি ঃ

إن الله خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور، اهتدى، ومن أخطأ ضل.

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলূককে (প্রবৃত্তি ইত্যাদির) আঁধারে সৃষ্টি করলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপর (ঈমান ও মারেফতের) নূর

ছড়িয়ে দেন। যে ব্যক্তি সে নূর লাভ করেছে, সে হেদায়াত পেয়েছে, আর যে ব্যক্তি তা পায়নি সে গোমরাহ হয়েছে।" –জামে তিরমিযী ঃ ২/৯৩, হাদীস ২৬৪২, সহীহ ইবনে হিব্বান ঃ ১৪/৪৩-৪৪, হাদীস ৬১৬৯

উক্ত হাদীসে সত্যকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা এবং তা কবূল করার তাওফীককে নূর বলা হয়েছে, যা স্পষ্টত অদৃশ্য নূর।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিম্নোক্ত দুআটি বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি তাহাজ্জুদের সময় করতেন ঃ

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل في نفسي نورا، واجعلني نورا.

"হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার জিহ্বায় নূর দান করুন। আমার কানে নূর দান করুন। আমার চোখে নূর দান করুন। আমার ডানে নূর দান করুন। আমার বামে নূর দান করুন। আমার সামনে নূর দান করুন। আমার পিছনে নূর দান করুন। আমার উপরে নূর দান করুন। আমার নীচে নূর দান করুন। আমার ভিতরে নূর দান করুন এবং আমাকেই নূর বানিয়ে দিন।" –সহীহ বুখারী ঃ ২/৯৩৫, হাদীস ৬৩১৬, সহীহ মুসলিম ঃ ১/৬১, হাদীস ৭৬৩/১৮৭

বলাবাহুল্য, উক্ত দুআয় উল্লিখিত প্রতিটি নূর শব্দ দ্বারা অদৃশ্য নূরকেই বুঝানো হয়েছে। সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার কাযী ইয়ায (রাহঃ) এ সম্পর্কে লেখেন ঃ

معنى النور هنا: بيان الحق والهداية إليه، ودعا أن تستعمل جميع أعضائه وتصرفاته وتقلباته وجميع حالاته وجملته في الجهات الست، في الحق، وضياء الهدى حتى لا يزيغ شيء منها عنه ولايطغى.

"নূর বলতে এখানে সত্যের প্রকাশ এবং এর প্রতি হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন করাকে বুঝানো হয়েছে, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ করছেন যে, তাঁর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সকল কাজ-কর্ম, সমস্ত চাল-চলন সর্বদিকে, সর্বাবস্থায় সত্য ও হেদায়াতের নূরে পরিচালিত হয়।" –ইকমালুল মুলিম ঃ ৩/১২৫-১২৬

এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এ দু'আর পূর্বেও তাঁর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কাজ-কর্ম ও চাল-চলন সত্য ও হেদায়াতের নূরে পরিচালিত হত; কিন্তু যে আল্লাহ তাআলার অধিক নৈকট্যশীল হয়, যার মাঝে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর ইল্‌ম যত বেশী হয়, তার মাঝে আল্লাহ তা'আলার ভয়, তাঁর মহানুভবতার অনুভূতি ও তাঁর মহব্বত তত বেশী থাকে। আর এ জন্যেই সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'হাত তুলে দুআয় মগ্ন হয়।

মোটকথা, নূর শব্দটি আরবী ভাষায় এবং কুরআন হাদীসের পরিভাষায় 'দৃশ্য নূর' এবং 'অদৃশ্য নূর' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কোথায় কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা শব্দের প্রয়োগ এবং পূর্বাপর প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

যে স্থানে নূর শব্দ দ্বারা অদৃশ্য নূর বুঝানো উদ্দেশ্য, সেখানে বাহ্যিক বা দৃশ্য নূরের ব্যাখ্যা প্রদান করা অথবা যেখানে বাহ্যিক নূর বুঝানো উদ্দেশ্য সেখানে অদৃশ্য নূরের ব্যাখ্যা প্রদান করা একটি হাস্যকর ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ তাহ্‌রীফ তথা অর্থগত বিকৃতিসাধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন কারো নিকট আলোকসজ্জার অনেক উপকরণ আছে এবং তা দ্বারা সে তার ঘরে আলোকসজ্জা করেছে। তার আলোকসজ্জার প্রশংসা করতে গিয়ে কেউ বলল, عنده نور كثير (তার বাড়ীতে প্রচুর আলো) আর আপনি তার অনুবাদ করলেন, তিনি খুব হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তাঁর নিকট ইলমের অনেক নূর রয়েছে। তা হলে এটা তার কথার অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কী হবে?

অথবা কেউ কুরআন হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে, কুরআনকে নূর বলা হয়েছে, তাই সে একজনকে সম্বোধন করে বলতে লাগল; "আরে ভাই! ঘরে বাতি রাখার কি দরকার, একটি কুরআন মাজীদ ঘরে রেখে দাও। পুরো ঘর আলোকিত হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনকে নূর বলেছেন।" তা হলে এটা তার বোকামি ছাড়া আর কিইবা হবে?

কোন্ নূর ফযীলতের মাপকাঠি

খ. বাহ্যিক নূর যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের একটি বড় নেয়ামত। তেমনি বাহ্যিক অন্ধকারও একটি বড় নেয়ামত। মাখলূকের যেমন নূরের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনিভাবে অন্ধকারেরও প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু তার চেয়ে বহু গুণ বেশী দরকার অদৃশ্য নূর বা অভ্যন্তরীণ আলোর। যথাঃ হেদায়াত, ঈমান, ইলম, হেকমত, সৎগুণ এবং সকল ভাল কাজের তাওফীক ইত্যাদি। অদৃশ্য নূর সম্পূর্ণই আল্লাহ তাআলার করুণা ও নেয়ামত, যা কল্যাণই কল্যাণ; তাতে অমঙ্গলের লেশমাত্রও নেই। এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই কাম্য। তাতে কোন প্রকার কমতি কাম্য নয়।

পক্ষান্তরে অদৃশ্য অন্ধকার যথা ঃ ভ্রষ্টতা, কুফর ও শিরক, বিদআত ইত্যাদি প্রত্যেক খারাপ গুণ ও খারাপ কাজ–সম্পূর্ণই অভিশাপ, এতে কল্যাণ ও মঙ্গলের নাম নিশানাও নেই।

বলাবাহুল্য, শুধু বাহ্যিক নূর অর্জন করা কৃতিত্বের কিছু নয় এবং শুধু তা কোন ফযীলতের বস্তুও নয়। কৃতিত্ব ও ফযীলতের বিষয় তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা, যা শুধুমাত্র অদৃশ্য নূর অর্জনের মাধ্যমেই হতে পারে। যার মধ্যে এ প্রকার নূর যত বেশী থাকবে সে আল্লাহ তাআলার ততবেশী প্রিয়পাত্র হবে।

সাধারণ একজন মুমিন ব্যক্তি, যার অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত, যদিও তার চেহারা অসুন্দর; কিংবা রাতে জ্বালানোর মতো একটি মোমও তার নেই; তথাপি সে একজন সুদর্শন, আলোঝলমল প্রাসাদের মালিক কাফের

থেকে কোটি কোটি গুণে উত্তম, যে কাফের নূরে ঈমান থেকে চির বঞ্চিত; যার অন্তঃকরণ কুফ্‌রীর কালিমায় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। বাহ্যিক নূরের সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি তাঁরা অদৃশ্য নূরেও নূরাণী ছিলেন। আর এ দিকে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)কে তৈরী করেছেন মাটি থেকে। ফলে তাঁর সৃষ্টিতে বাহ্যিক নূরের উপস্থিতি নেই। তবে আল্লাহ তাআলা তাকে অদৃশ্য নূর তথা ইলম, বিদ্যা-বুদ্ধি, মারেফত ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক দান করেছেন। আবার খোদ ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে সিজদা করিয়েছেন, যা কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশার হয়েও নূর

গ. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কতক জাহেল সাধারণত এরূপ প্রশ্ন করে থাকে যে, আমাদের নবী নূর ছিলেন, না মানব ছিলেন ? অথচ এরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, নূরের বিপরীত শব্দ হল অন্ধকার। মানবের বিপরীত শব্দ হল ফেরেশতা বা জিন। তাই এভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তিনি মানুষ ছিলেন, না ফেরেশতা ছিলেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর অতি স্পষ্ট যে, তিনি অন্যান্য নবী-রাসূলের ন্যায় মানুষ ছিলেন। ফেরেশতা কিংবা অন্য কোন প্রকার মাখলূক ছিলেন না। এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত। তা ছাড়া কুরআন মাজীদের বহু আয়াতেও তা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى إِلَّا اَنْ قَالُوْا اَ بَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ

مَلٰئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاۤءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا.

"বলুন, পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, আমি একজন 'মানব রাসূল' বৈ কে? লোকদের নিকট হেদায়াত আসার পর তাদেরকে এই উক্তি ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে যে, 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?' বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বিচরণ করত, তবে আমি তাদের নিকট আকাশ থেকে 'ফেরেশতা রাসূল' প্রেরণ করতাম।" –সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৩-৯৫

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاۤءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا.

"বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন 'মানুষ'। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" –সূরা কাহ্ফ ঃ ১১০

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ.

"বলুন, আমিও তোমাদের মতই 'মানুষ'; আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ একমাত্র মাবূদ। অতএব তাঁরই প্রতি একাগ্র হয়ে যাও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরেকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।" –সূরা হা-মীম সাজদা ঃ ৬

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ.

"আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?" –সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানব ছিলেন এর বহু প্রমাণ হাদীসেও পাওয়া যায়।

নিম্নে দু'একটি হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ

عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দরজার কাছে ঝগড়া বিবাদ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট এসে বললেন, আমি তো একজন 'মানুষমাত্র'। আমার কাছে বাদী-বিবাদীরা এসে থাকে। কেউ হয়ত অধিক বাকপটু হয়, ফলে আমি তাকে সত্য মনে করে তার পক্ষে রায় দিয়ে দেই। যদি আমি কারো পক্ষে অন্য কোন মুসলমানের হকের ব্যাপারে ফয়সালা দিয়ে থাকি, তা হলে তা জাহান্নামের টুকরো হিসেবে বিবেচিত হবে। সে তা গ্রহণও করতে পারে অথবা বর্জনও করতে পারে।" –সহীহ বুখারী ঃ ১/৩৩২, হাদীস ২৪৮৫, সহীহ মুসলিম ঃ ২/৭৪ হাদীস ১৭১৩

অন্য হাদীসে আছে ঃ

قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني.

"হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে সালাম ফিরালে তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের ব্যাপারে কি নতুন কিছু এসেছে? তিনি বললেন, কি ব্যাপার? সাহাবীগণ বললেন, আপনি এত রাকাআত পড়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' পা মুড়িয়ে নিলেন, কিবলামুখী হলেন। দু'টি সিজদা করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে ইরশাদ করেন, নামাযের মাঝে কিছু (অবতীর্ণ) হলে আমি তোমাদেরকে সে ব্যাপারে অবহিত করতাম; কিন্তু আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। তাই আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো।" –সহীহ বুখারী ঃ ১/৫৮, হাদীস ৪০১

অন্য হাদীসে আছে ঃ

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته، أن يكون ذلك له زكاة وأجرا.

"হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি তো একজন মানুষমাত্র। আমি আপন প্রতিপালকের নিকট বলে রেখেছি যে, আমি যদি কোন মুসলমানকে মন্দ বলি, তা হলে সেটি যেন তার জন্যে পবিত্রতা ও সাওয়াবের কারণ হয়।" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/৩২৩, হাদীস ২৬০২

এ ছাড়াও আরো বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব হওয়ার দিকটি প্রমাণ করে।

যাহোক, এ প্রশ্ন করা তো যুক্তিসঙ্গত যে, তিনি মানব ছিলেন, না ফেরেশতা ছিলেন, না অন্য কোন প্রকারের মাখলূক? এর জবাব অতি সহজ যে, তিনি মানব ছিলেন। মানবকুলের সর্দার। সর্বোত্তম মানব।

আর কোন নির্বোধ বদদ্বীন এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে যে, তোমাদের

নবী কি নূর ছিলেন, না যুলমাহ্ তথা অন্ধকার ? যদি এরূপ অসার প্রশ্ন উঠে, তা হলে এর উত্তর হবে যে, তিনি সম্পূর্ণই নূর ছিলেন। অন্ধকারের লেশ মাত্রও তাঁর মধ্যে ছিল না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য এত অধিক দান করেছেন, যার সামনে বাহ্যিক নূরও তুচ্ছ।

আর অদৃশ্য নূর যথা ঃ নবুওয়তের নূর, রিসালাতের নূর, ইলম ও মারেফাতের নূর, ঈমান ও খোদাভীতির নূর, আল্লাহর মহব্বতের নূর, হেদায়াতের নূর ইত্যাদি, মোটকথা আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সকল প্রকার অদৃশ্য নূর প্রত্যেক মাখলূক থেকেই অধিক দান করেছেন।

তিনি এ প্রকার নূরে নূরান্বিত সকল সৃষ্টির সরদার। সকল সৃষ্টির মাঝে তিনি অতুলনীয়। দুনিয়াতে যেখানে যারই যতসামান্য অদৃশ্য নূর রয়েছে, তা একমাত্র তাঁর নূরেরই ঝলক। আর বাহ্যিক নূরেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। হাদীস শরীফে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذ مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল, তাঁর ঘাম ছিল মুক্তার ন্যায়। তিনি সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাঁটতেন। তাঁর হাতের চেয়ে অধিক কোমল কোন রেশম আমি স্পর্শ করিনি। তাঁর সুঘ্রাণের চেয়ে অধিক সুগন্ধি কোন মেশ্ক-আম্বরেও আমি পাইনি।" –সহীহ্ মুসলিম ঃ ২/২৫৭, হাদীস ২৩৩০, মুসনাদে আহমাদ ঃ ৩/২২৮, হাদীস ১৩৪৩৯

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن كعب بن مالك قال: لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سر

استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه.

"কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করতাম তখন তাঁর চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করত। তিনি যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে যেত; যেন এক খণ্ড চাঁদ; আমরা তা অনুভব করতে পারতাম।" –সহীহ্ মুসলিম ঃ ২/৩৬২, হাদীস ২৭৬৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما انحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

"হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গঠন লম্বা ছিল না, আবার বেঁটেও ছিল না; বরং মধ্যাকৃতি ছিল। তাঁর উভয় হাত ও পা গোশ্তে পূর্ণ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথাও ছিল বড়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জোড়ার হাড্ডিও ছিল বড়। বক্ষ থেকে নাভী পর্যন্ত ছিল সরু পশমরেখা। তিনি চলার সময় এমনভাবে চলতেন যেন কোন উঁচু স্থান থেকে অবতরণ করছেন।

হযরত আলী (রাঃ) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে এবং পরে তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি।" –জামে তিরমিযী ঃ ২/২০৫, হাদীস ৩৬৩৭

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليلة إضحيان، عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر

إليه وإلى القمر قال: فلهو كان أحسن في عيني من القمر. رواه الترمذي والدارمي، وإسناده حسن لغيره.

"জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি চাঁদনী রাতে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একপ্রস্থ রেখাখচিত লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলাম। একবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার চাঁদের দিকে। অবশেষে তিনি আমার দৃষ্টিতে চাঁদের চেয়েও সুন্দর প্রতিভাত হলেন।" –শামায়েলে তিরমিযী ঃ ২, সুনানে দারেমী ঃ ১/৪৪৬, হাদীস ৬০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারক কিসের তৈরী?

ঘ. এ পর্যায়ে কেউ কেউ এরূপ প্রশ্নও করে থাকে যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর কি নূরের তৈরী, নাকি মাটির তৈরী? যদি তাদেরকে উত্তরে বলা হয় যে, নূরের তৈরী, তা হলে তারা ভীষণ খুশি হয় এবং মনে করে যে, এরূপ আকীদা-বিশ্বাস রাখলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযোগ্য সম্মান করা হয়।

আর যদি উত্তরে বলা হয় যে, কুরআন-হাদীস এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তিনি মানব ছিলেন। আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর মানব সৃষ্টির সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এসেছে যে, সৃষ্টিকর্তা আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর বংশধরের (যার মধ্যে নবী ওলীগণও রয়েছেন) প্রত্যেককেই একফোটা পানি থেকে পয়দা করেছেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিও অনুরূপভাবে হয়েছে। এটি একটি প্রত্যক্ষণজাত ও ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বাস্তবতা। তা ছাড়া খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিষয়টির স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

এ ধরনের উত্তর শোনলে তারা অসন্তুষ্ট হয় এবং মনে করে যে, এতে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেয় করা হয়েছে; অথচ মানব হওয়া বা মাটির তৈরী হওয়ায় দোষের কিছু নেই। আবার শুধুমাত্র নূর কিংবা নার তথা আগুনের সৃষ্টি হওয়াতেও শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নেই। যদি শুধুমাত্র নূর থেকে হলেই শ্রেষ্ঠ হয়ে যেত, তা হলে প্রত্যেক ফেরেশতাই সকল নবী-রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হত। তেমনিভাবে যদি আগুনের তৈরী হওয়াই মর্যাদার কিছু হত, আর মাটির তৈরী হওয়াই অপূর্ণতার কিছু হত, তা হলে (নাউযুবিল্লাহ) চির অভিশপ্ত ইবলীসের এ আপত্তিও যথার্থ হতঃ

قَالَ لَمْ اَكُنْ لاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَسْنُوْن.

“বলল, আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সিজদা করব, যাকে আপনি পঁচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।” –সূরা হিজর ঃ ৩৩

যদি মাটির তৈরী হওয়াতে কোন প্রকার দোষ থাকত, তা হলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করতেন না ঃ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ “নিশ্চই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।” –সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০

মূলতঃ মর্যাদা এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য বাহ্যিক নূরের সাথে নয়; বরং অভ্যন্তরীণ নূরের সাথে সম্পৃক্ত। তাই অভ্যন্তরীণ নূর যদি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহলে মাটির তৈরি হওয়াতে দোষের কিছু নেই; বরং এতে মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়।

যাহোক, এরা শুধু মূর্খতা কিংবা শত্রুতার কারণে উক্ত জবাবে নাক ছিটকায়; অথচ তা আল্লাহ তাআলা (যিনি রাসূলের সৃষ্টিকর্তা-এর বাণী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খোদ যার সম্পর্কে প্রশ্ন)-এর ভাষ্য দ্বারাই সমর্থিত। আর নিজেদের উত্তর (রাসূলের শরীর নূরের তৈরী) নিয়েই খুব খুশি; অথচ তা সম্পূর্ণ জাহেলী, অন্ধ বিশ্বাসের ফল, যা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও দলীল পরিপন্থী এবং যে ব্যাপারে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট নন। কেননা তিনি বাস্তববিরোধী ও মিথ্যা কথায় কখনো খুশি হতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানব অথবা আদম সন্তান–এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের কতিপয় আয়াতও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া তাঁর মানব হওয়ার বিষয়টি এতই স্পষ্ট একটি বিষয় যে, মক্কার কাফেররা পর্যন্ত তা অস্বীকার করত না; বরং মূর্খতার কারণে তাদের উল্টা আপত্তি এই ছিল যে, মানুষ হয়ে তিনি কিভাবে রাসূল হন!?

এ সম্পর্কে সূরা বনী ইসরাঈলের দু'টি আয়াত একটু আগেই উদ্ধৃত হয়েছে; পুনরায় তা উল্লেখ করা হল ঃ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَآئَهُمُ الْهُدٰى اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَ بَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً.

"বলুন, পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, আমি একজন 'মানব রাসূল' বৈ কে? লোকদের নিকট হেদায়াত আসার পর তাদেরকে এই উক্তি ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?' বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বিচরণ করত, তবে আমি তাদের নিকট আকাশ থেকে 'ফেরেশতা রাসূল' প্রেরণ করতাম।" –সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৩-৯৫

সূরা ইবরাহীম –এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا، تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ، قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ، وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ.

"তারা বলত, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। তোমরা আমাদেরকে ঐ মা'বূদ থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত; তাহলে তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ কর।

"তাদের পয়গাম্বর তাদেরকে বলেন, আমরাও তোমাদের মতই মানুষ; কিন্তু আল্লাহ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর

নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়।" –সূরা ইবরাহীম ঃ ১০-১১

তেমনিভাবে সূরা আনআম-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. وَلَوْاَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنْظَرُوْنَ، وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

"তারা আরো বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না ? যদি আমি কোন ফেরেশ্তা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটি খতম হয়ে যেত। এরপর তাদেরকে সামান্য অবকাশও দেওয়া হত না। যদি আমি কোন ফেরেশ্তাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের রূপেই হত। এতেও সে সন্দেহই করত, যা এখন করছে। নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। এরপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে সে শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।" –সূরা আনআম ঃ ৮-১০

যাহোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব, সর্বোত্তম মানব এবং মানবকুলের সরদার হওয়ার বিষয়টি চির বাস্তব এবং স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এখন দেখা যাক, মানব সৃষ্টি সম্পর্কে খোদ সৃষ্টিকর্তার কী বাণী।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ.

"যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব।" –সূরা ছোয়াদ ঃ ৭১

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ.

"আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, আমি পচাঁ

কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি একটি মানব জাতির পত্তন করব।" –সূরা হিজর ঃ ২৮

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ.

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।" –সূরা আর রাহমান ঃ ১৪-১৫

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

"তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, এরপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, এরপর জমাট রক্ত দ্বারা, এরপর তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, এরপর তোমরা যৌবনে পদার্পন কর, তারপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারো কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে; আবার তোমরা (কেউ কেউ) নির্ধারিত কালে পৌঁছে থাক এবং (এরূপ অবস্থা থেকে) তোমরা যাতে অনুধাবন করতে পার।" –সূরা মুমিন ঃ ৬৭

সূরা মুমিনূন-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا، ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ، ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ، ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ.

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি; এরপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সে মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। এরপর

অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" –সূরা মুমিনূন ঃ ১২-১৬

এই হল মানব সৃষ্টি সম্পর্কে খোদ মানব সৃষ্টিকর্তার বাণীসমূহ। এখন দেখা যাক, মানবকুল শিরোমণি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী ধরনের ফরমান রয়েছে আপন সৃষ্টি সম্পর্কে।

হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে ঃ

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। এরপর কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে মনোনীত করেছেন এবং কুরাইশের বংশধর থেকে বনী হাশিমকে মনোনীত করেছেন; আর বনী হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।"–সহীহ মুসলিম ঃ ২/২৪৫, হাদীস ২২৭৬, জামে তিরমিযী ঃ ২/২০১, হাদীস ৩৬০৫

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন ঃ

قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله، عليك السلام، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا، وخيركم نفسا. قال الترمذي: حديث حسن.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার কোন কারণে) মিম্বরে দাঁড়িয়ে (সমবেত লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে ?

সাহাবীগণ বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল; আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (যেহেতু প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বংশ কী তা জানানো, যা উপস্থিতগণ খেয়াল করেননি; এ জন্যে) তিনি ইরশাদ করেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে–মুহাম্মাদ। আল্লাহ্ তাআলা তামাম মাখলূক সৃষ্টি করে আমাকে সর্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (অর্থাৎ মানুষ বানিয়েছেন)। এরপর তাদেরকে দু'ভাগে (আরব ও অনারব) বিভক্ত করত আমাকে উত্তম ভাগে (আরবে) রেখেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্রে পাঠিয়েছেন। এরপর সে গোত্রকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম পরিবারে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি ব্যক্তি ও বংশ সর্বদিক থেকে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"

–মুসনাদে আহমাদ ঃ ১/২২০, হাদীস ১৭৯১, জামে তিরমিযী ঃ ২/২০১, হাদীস ৩৬০৮, দালায়েলুন নবুওয়্যাহ, ইমাম বাইহাকী ঃ ১/১৬৯-১৭০

আবূ জাফর বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إنما خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم، ولم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء، لم أخرج إلا من طهره[১]

"আমার জন্ম বিবাহের মাধ্যমে হয়েছে, কোন নাজায়েয পন্থায় নয়। আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে নিয়ে (আমার পিতামাতা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে আমার বংশ পরম্পরা বিবাহের মাধ্যমে চলে আসছে) জাহেলিয়াতের কোন নাজায়েয পদ্ধতি আমাকে স্পর্শ করেনি। আমার জন্ম একমাত্র পবিত্র তরীকায় হয়েছে।" –তবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ ১/২৬

---

(١)رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى». عن أبي جعفر الباقر مرسلا، وإسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أبي جعفر الباقر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ج٢ ص٢٠٩: هذا مرسل جيد».

যাহোক, যখন এ কথা জানা গেল যে, কুরআনের ভাষ্য এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন (সর্বোত্তম মানব, আদম সন্তানের সরদার) এবং তাঁর জন্মও হাদীস ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ মতে বিবাহের মাধ্যমে হয়েছিল।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারক নূরের তৈরী ছিল–একথা বলা অথবা এরূপ আকীদা পোষণ করা, তাঁর ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন

৬. এখানে এ কথাও জেনে রাখা জরুরী যে, ইতোপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে–যথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন, আদম সন্তান ছিলেন এবং তাঁর জন্ম অন্যান্য বনী আদমের ন্যায় বিবাহের মাধ্যমে হয়েছে–এ বিষয়গুলো কুরআন, হাদীস, ইজমা ও তাওয়াতুর এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত। অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই।

সাথে সাথে এ কথাও স্মরণ রাখা অপরিহার্য যে, যদি এ বিষয়গুলোকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত, রিসালাত অথবা সুপ্রমাণিত কোন ফযীলত অস্বীকারের জন্যে কিংবা উপহাস ছলে বলা হয়, তা হলে তা সম্পূর্ণ কুফুরী হবে এবং এরূপ ব্যক্তি কাফের সাব্যস্ত হবে।

কাফের ও মুশরেকের আচরণ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে এরূপই ছিল যে, ওরা তাঁদেরকে সর্বদিক দিয়ে নিজেদের ন্যায় মানব মনে করত। তাদের কোন ধরনের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করত না এবং উপহাস করে তাঁদেরকে মানব বলত।

এই জন্যে কুরআন মাজীদ নবী-রাসূলের মানব হওয়ার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি স্থানে সাধারণ মানুষ থেকে তাঁদের বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছে।

সুতরাং, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য যে কোন নবীকে মানব বলে তাঁদের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবে

অথবা মানব বলে তাঁদেরকে উপহাস বা অবজ্ঞা করবে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের সাব্যস্ত হবে।

মুসলমানরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব হওয়ার দিকটি আলোচনা করে, তখন সাথে সাথে সাধারণ মানুষ থেকে তাঁর বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করে থাকে। আর তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি আল্লাহ তাআলার একজন রাসূল।

তাদের এ ধরনের আলোচনার উদ্দেশ্য হয়ত বাস্তবতার ব্যাখ্যা প্রদান করা অথবা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অপনোদন করা। যেমন কেউ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করছে, তখন অপর ব্যক্তি কুরআন হাদীসের বরাতে বলল যে, তিনি মানব ছিলেন; এ সব প্রভূবৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না। অথবা যদি কেউ বোকামির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেরেশ্‌তা কিংবা অন্য কোন সৃষ্টিজীব জ্ঞান করত কুরআন হাদীসের বিরোধিতা করে, তখন সে কুরআন-হাদীস থেকে বাস্তবতার ব্যাখ্যা প্রদান করে। অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব হওয়ার বিষয়টিকে সে প্রশংসাস্বরূপ উল্লেখ করে যে, তিনি মানব হয়েও এতসব ফযীলত, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি নবী-রাসূলদের সরদার এবং ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অতুলনীয় নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। অন্যদের থেকে পৃথক থাকতেন না; বরং সাধারণ মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ আম্‌রাহ (রহঃ)-এর রেওয়ায়াতটি লক্ষ্য করা যাক ঃ

عن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.

"তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত বাড়ীতে কী কাজ

করতেন? আম্মাজী আয়েশা (রাঃ) জবাবে বলেন, তিনি তো একজন মানুষই ছিলেন। (মানুষ সাধারণত বাড়ীতে যা করে তিনি তা-ই করতেন) কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরী দোহাতেন এবং নিজের কাজ করতেন।" –শামায়েলে তিরমিযী ঃ ২৩, মুসনাদে আহমাদ ঃ ৭/৩৬৫, হাদীস ২৫৬৬২

শামায়েলে তিরমিযীতে খারেজা ইবনে যায়েদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

دخل نفر على زيد بن ثابت، فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

"যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর নিকট এক দল লোক এসে বলল, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও ঘটনা শোনান। তিনি উত্তরে বলেন, আমি তোমাদেরকে কী শোনাব ? (এরপর তিনি বলেন) আমি তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম। যখনই তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হত, তখনই আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি তা লিখে দিতাম।

"আমরা যদি দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তিনিও দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সাথে শরীক হতেন এবং খাবারের কথা আলোচনা করলে তিনিও আমাদের সাথে এর আলোচনা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সবকিছুই কি তোমাদের নিকট বর্ণনা করব ?" –শামায়েলে তিরমিযী ঃ ২৩

ভূমিকাস্বরূপ আলোচিত এ পাঁচটি বিষয় পুনরায় মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করুন। এরপর নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কে লোকমুখে প্রসিদ্ধ নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতগুলো সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য শোনুন।

সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদী

٧١-أول ما خلق الله نوري

৭১–"আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"

٧٢-عن جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شيء خلقه الله، قال: هو نور نبيك يا جابر.

৭২–"জাবের (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাইলে তিনি ইরশাদ করেন, হে জাবের! তা হল তোমার নবীর নূর।"

٧٣-أنا من نور الله، وكل شيء من نوري.

৭৩–"আমি আল্লাহ তাআলার নূরের (সৃষ্টি) আর আমার নূর থেকে সব কিছু (সৃষ্টি)।"

٧٤-أنا من نور الله والمؤمنون مني

৭৪–"আমি আল্লাহ তাআলার নূরের (সৃষ্টি) আর মুমিনরা আমার নূরের (সৃষ্টি)।"

٧٥-أنا من الله والمؤمنون مني

৭৫–"আমি আল্লাহ তাআলার (নূর) থেকে আর মুমিনরা আমার (নূর) থেকে।"

উল্লিখিত বাক্যসমূহের মধ্য থেকে যদিও প্রথম বাক্যটি লোকমুখে অধিক প্রসিদ্ধ; কিন্তু মূলত সবগুলোই একটি দীর্ঘ জাল রেওয়ায়াতের বিভিন্ন রূপ। সে লম্বা রেওয়ায়াতটি আলোচনার শেষাংশে আরবীতে লিখা হয়েছে। উলামায়ে কেরাম তা দেখামাত্রই বুঝতে পারবেন যে, পূর্ণ রেওয়ায়াতটিই জাল ও বাতিল।

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহঃ) উক্ত রেওয়ায়াতটি জাল প্রমাণে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যা 'মুরশিদুল হায়ের লি-বয়ানে ওয়ায্‌য়ে হাদীসে জাবের' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

এমনিভাবে শাইখ আহমাদ ইবনে আব্দুল কাদের শান্‌কীতীও এ সম্পর্কে "তাম্বীহুল হুযযাক আলা বুতলানে মা-শাআ বাইনাল আনামে ফী হাদীসিন্নুরিল মানসূবী লি-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এটিও প্রকাশিত হয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস আহমাদ আল-গুমারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

هو حديث موضوع، لو ذكر بتمامه لما شك الواقف عليه في وضعه، وبقيته تقع في نحو ورقتين من القطع الكبير، مشتملة على ألفاظ ركيكة ومعاني منكرة.

"এ রেওয়ায়াতটি জাল। যদি পূর্ণ রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করা হয়, তা হলে সেটি জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন পাঠকেরই সন্দেহ থাকবে না। রেওয়ায়াতটি বড় সাইজের পূর্ণ দু'পৃষ্ঠা হবে।" –আল-মুগীর আলাল আহাদীসিল মাওযূআতে ফিল জামিয়িস সগীর ঃ ৪–আততালীকাতুল হাফেলা আলাল আজবিবাতিল ফাযেলা ঃ ১২৯

মুহাদ্দেস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহঃ) এ রেওয়ায়াত সম্পর্কে তাঁর অন্য এক প্রবন্ধে লিখেন ঃ هذا الحديث ظاهر الوضع واضح النكارة "এটি জাল ও বাতিল হওয়া অতি সুস্পষ্ট।" –আল বূসীরী মাদেহুর রাসূলিল আযম ঃ ৭৫

আল্লামা লাল শাহ বুখারী (রহঃ)ও স্বরচিত গ্রন্থ 'বাশারিয়াতে রাসূল'–এ একে জাল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উক্ত রেওয়ায়াতের কোন কোন বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেন ঃ

كل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بحديثه.

"হাদীস বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মতিক্রমে এ সবগুলোই মিথ্যা ও বানোয়াট।"[১]

---

(١) وفي «مجموع فتاوى ابن تيمية» ١٨: ٣٦٦–٣٦٧: «وكذلك ما ذكر من أن الله قبض من نور وجهه قبضة، ونظر إليها فعرقت ودلقت فخلق من كل قطرة نبيا، وأن القبضة

হাফেয ইবনে কাসীর (রহঃ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর উক্তি উল্লেখপূর্বক একমত পোষণ করেছেন। –আল আসারুল মারফূআ ঃ ৪৩

মুহাদ্দেস মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আশূর (রহঃ) উক্ত রেওয়ায়াতের জাল হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'খালকুন্নুরিল মুহাম্মাদী' নামক এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন, যেটি তার গ্রন্থ "তাহকীকাতুন ওয়া আন্‌যারুন ফিল কুরআনি ওয়াসসুন্নাহ" ১৫১-১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।[১]

আলোচিত রেওয়ায়াতটি জাল হওয়ার ব্যাপারে পূর্বোক্ত আলোচনাই

كانت هي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بقي كوكبا دريا، فهذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وكذلك ما يذكرون أنه صلى الله عليه وسلم كان كوكبا، أو أن العالم كله خلق منه، أو أنه كان موجودا قبل أن يخلق أبواه، أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل! وأمثال هذه الأمور، فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته».

১–এখানে একটি কথা উল্লেখ করাই সঙ্গত মনে করছি যে, যে রেওয়ায়াতটি জাল হওয়ার ব্যাপারে আমি হাদীস বিশেষজ্ঞদের উক্তি বর্ণনা করেছি, তা ঘটনাক্রমে থানভী (রহঃ)-এর পুস্তিকা 'নাশরুত্তীব'–এও রয়েছে। কারণ, তিনি নাশরুত্তীব রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা'-এর উপর নির্ভর করেছেন। আর এ কিতাবে উক্ত হাদীসের বেলায় ভুলক্রমে 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'–এর উদ্ধৃতি দেওয়া ছিল। তখন 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি বলে তা থানভী (রহঃ)-এর সামনে ছিল না। তাই 'আল-মাওয়াহিব'–এ প্রদত্ত উদ্ধৃতি সঠিক ভেবে তিনি তা উল্লেখ করেছেন; অথচ উক্ত হাদীসটি 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'–এর কোথাও নেই।

বহু মুহাদ্দেসীনে কেরাম শুধু উক্ত হাদীসটি বের করার জন্যে উল্লিখিত কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাধিকবার অধ্যয়ন করেছেন। তবুও তারা হাদীসটি পাননি।

'নশরুত্তীব' রচনাকালে তাঁর সামনে কী কী কিতাব ছিল তার একটি তালিকা তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন; এতে 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'-এর নাম উল্লেখ নেই।

তালীমুদ্দীন-এ থানভী (রহঃ) হাদীসের ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞদের তাহকীক মেনে নেওয়ার প্রতি জোর তাকিদ জানিয়েছেন এবং 'আত্তাকাশশুফ ঃ ৪০৩, হাদীস ২৬৩–এ তিনি এ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তা ৬৭-৬৮পৃষ্ঠার টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি পুনরায় দেখা যেতে পারে।

যথেষ্ট ছিল; তথাপি বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্যে রেওয়ায়াতটির উল্লেখিত পাঁচটি রূপের প্রত্যেকটির ব্যাপারে ভিন্নভিন্নভাবে মুহাদ্দেসীনে কেরামের বক্তব্য লেখা হল। প্রথম বাক্যটি ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে হাফেয সুয়ূতী এবং আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহঃ) মত ব্যক্ত করেছেন। (আল আসারুল মারফূআ ঃ ৪৩)

দ্বিতীয় বাক্যটি হুবহু দীর্ঘ রেওয়ায়াতের প্রথম অংশ, যার জাল ও অসারতা সম্পর্কে আকাবের মুহাদ্দেসীনে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ বাক্যটি মূলতঃ পঞ্চম বাক্যটির ভিন্ন দু'টি রূপ, যার সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন ঃ هو كذب مختلق "সেটি মিথ্যা ও মনগড়া উক্তি।"

হাফেয ইবনে তাইমিয়া, মুহাদ্দেস তাহের পাটনী ও আল্লামা শাওকানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতও তাই।

–কাশফুল খাফা ঃ ১/২০৫ আল-মাওযূআতুল কুবরা ঃ ৪০, তাযকেরাতুল মাওযূআত ঃ ৮৬, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ঃ ২/৪১২

নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কিত বাতিল ও জাল রেওয়ায়াতের ধারাবাহিকতা এখানেই শেষ নয়; বরং এ পর্যায়ের আরো বাতিল ও জাল রেওয়ায়াত কতক জাহেল বক্তাদের মুখে প্রচলিত রয়েছে। যেমন ঃ

৭৬–"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "একটি তারকা প্রতি সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হত, আমি সেটিকে সত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। এতে আপনি আমার বয়স আন্দাজ করে নিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেটিই ছিল আমার নূর।"

এই রেওয়ায়াতের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া

(রহঃ) বলেন যে, 'এটি একটি মনগড়া রেওয়ায়াত।' –কিতাবুল ইস্‌তিগাসা ফিররদ্দে আলাল বাকরী ঃ ১/১৩৮,

আরো দ্রষ্টব্য ঃ খাইরুল ফাতাওয়া ঃ ১/২৭৬

নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটিও লোকমুখে প্রসিদ্ধ ঃ

৭৭–"হযরত আদম (আঃ)-এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম।"

প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহঃ) এ সম্পর্কে লেখেন যে, "এটিও একটি জাল বর্ণনা।" –আল বূসীরী মাদেহুর রাসূলিল আযাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঃ ৭৫

এ সম্পর্কে কতিপয় লোকের কাছে নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটিও প্রসিদ্ধ ঃ

৭৮–خلقني الله من نوره، وخلق أبا بكر من نوري، وخلق عمر من نور أبي بكر، وخلق أمتي من نور عمر؛ وعمر سراج أهل الجنة.

৭৮–"আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমার নূর দিয়ে আবূ বকরকে সৃষ্টি করেছেন। আবূ বকরের নূর দিয়ে উমরকে সৃষ্টি করেছেন। উমরের নূর দিয়ে সকল উম্মতকে সৃষ্টি করেছেন আর উমর হল জান্নাতীদের আলোকবর্তিকা।"

অথচ এ বর্ণনাটিও সম্পূর্ণ জাল ও ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে তার সামান্যতম দূরবর্তী সম্পর্কও নেই।

ইমাম আবূ নুয়াইম (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

هذا باطل، مخالف لكتاب الله.

"এটি একটি বাতিল কথা এবং কুরআন মাজীদ পরিপন্থী উক্তি।" –মীযানুল ইতিদাল ঃ ১/১৬৬

হাফেয যাহাবী (রহঃ) মীযানুল ইতিদাল–এ, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিসানুল মীযান–এ এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহঃ) তানযীহুশ শারীয়াতিল মারফূআ ঃ ১/৩৩৭–এ ইমাম আবূ নুয়াইম (রহঃ)–এর কথা উল্লেখপূর্বক একমত পোষণ করেছেন।

যাহোক এসব রেওয়ায়াতই যখন জাল ও বাতিল, তো সেগুলোর অর্থ নিয়ে আলোচনা করা নিষ্ফল। কাজেই এখানে এ আলোচনায় জড়ানোর কোন অর্থ হয় না যে, উক্ত রেওয়ায়াতসমূহে নূর বলতে দৃশ্য নূর বুঝানো হয়েছে, নাকি অদৃশ্য নূর কিংবা রূহ। কেননা, যখন এটি হাদীসই নয়; বরং মিথ্যুকদের বানানো কথা, তখন মিথ্যুকেরা এখানে নূর দ্বারা কি বুঝিয়েছে তা আমাদের জানার কী প্রয়োজন অথবা তাতে লাভ কী ? তবে জেনে রাখা উচিত যে, ভুলবশত যে দু' একজন উক্ত জাল হাদীসটি তাদের পুস্তকে লিখেছেন, তাদের কেউ 'নূর'কে বাহ্যিক নূর দ্বারা ব্যাখ্যা করেননি; বরং সবাই নূর দ্বারা অদৃশ্য নূর, তথা হেদায়াতকে বুঝিয়েছেন।

জাল রেওয়ায়াতের বিপরীতে সহীহ হাদীসসমূহ

এসব জাল রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর এবং তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বহু জিনিসের ক্ষেত্রে প্রথম হওয়ার মর্যাদা দান করেছেন। এ সম্পর্কে কতিপয় সহীহ হাদীস সামনে উল্লেখ করা হবে।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর সম্পর্কে কথা হল যে, তিনি এত অধিক অদৃশ্য নূরের অধিকারী ছিলেন, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে নূর কোন যুগ অথবা এলাকার সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত, উত্তর থেকে দক্ষিণ, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত তাঁর নূর সুবিস্তৃত। যদি কেউ কোথাও হক ও হেদায়াত পেয়ে থাকে তা হলে তাঁর নূরের বদৌলতেই পেয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেদায়াতের নূর বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, নূর দিয়ে প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী; সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়ক রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।" –সূরা আহযাব ঃ ৪৫-৪৬

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا.

"হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এক প্রমাণ (রাসূল) পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট নূর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি।" –সূরা নিসা ঃ ১৭৪

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

"অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।" –সূরা তাগাবুন ঃ ৮

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ، بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ، اَللّٰهُ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ.

"এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি–যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে নূরের দিকে বের করে আনেন–পরাক্রমশালী, প্রশংসারযোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। তিনি আল্লাহ; যিনি আসমান ও যমীন সব কিছুর মালিক।" –সূরা ইবরাহীম ঃ ১-২

আল্লাহ্ তাআলা এই নূর সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ، وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ.

"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্র নূর নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।" –সূরা সাফ ঃ ৮

যাহোক, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্য নূর তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য এত অধিক দান করেছেন, যা বর্ণনাতীত। তবুও তিনি এ দুআ করতেন ঃ

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل في نفسي نورا، واجعلني نورا.

"হে আল্লাহ্ আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার জিহ্বায় নূর দান করুন। আমার কানে নূর দান করুন। আমার চোখে নূর দান করুন। আমার ডানে নূর দান করুন। আমার বামে নূর দান করুন। আমার সামনে নূর দান করুন। আমার পিছনে নূর দান করুন। আমার উপরে নূর দান করুন। আমার নীচে নূর দান করুন। আমার ভিতরে নূর দান করুন। সর্বোপরি আমাকেই নূর বানিয়ে দিন।" –সহীহ্ বুখারী ঃ ২/৯৩৫ হাদীস ৬৩১৬, সহীহ্ মুসলিম ঃ ১/২৬১ হাদীস৭৬৩/ ১৮৭

এখন অবশিষ্ট থাকল দৃশ্য নূরের প্রসঙ্গ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য এত অধিক দান করেছেন, যার উপর দৃশ্য নূরও ঈর্ষা করতে বাধ্য। এ সম্পর্কে কয়েকটি সহীহ্ হাদীস ২০৮-২১০পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ্সূত্রে

বর্ণিত আছে ঃ

إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين، صلوات الله عليهم، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته، نورا أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتعقبه الذهبي، ورجال إسناد أحمد ثقات، قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٨:٩٠٤.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলার নিকট লওহে মাহফূযে আখেরী নবী হিসেবে আমার নাম তখনও লেখা ছিল, যখন আদম (আঃ) কাদামাটিতে (যা দ্বারা তিনি তৈরী হন) ছিলেন। (অর্থাৎ তখনও তাতে রূহ দেওয়া হয়নি) এখন আমি তোমাদেরকে (এ দুনিয়াতে আমার নবুওয়তের প্রচারের) প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বলছি, আমি ইবরাহীম (আঃ)–এর দুআর বিকাশ[১] এবং ঈসা (আঃ) কর্তৃক তাঁর গোত্রকে নবী আগমনের যে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, আমি সেই সুসংবাদ।[২]

১–হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দুআ করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ، اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করুন–যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত (সুন্নাহ্ ও আহকাম) শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী ও হেকমতওয়ালা।" –সূরা বাকারা ঃ ১২৯

আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর এ দুআকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে কবূল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ

আমি সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ, যা আমার মাতা দেখেছিলেন যে, তাঁর থেকে এক নূর বের হয়, যার আলোকে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়। এ ধরনের স্বপ্ন নবী জননীগণ (তাঁদের জন্মের পূর্বে) দেখে থাকেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতাও তাঁকে জন্মদানের সময় এক নূর দেখতে পান, যার নূরে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়।" –মুসনাদে আহমাদ ঃ ৪/২৭, মুস্তাদ্‌রাকে হাকেম ঃ ২/৬০১

অন্য রেওয়ায়াতে হযরত মাইসিরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

قلت: يا رسول الله! متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم عليه السلام بين الروح والجسد. قال ابن كثير في «البداية» ٢:٢٩٠: إسناده جيد.

"আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নবুওয়ত কখন লেখা হয়েছিল? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, যখন আদম (আঃ) রূহ ও শরীরের

وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব, ও হেকমত (সুন্নাহ ও আহকাম)। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" –সূরা জুমুআ ঃ ২

২– সূরা 'সাফ'–এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗ أَحْمَدُ.

"স্মরণ কর, যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বলল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পর আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমাদ।" –সূরা সফ ঃ ৬

হযরত ঈসা (আঃ)–এর সুসংবাদ ইঞ্জিলে আজো বিদ্যমান আছে। বিস্তারিত জানার জন্যে দেখা যেতে পারে ঃ সীরাতুন নবী ঃ ৩/৪৩০-৪৫৭, তাফসীরে হাক্কানী ঃ ৪/৫২৫-৫৪৬

মাঝে ছিলেন (অর্থাৎ তখন তাঁর শরীর বানানো শেষ হয়েছিল; কিন্তু তাতে প্রাণ দেওয়া হয়নি)।" –মুসনাদে আহমাদ ঃ ৫/৫৯

এমনিভাবে জামে তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

قالوا: يا رسول الله! متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

"সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কখন আপনার নবুওয়ত স্থীতি লাভ করে ? ইরশাদ করেন, যখন আদম (আঃ) রূহ ও শরীরের মাঝে ছিলেন।" –জামে তিরমিযী ঃ ২/২০২, হাদীস ৩৬০৯

উপরোক্ত সবগুলো হাদীস সহীহ। হাফেয ইবনে কাসীর (রহঃ) হাদীসগুলো উল্লেখ করার পর লিখেন ঃ

وهذا إخبار عن التنويه بذكره في الملأ الأعلى، وأنه معروف بذلك بينهم بأنه خاتم النبيين، وآدم لم ينفخ فيه الروح.

"এ সব হাদীসের মধ্যে এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ)–এর মাঝে রূহ দেওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা ঊর্ধ্ব জগতে (ফেরেশতা ও রূহের জগতে) তাঁর নাম প্রসিদ্ধ করে দেন। তিনি তাঁদের মাঝে তখন থেকেই সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।" –আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়া ঃ ২/২৯১

এসব হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এবং ঊর্ধ্বজগতে তাঁর নবুওয়ত ও রিসালাতের প্রচার-প্রসার শুধু তাঁরই সৃষ্টির পূর্বে নয়; বরং তাঁর আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)–এর সৃষ্টি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। সাথে সাথে ইরবাস ইবনে সারিয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় তাঁর মাতা একটি দৃশ্য নূর দেখেছিলেন, যার আলোতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ (অথচ

সিরিয়া মক্কা থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত) আলোকিত হয়েছিল। এই বাহ্যিক নূর চমকানোর মধ্যে মূলত এই ইশারা ছিল যে, এই নবজাতকের মাধ্যমে একদিন হেদায়াতের নূর সারা বিশ্বে বিচ্ছুরিত হবে। বাস্তবে তাই হয়েছে। فصلوات الله وسلامه عليه كما يحبه ويرضاه.

ঊর্ধ্ব জগতে নবুওয়তের প্রচারের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমত্বের মর্যাদা দান করেছেন। তেমনিভাবে আরো বহু ফযীলতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রথমত্বের মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।

সহীহ্ মুসলিমসহ বহু হাদীস গ্রন্থে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণিত আছে ঃ

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع.

"আমি কিয়ামাত দিবসে আদম সন্তানের সরদার হব, এতে গর্বের কিছু নেই। আমি সর্বপ্রথম কবর-উত্থিত-ব্যক্তি, সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমি সর্বপ্রথম সুপারিশ-মঞ্জুরকৃত-ব্যক্তি হব।" –সহীহ্ মুসলিম ঃ ২/২৪৫, হাদীস ২২৭৮

অন্য হাদীসে আছে ঃ

أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، و أنا أول من يقرع باب الجنة.

"কিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার অনুসারী হবে এবং আমিই সে ব্যক্তি, যে জান্নাতের দরজায় সর্বপ্রথম নক করবে। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করবে।" –সহীহ্ মুসলিম ঃ ১/১১২, হাদীস ৩৩০

অন্য হাদীসে আছে ঃ

آتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك.

"কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের দরজায় এসে তা খোলতে বলব। প্রহরী বলবে, আপনি কে ? আমি উত্তরে বলব, মুহাম্মাদ। এরপর সে বলবে,

আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি আপনার আগে কারো জন্যে দরজা না খোলি।" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/১১২, হাদীস ৩৩৩

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما صدقه من أمته إلا رجل واحد.

"আমি জান্নাতের জন্যে সর্ব প্রথম সুপারিশকারী হব। আমার ন্যায় অন্য কোন নবীর প্রতি এত অধিক লোক ঈমান আনেনি। এমন নবীও আছে যাঁর প্রতি তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে মাত্র একজনই ঈমান এনেছে।" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/১১২, হাদীস ৩৩২

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.

"আমাকে পাঁচটি জিনিস এমন দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি। এক মাসের দূরত্ব থেকে শত্রুদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (অর্থাৎ শত্রুরা একমাসের দূরত্ব থেকে আমার নাম শোনলেই ভয় পাবে।) গোটা জমিনকে আমার জন্যে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যারই নামাযের সময় হয় সে (যেখানেই থাকুক না কেন) যেন নামায পড়ে নেয়। আমার পূর্বে কারো জন্যে মালে গনীমত (যুদ্ধলব্ধমাল) হালাল ছিল না; আমার জন্যে তা হালাল করা হয়েছে। আমাকে সুপারিশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। (আগেকার যুগে) নবী নির্দিষ্ট গোত্রের প্রতি প্রেরিত হত আর আমি সমস্ত মানুষের প্রতি

প্রেরিত হয়েছি।” –সহীহ বুখারী ঃ ১/৪৮, হাদীস ৩৩৫, সহীহ মুসলিম ঃ ১/১৯৯, হাদীস ৫২৩

সহীহ মুসলিমে এ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় উল্লেখ আছে ঃ ختم بي النبيون। “আমার মাধ্যমেই নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।”

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সঠিক বিশ্বাস, তাঁর প্রতি সত্যিকারের মহব্বত এবং তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণের তাওফীক দান করুন। রোজ হাশরে তাঁর শাফাআত এবং তাঁর হাউযে কাওসারের পানি নসীব করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

উলামায়ে কেরামের অবগতির জন্যে আমি নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কিত সুদীর্ঘ রেওয়ায়াতটি এখানে আরবীতে উল্লেখ করছি, যা দেখামাত্রই সবাই বুঝতে সক্ষম হবে যে, এটি একটি জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা।

نص حديث النور المحمدي الطويل و هو موضوع بفصه و نصه

جاء في كتاب «الخَميس في أحوال أنْفَسِ نَفِيس» (صلى الله عليه وسلم) للقاضي حسين بن محمد الدِّيارْبَكْري، ١:١٩-٢٠:

«رُوِي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شيء خلقه الله؟ قال: هو نور نبيك يا جابر، خلقه ثم خلق منه كل خير، وخلق بعده كل شيء، وحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام:

خلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام:

Contents

فخلق الخلق من قسم، واللوح من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء:

فخلق الملائكة من جزء، وخلق الشمس من جزء، وخلق القمر والكواكب من جزء، وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء:

فخلق العقل من جزء، والحلم والعلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة، ثم نظر الله سبحانه إليه فترشح النور عرقا، فقطرت منه مئة ألف وعشرون ألفا وأربعة آلاف قطرة من النور، فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو رسول.

ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم نور الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيام.

فالعرش والكرسي من نوري، والكروبيون من نوري، والروحانيون من الملائكة من نوري، والشمس والقمر والكواكب من نوري، والعقل والعلم والتوفيق من نوري، وأرواح الأنبياء والرسل من نوري، والشهداء والصالحون من نتائج نوري.

ثم خلق سبحانه اثني عشر حجابا، فأقام النور، وهو الجزء الرابع، في كل حجاب ألف سنة، فلما خرج النور من الحجب ركبه الله في الأرض، وكان يضيء منه ما بين المشرق والمغرب، كالسراج في الليل المظلم.

ثم خلق الله آدم فى الأرض وركب فيه النور في جبينه، ثم انتقل منه إلى شيث، ومنه إلى يانش، وهكذا كان ينتقل من طاهر إلى طيب، إلى أن أوصله الله تعالى إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب، منه إلى رحم آمنة.

ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة

للعالمين، وقائد الغر المحجلين. هكذا بدء خلق نبيك يا جابر».

هذا سياق الحديث عند الدِّيارَبَكْري، رجلٍ من القرن العاشر، لايشك مَنْ وَقَف عليه لأجل ركاكة ألفاظه وركاكة معناه، ومخالفته لأسلوب كلام النبوة، ومخالفته أيضا لبعض الأمور الثابتة في السنة الصحيحة، ولاشتماله على المصطلحات الحادثة فيما بعد عهد الرسالة وعهد الصحابة فما بعدهما- في أنه موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فداه أبي و أمي.

وأغرب الدياربكري إذ قال إثر ذكره: "ذكره البيهقي"!! وهذا العزو خاطئ يقينا لا أدري من أين اشتبه الأمر على الدياربكري، ولايظن به أنه تعمد هذا العزو الهوائي، والرواية لا أثر لها في «دلائل النبوة» للبيهقي، وهي المظنة، ولا في غيرها من مؤلفاته.

ولو كان هذا عند البيهقي لكان موضعَ بحثِ الحفاظ السابقين، ولاندَرَج في كتب الموضوعات للأقدمين ولأخذوا على البيهقي فيما أخذوه عليه من إيراد الموضوعات في تآليفه مع التزامه أن لايورد فيها موضوعا، ولتوارد أصحابُ السيرة على نقلِه ليَعتَمِدوه أو لينقُدُوه، ولمّا كان مُدَّخَرا فضلُ نقلِه لأمثال الدياربكري ونحوه. وهذا ظاهر جدا.

وغفر الله للزرقاني إذ عزاه أيضا في "شرح المواهب" ١:٩١، إلى البيهقي، ولا أشك في أنه اعتَمَد في هذا العزو على الدياربكري، وكتابُه الخَميس موجود عند الزرقاني، ينقل عنه ويحيل عليه. فلا تغتر بتقليد الساهي للساهي.

وقد لعب الكذابون في صُنْع هذه الرواية، فاضطربوا في ذلك ما شاؤوا، ففي «شفاء الصدور» لأبي الربيع سليمان بن سبع السبتي سياقان آخران لهذه الرواية، نقلهما ابن الحاج في «المدخل» ٢:٣١-٣٣، ولا بد من

سردهما هنا ليتيقن أصحابُ البصيرة ببطلان الرواية المبحوث عنها هنا، قال ابن الحاج نقلا عن «شفاء الصدور»:

رُوِي أنه لما شاء الحكيم خلق ذاته صلى الله عليه وسلم المباركة المطهرة، أمر سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض وأن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض و بهاؤها ونورها.

قال فهبط جبريل عليه السلام وملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى وقبض قبضة من موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بيضاء منيرة فعجنت بماء التسنيم وغمست في معين أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء ولها نور وشعاع عظيم حتى طافت بها الملائكة حول العرش وحول الكرسي وفى السموات والأرض وفى الجبال والبحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله قبل أن تعرف آدم عليه الصلاة والسلام.

فلما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وضع في ظهره قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع آدم في ظهره نشيشا كنشيش الطير. فقال آدم: يا رب ما هذا النشيش؟ قال: هذا تسبيح نور محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك فخذه بعهدي وميثاقي ولاتودعه إلا في الأرحام الطاهرة. فقال آدم: يا رب قد أخذته بعهدك وميثاقك ولا أودعه إلا في المطهرين من الرجال والمحصنات من النساء.

فكان نور محمد صلى الله عليه وسلم يتلألأ في ظهر آدم وكانت الملائكة تقف خلفه صفوفا ينظرون إلى نوره صلى الله عليه وسلم، ويقولون سبحان الله، استحسانا لما يرون. فلما رأى آدم ذلك، قال: أي رب ما بال هؤلاء يقفون خلفي صفوفا. فقال الجليل سبحانه وتعالى له: يا آدم! ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك، فقال: أي رب أرنيه فأراه الله

إياه فآمن به وصلى عليه مشيرا بإصبعه. ومن ذلك الإشارة بالإصبع بلا إله إلا الله محمد رسول الله في الصلاة.

فقال آدم: رب اجعل هذا النور في مقدمي كي تستقبلني الملائكة ولاتستدبرني، فجعل ذلك النور في جبهته، فكان يرى في غرة آدم دائرة كدائرة الشمس في دوران فلكها، أو كالبدر في تمامه وكانت الملائكة تقف أمامه صفوفا ينظرون إلى ذلك النور ويقولون سبحان الله ربنا، استحسانا لما يرون.

ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام قال: يا رب اجعل هذا النور في موضع أراه، فجعل الله ذلك النور في سبابته، فكان آدم ينظر إلى ذلك النور.

ثم إن آدم قال: يا رب هل بقي من هذا النور شيء في ظهري؟ فقال: نعم بقي نور أصحابه. فقال: أي رب اجعله في بقية أصابعي، فجعل نور أبي بكر في الوسطى، ونور عمر في البنصر، ونور عثمان في الخنصر ونور علي في الإبهام، فكانت تلك الأنوار تتلألأ في أصابع آدم ما دام في الجنة. فلما صار خليفة في الأرض انتقلت الأنوار من أصابعه إلى ظهره. انتهى.

وفيه أيضا: أن أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، فأقبل ذلك النور يتردد ويسجد بين يدي الله عز وجل، فقسمه الله تعالى على أربعة أجزاء. فخلق من الجزء الأول العرش، ومن الثاني القلم، ومن الثالث اللوح.

ثم قال للقلم : اجر واكتب، فقال: يا رب ما أكتب؟ قال: ما أنا خالقه إلى يوم القيامة. فجرى القلم على اللوح وكتب، حتى أتى على آخر ما أمره الله سبحانه وتعالى به.

وأقبل الجزء الرابع يتردد بين يدي الله تعالى ويسجد لله عز وجل فقسمه الله أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول العقل، ومن الثاني المعرفة وأسكنها في قلوب العباد، ومن الجزء الثالث نور الشمس والقمر ونور

الأبصار، والجزء الرابع جعله الله حول العرش حتى خلق آدم عليه الصلاة والسلام فأسكن ذلك النور فيه.

فنور العرش من نور محمد صلى الله عليه وسلم، ونور القلم من نور محمد صلى الله عليه وسلم، ونور اللوح من نوره صلى الله عليه وسلم، ونور النهار من نوره صلى الله عليه وسلم، ونور العقل من نوره صلى الله عليه وسلم، ونور المعرفة ونور الشمس ونور القمر ونور الأبصار من نوره صلى الله عليه وسلم». انتهى.

نصوص النقاد في وضع الروايات المذكورة

وما أظن أحدا من طلبة الحديث له أدنى مزاولة بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، يشك في بطلان نسبة هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبطلانه في نفسها بجميع سياقاتها، وقد ذكرت آنفا أسامي، ونصوص المحدثين النقاد الذين حكموا على هذه الرواية بالوضع والبطلان في (ص٢٢٠-٢٢٥) فنقلت هناك عن ابن تيمية، وابن كثير، وطاهر بن عاشور، وأحمد الغماري، وعبد الله الغماري، ولعل شاه البخاري الحنفي، وسرفراز خان صفدر الحنفي الديوبندي، وأحمد بن عبد القادر الشنقيطي أنهم حكموا عليه بالوضع والبطلان، فانظر نصوصهم هناك مرة أخرى، وناهيك بهم نقدا ومعرفة وورعاً وتقى.

وأنقل هنا ما ذكره المحدث الناقد الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى، في مقاله عن قصيدة البردة، إذ ذكرت من كلامه فيما سبق حكم الحديث فقط. وإليك بحثه، قال رحمه الله تعالى:

قولُ البوصيري:

فإن من جودك الدنيا وضرتها × ومن علومك علم اللوح والقلم

في هذا مبالغة لا دليل لها.

ويظهر أن الناظم استند للشطر الأول من البيت إلى حديث جابر: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»، وهو حديث طويل جاء فيه: أن الله خلق من نوره صلى الله عليه وآله وسلم العرش والكرسي والملائكة وجميع المخلوقات، وقد ذكره بطوله ابن العربي الحاتمي في كتاب «تلقيحُ الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان»، والدياربكري في «الخميس من تاريخ أنفس نفيس» في السيرة.

وقال السيوطي: في «الحاوِي» (٢: ٤٣ في كتاب التفسير، تفسير سورة المدثر): إنه غيرُ ثابت، وهوتساهل قبيح بل الحديث ظاهر الوضع، واضحُ النكارة، وفيه نَفَس صوفي، حيث يذكر مقامَ الهيبة ومقام الخشية، إلي آخر مصطلحات الصوفية.

والعجيب عزوه إلى عبد الرزاق، مع أنه لا يوجد في «مصنَّفه» ولا «تفسيره» ولا «جامعه»، وأعجبُ من هذا أن بعض الشُّناقِطة صدَّقَ هذا العَزْوَ المخطىءَ، فركَّبَ له إسناداً من عبد الرزاق إلى جابر، ويعلم اللّه أن هذا كلّه لا أصل له.

فجابر رضي اللّه عنه بريءٌ من رواية هذا الحديث، وعبدُ الرزاق لم يسمع به، وأولّ من شهَّر هذا الحديث ابنُ العربي الحاتمي، فلا أدري عمَّن تلقَّاه، وهو ثقة، فلا بدَّ أن أحدَ المتصوفة المتزهِّدين وضَعَه.

ومثل هذا الموضوع أيضاً: ما رُوي من طريق أهل البيت عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «كنتُ نورا بين يدي ربي قبل أن يُخْلَق آدمُ بأربعة عشر ألف عام». وحديث: «لولاكَ ما خلقتُ الأفلاك».

وكتب المولد النبوي ملأى بهذه الموضوعات، وأصبحت عقيدة راسخة في

أذهان العامة، وأرجو أن يوفِّقَني الله إلى تأليف حول المولد النبوي، خالٍ من أمرين شائنين: الأحاديث المكذوبة، والسَّجع المتكلف المرذول.

والشطر الثاني من البيت، لعل الناظم استند فيه إلى حديث اختصام الملأ الأعلى، الذي رواه أحمد والترمذي ونقل تصحيحه عن البخاري، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت ...» الحديث.

لكنه لا يفيد ما ادعاه الناظم من أن علم اللوح والقلم بعضُ علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الدعوى مبالغة ليس عليها دليل.

وقد أصلحت هذا البيت بقولي:

فإن جودك في الدنيا و ضرتها × و في كتابك علم اللوح والقلم.

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود ولد آدم، وهو في الآخرة أجودهم أيضا بما له من شفاعات في أمته.

وكتابه القرآن فيه علوم الأولين والآخرين، وهو معجزته الكبرى، وكيف لا وهو كتاب أنزله الذي يعلم السر فى السموات والأرض، قال في حقه: «ما فرطنا في الكتب من شيء».

والمقصود أن الغلوَّ فى المدح مذموم لقوله تعالى: «لا تغلوا في دينكم»

وأيضا فإن مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر لم يثبت عنه، يكون كاذبا عليه، فيدخل في وعيد «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

وليست الفضائل النبوية مما يتساهل فيها برواية الضعيف ونحوه،

لتعلقها بصاحب الشريعة ونبي الأمة، الذي حرم الكذب عليه وجعله من الكبائر العظيمة، حتى قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بكفر الكاذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم.

وعلى هذا فما يُوجد في كتب المولد النبوي وقصة المعراج من مبالغات وغلو لا أساس له من الواقع: يجب أن تُحرَق، لئلا يحرق أصحابُها وقارئوها في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. انتهي كلام الشيخ الغماري رحمه الله تعالى، وهو في آخر رسالة: «البوصيري مادح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» تاليف عبد العال الحمامصي.

وبهذا القدر أكتفي في الكلام على هذا الحديث هنا، وشرح الركاكات اللفظية و النكارات المعنوية التي في هذا الحديث المصنوع: يحتاج إلى كتاب مستقل، ولعل الله تعالى يوفق لذلك أحدا من عباده.

وفي العلماء المتأخرين من أصحاب السيرة وغيرهم جماعة ممن نقلوا هذا الحديث، ولكن كلهم ممن بعد القسطلاني، ظنوا وجود الحديث في «المصنف» أو «دلائل النبوة»، فعزوه إليهما أو إلى أحدهما، أو ذكروه من غير عزو ولم يكونوا نقادا فيلتزموا الرجوع إلى المصادر الأصلية، أو ليستنكروا متنه فيتوقفوا عن إيراده!!

ولا يكفي في ثبوت الحديث مجرد عزو أحد إياه إلى كتاب من الكتب الحديثية و إنما يثبت بوجوده بالإسناد المعتبر في مصدر معتبر، ولم يتحقق هذا المناط في هذا الحديث، والذين عزوه إلى المصنف أو إلى البيهقي لم يذكروا إسنادا لرواية عندهما أو عند أحدهما، ومن أين يذكرون الإسناد فإنهم لم يعزوا الحديث إليهما بالرجوع إليهما، وإنما هو التقليد الصِّرف للساهي، وأما الساهي الأول فمستنده في العزو الاشتباه لا غير. إذ لا

Contents

وجود له لا في المصدرين المعزولهما، ولا في غيرهما من كتب الأحاديث المسندة المستندة.

وإذا عزا حافظ ناقد وعارف متقن حديثا إلى كتاب مشهور فلم يوجد فيه بعد التفتيش البالغ من مختلف النسخ والروايات، يحكم عليه بالوهم وعلى الحديث بعدم وجوده في ذلك الكتاب، كما هو معلوم عند أهل العلم، فكيف إذا كان العازون للحديث غير حفاظ نقاد أو غير عارفين متقنين، وإنما كان عزوهم بالتقليد الصرف للساهي الأول.

قال أبو الحسين البصري المتوفى سنة ٤٣٦ في «المعتمد في أصول الفقه» ٢:٧٩ «فأما الخبر الذي إذا فتش عنه أهل العلم ولم يظفروا به في جملة الأخبار، بعد استقرار السنن، فإنه يعلم كذبه، لعلمنا أن الأخبار قد دونت، ورواية الخبر بعد ما دونت الأخبار هي رواية لما دون.

وننظر، فإذا لم يوجد ذلك علمنا كذبه، لأنا لم نشاهده، كما إذا قال الراوي: «هذا الخبر في الكتاب الفلاني، فلا نشاهده فيه»، انتهى.

وهذا لفظه لفظ البصري، ومعناه مجمع عليه عند جميع أهل العلم والمعرفة من أصحاب الحديث وأصحاب الفقه والأصول.

ويعرف أهل النقد أن مثل هذه الرواية التي نبحث عنها هنا إذا فرض وجود إسناد له لا يخلو أن يوجد في ذلك الإسناد كذاب معروف بالكذب، أو راو مجهول العدالة أو الضبط يحكم عليه لتفرده بمثل هذا المنكر الباطل: بأنه متهم بالكذب أو منكر الحديث، فليس حكم الوضع عليه بمجرد أنه لم يوجد مسندا.

وأما توارد جماعة كبيرة على نقل خاطئ أو قول خاطئ فهذا غير غريب ولاعزيز، بل يشاهد المحققون مثل هذا التوارد في جميع الفنون، بكثرة بالغة. واقرأ رسالة «شرح عقود رسم المفتي» لابن عابدين (ص٦-٨)، لتعرف نظائر من توارد الجماعة الكبيرة على النقل الخاطئ.

ولذا لم يكتفوا فى التواتر بمجرد التوارد، بل اشترطوا كون مستند انتهائهم الحس، ونحو ذلك من الشروط. كما لم يكتفوا في باب التلقي بالقبول إلا بتلقي النقاد المحتاطين، لا بتلقي كل واحد، ولا بمجرد إيراد حديث في كتاب، فشتان بين مجرد الذكر وبين التلقي بالقبول. كما هو مقرر في علوم الحديث.

وبقية البحث عن هذه الرواية موكولة إلى كتابَيْ: «ذيل المقاصد الحسنة»، و«ذيل تنزيه الشريعة» للشيخ محمد عبد المالك، وبالله التوفيق.

ثبت المصادر

তথ্যপঞ্জি

১-আল-কুরআনুল কারীম

١-القرآن الكريم

তাফসীর ও উলূমুল কুরআন

التفسير وعلوم القرآن

২-তাফসীরে ইবনে কাসীর
ইসমাঈল ইবনে কাসীর (৭৭৪হিঃ) দারুল খায়ের, বৈরুত; ২য় সংস্করণ-১৪১২হিঃ = ১৯৯১ইং

٢-تفسير ابن كثير

৩-রুহুল মাআনী
মাহমূদ আলূসী (১২৭০হিঃ) এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান

٣-روح المعاني

৪-তাফসীরে হক্কানী
আব্দুল হক হক্কানী (১৩৩৫হিঃ) ইতিকাদ পাবলিশিং হাউজ, দিল্লী

٤-تفسير حقاني

৫-আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন
ডঃ মুহাম্মাদ হুসাইন যাহাবী (১৯৭৭ইং) মিশর

٥-التفسير والمفسرون

৬-উলূমুল কুরআন
মুহাম্মদ তকী উসমানী, মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচী; প্রকাশ-১৪১৯হিঃ

٦-علوم القرآن

হাদীস, শরহ ও উলূমে হাদীস

الحديث وشروحه وعلومه

৭-সহীহ বুখারী
মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল্ বুখারী

٧-صحيح البخاري

Contents

(২৫৬হিঃ) মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ইউ, পি, ইণ্ডিয়া; প্রকাশকাল–১৯৮৫ইং (হাদীস নং ফাতহুল বারীতে প্রকাশিত বুখারী থেকে গৃহীত।)

৮–সহীহ মুসলিম ٨–صحيح مسلم

ইমাম মুসলিম (২৬১হিঃ) মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ইউ, পি, ইণ্ডিয়া; প্রকাশকাল–১৯৮৬ইং (হাদীস নং ইকমালুল মু'লিম-এ প্রকাশিত মুসলিম থেকে গৃহীত।) (কাযী আয়ায ৫৪৪হিঃ, দারুল ওয়াফা, আল-মানসূরা, মিশর, ১ম সংস্করণ–১৪১৯হিঃ = ১৯৯৮ইং)

৯–সুনানে আবু দাউদ ٩–سنن أبي داود

ইমাম আবু দাউদ (২৭৫হিঃ) (ক) দারুল ইশাআত আলইসলামিয়া, কলকাতা, ভারত (খ) দারুল বায, মক্কা মুকাররমা (ঘ) আওনুল মা'বূদ সহ

১০–জামে তিরমিযী ١٠–جامع الترمذي

ইমাম তিরমিযী (২৭৯হিঃ) (ক) ইয়াসির নাদীম এণ্ড কোম্পানী, ভারত (খ) দারুল বায, মক্কা মুকাররমা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত–লেবানন

১১–সুনানে নাসায়ী ١١–سنن النسائي

ইমাম নাসায়ী (৩০২হিঃ) (ক) আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত, প্রকাশকাল–১৩৫০হিঃ (খ) আল-মাতবূআতুল ইসলামিয়া, হলব; দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত; ৪র্থ সংস্করণ–১৪১৪হিঃ = ১৯৯৪ইং

১২–সুনানে ইবনে মাজা ١٢–سنن ابن ماجه

ইমাম ইবনে মাজা (২৭৫হিঃ) (ক) আশরাফিয়া বুক ডিপু, ইউ, পি, ইণ্ডিয়া (খ)

দারু ইহ্য়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত-লেবানন; ১৩৯৫হিঃ = ১৯৭৫ইং

১৩-মুআত্তা ইমাম মালেক — ١٣-الموطأ لمالك

ইমাম মালেক (১৭৯হিঃ) (ক) মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ, ভারত (খ) দারুল কিতাবিল আরাবী; ৪র্থ সংস্করণ-১৪১৮হিঃ = ১৯৯৮ইং

১৪-সহীহ ইবনে হিব্বান — ١٤-صحيح ابن حبان

মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪হিঃ) মুআস্সাসাতুর রিসালা, বৈরুত-লেবানন; ৩য় সংস্করণ-১৪১৮হিঃ = ১৯৯৭ইং

১৫-সুনানে দারেমী — ١٥-سنن الدارمي

ইমাম দারেমী (২৫৫হিঃ) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত-লেবানন; ১ম সংস্করণ-১৪১৯হিঃ = ১৯৯৯ইং

১৬-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক — ١٦-مصنف عبد الرزاق

ইমাম আব্দুর রাযযাক (২১১হিঃ) আল-মাজলিসুল ইলমী, করাচী; ইদারাতুল কুরআন, করাচী-পাকিস্তান; ২য় সংস্করণ-১৪১৬হিঃ = ১৯৯৬ইং

১৭-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা — ١٧-مصنف ابن أبي شيبة

আব্দুল্লাহ ইবনে আবী শাইবা (২৩৫হিঃ) দারুল ফিকর, বৈরুত-লেবানন; ১৪১৪হিঃ = ১৯৯৪ইং

১৮-মুস্তাদরাকে হাকেম — ١٨-المستدرك للحاكم

আবু আব্দুল্লাহ হাকেম (৪০৫হিঃ) (ক) দারুল মারেফা, বৈরুত; ১ম সংস্করণ-১৪১৮হিঃ = ১৯৯৮ইং (খ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ-১৪১১হিঃ = ১৯৯০ইং

১৯-তাবারানী কাবীর — ١٩-المعجم الكبير للطبراني

সুলাইমান ইবনে আহমাদ (৩৬০হিঃ) দারু

ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; ২য় সংস্করণ-১৪০৪হিঃ = ১৯৮৩ইং

২০-মুসনাদে আহমাদ — ٢٠-مسند الإمام أحمد
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (২৪১হিঃ) মুআস্‌সাসাতুত তারীখিল আরাবী, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; ২য় সংস্করণ-১৪১৪হিঃ

২১-মিশকাতুল মাসাবীহ — ٢١-مشكاة المصابيح
মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব আত-তিবরিযী (৭৩৭হিঃ-এর পর) আসাহ্হুল মাতাবেয়, দিল্লী; ভারত

২২-কিতাবুয যুহ্দ — ٢٢-كتاب الزهد
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (২৪১হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, প্রকাশকাল-১৩৯৮হিঃ

২৩-ইতহাফুল খিয়ারা — ٢٣-إتحاف الخيرة في زوائد المسانيد العشرة
শিহাবুদ্দীন আল-বূসীরী (৮৪০হিঃ) আল-মাকতাবাতুল মাক্কিয়্যা, ১ম সংস্করণ-১৪১৮হিঃ = ১৯৯৭ইং

২৪-মাজমাউয যাওয়ায়েদ — ٢٤-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
নূরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭হিঃ) দারুল ফিকর, বৈরুত; প্রকাশকাল-১৪১৪হিঃ = ১৯৯৪ইং

২৫-ফাতহুল বারী — ٢٥-فتح الباري شرح صحيح البخاري
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হিঃ) দারুর রায়্যান, ২য় সংস্করণ-১৪০৯হিঃ =১৯৮৮ইং

২৬-উমদাতুল কারী — ٢٦-عمدة القاري شرح صحيح البخاري
বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫হিঃ) (ক) দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত (খ) মুআসসাতুত তারীখিল আরাবী

২৭-ফায়যুল বারী — ٢٧-فيض الباري شرح صحيح البخاري
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৩৫২হিঃ) রব্বানী বুক ডিপু, দিল্লী; প্রকাশকাল-১৪১২হিঃ =

১৯৯২ইং

২৮–শরহু মুসলিম লিন্নববী
মুহীউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইবনে শরফ আন্নববী (৬৩১হিঃ-৬৭৬হিঃ) আশরাফী বুক ডিপু, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইউ, পি–ইণ্ডিয়া; (সহীহ মুসলিমের সাথে সংযোজিত)
২৮–شرح صحيح مسلم للنووي

২৯–তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচী; ৪র্থ সংস্করণ–১৪১৪হিঃ = ১৯৯৪ইং
٢٩–تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم

৩০–ইকমালুল মু'লিম
আবুল ফযল আয়ায (৫৪৪হিঃ) দারুল ওয়াফা, আল-মানসূরা, মিশর; ১ম সংস্করণ–১৪১৯হিঃ = ১৯৯৮ইং
٣٠–إكمال المعلم شرح صحيح مسلم

৩১–ফাতহুল মুলহিম
শাব্বীর আহমাদ উসমানী (১৩৬৯হিঃ) মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কারী মনযিল, পাকিস্তান চক, করাচী
٣١–فتح الملهم شرح صحيح مسلم

৩২–শরহু জামেয়িত তিরমিযী লি-ইবনে রজব হাম্বলী
যাহেরিয়া কুতুবখানা, দামেস্ক (পাণ্ডুলিপি)
٣٢–شرح جامع الترمذي لابن رجب الحنبلي

৩৩–মাআরিফুস সুনান
মুহাম্মাদ ইউসূফ বানূরী (১৩৯৭হিঃ) মাকতাবায়ে নূরিয়া, আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসূফ বানূরী টাউন, করাচী; ১ম সংস্করণ–১৩৮৩হিঃ = ১৯৬৪ইং
٣٣–معارف السنن شرح جامع الترمذي

৩৪–মিরকাতুল মাফাতীহ
মোল্লা আলী কারী (১০১৪হিঃ) কুতুবখানা ইশাআতে ইসলাম, চোরীওয়ালান, দিল্লী–ভারত
٣٤–مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

৩৫–আত তামহীদ
ইবনে আব্দিল বার (৪৬৩হিঃ) দারুল
٣٥–التمهيد شرح الموطأ

কুতাইবা, বৈরুত; দারুল ওয়াযী, কায়রো; ১ম সংস্করণ–১৪১৪হিঃ = ১৯৯৩ইং

৩৬–ফয়যুল কাদীর — ٣٦-فيض القدير
মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ মুনাভী (১০৩১হিঃ) দারু ইহ্ইয়ায়িস সুন্নাতিন নববিয়া, প্রকাশ–১০৯৩হিঃ

৩৭–আত-তালখীসুল হাবীর — ٣٧-التلخيص الحبير
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হিঃ) দারুল মারেফা, বৈরুত; তাহকীক–সায়্যিদ আব্দুল্লাহ হাশেমী ইয়ামানী

৩৮–তাখরীজে ইহ্ইয়া — ٣٨-تخريج إحياء علوم الدين
যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬হিঃ) (ইহইয়া উলূমিদ্দীনের সাথে)

৩৯–আল আদাবুল মুফরাদ — ٣٩-الأدب المفرد
মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (২৫৬হিঃ) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত; ৪র্থ সংস্করণ–১৪১৭হিঃ = ১৯৯৭ইং

৪০–মুনাজাতে মকবূল — ٤٠-مناجات مقبول
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) ফরীদ বুক ডিপু, দিল্লী

৪১–আল মাদখাল ইলাস সহীহ — ٤١-المدخل إلى الصحيح
আবু আব্দুল্লাহ হাকেম (৪০৫হিঃ) মাকতাবাতুল আবীকান, রিয়াদ–সৌদি আরব; ১ম সংস্করণ–১৪২৩হিঃ

৪২–মাআরিফুল হাদীস — ٤٢-معارف الحديث
মাওলানা মনযূর নুমানী (১৪১৮হিঃ) দারুল ইশাআত, করাচী; পাকিস্তান

৪৩–আদ দিআমা ফিল কালামি আলা আহাদিসি ওয়া আসারিল ইমামা — ٤٣-الدعامة في الكلام على أحاديث وآثار العمامة
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (পাণ্ডুলিপি)

৪৪–শুরূতে আয়িম্মায়ে খামসা — ٤٤-شروط الأئمة الخمسة
মুহাম্মাদ ইবনে মূসা হাযেমী (৫৮৪হিঃ)

Contents

(ক) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪১৭হিঃ = ১৯৯৭ইং (খ) কাদীমী কুবুতখানা, আরামবাগ, করাচী–পাকিস্তান (সুনানে ইবনে মাজা-এর সাথে)

৪৫–দাওরুল হাদীস ফী তাক্‌ভীনিল মানাখিল ইসলামী ওয়া সিয়ানাতিহী
আবুল হাসান আলী নদভী (১৪২১হিঃ)

٤٥-دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي وصيانته

৪৬–আসারুল হাদীস
ডঃ খালেদ মাহমূদ, দারুল মাআরিফ, লাহোর; ১৯৮৫ইং

٤٦-آثار الحديث

৪৭–উজালায়ে নাফেয়া
শাহ আব্দুল আযীয (১২৩৯হিঃ) নূর মুহাম্মাদ কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, আরামবাগ, করাচী; ১ম সংস্করণ–১৩৮৩হিঃ = ১৯৬৪ইং

٤٧-عجاله نافعه

৪৮–আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হিঃ) (ক) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪১৪হিঃ = ১৯৯৪ইং (খ) দারুর রায়্যাহ, সৌদি আরব, ২য় সংস্করণ–১৪০৮হিঃ = ১৯৮৮ইং

٤٨-النكت على كتاب ابن الصلاح

৪৯–আল আজভিবাতুল ফাযিলা
(আত তালীকাতুল হাফিলা সহ) আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) মাকতাবাতুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব; ৩য় সংস্করণ–১৪১৪হিঃ = ১৯৯৪ইং

٤٩-الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة

৫০–আত তালীকাতুল হাফিলা
আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (১৪১৭হিঃ) মাকতাবাতুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব–সিরিয়া; ৩য় সংস্করণ–১৪১৪হিঃ =

٥٠-التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة

Contents

১৯৯৪ইং (আল আজভিবাতুল ফাযিলা-এর সাথে)

৫১-যাফারুল আমানী
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) মাকতাবাতুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব-সিরিয়া; ৩য় সংস্করণ-১৪১৬হিঃ = ১৯৯৬ইং

٥١-ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني

৫২-আল মাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা-বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ-১৪১৯হিঃ = ১৯৯৮ইং

٥٢-المدخل إلى علوم الحديث الشريف

৫৩-লামাহাত মিন তারীখিস সুন্নাতি ওয়া উলূমিল হাদীস
আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ ১৪১৭হিঃ) (ক) মাকতাবাতুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব-সিরিয়া; ১ম সংস্করণ-১৪০৪হিঃ = ১৯৮৪ইং (খ) ৪র্থ সংস্করণ-১৪১৭হিঃ = ১৯৯৭ইং

٥٣-لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث

৫৪-কাওয়াইদুদ তাহদীস
মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসেমী (১৩৩২হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ-১৩৯৯হিঃ = ১৯৭৯ইং

٥٤-قواعد التحديث

৫৫-হুজ্জিয়তে হাদীস
মুহাম্মাদ তকী উসমানী, কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ, ১৯৯৮ইং

٥٥-حجيت حديث

মওযূ ও জালহাদীসবিষয়ক

كتب الموضوعات

৫৬-কিতাবুল মাওযূআত
আবুল ফরয আব্দুর রহমান ইবনুল জওযী (৫৯৭হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ-১৪১৫হিঃ = ১৯৯৫ইং

٥٦-كتاب الموضوعات

৫৭–রিসালাতুল মাওযূআত
হাসান ইবনে মুহাম্মাদ সাগানী (৬৫০হিঃ)
মাতবাআয়ে বারোনিয়া, মিশর

٥٧–رسالة الموضوعات

৫৮–আল মানারুল মুনীফ ফিস সহীহি ওয়াযযয়ীফ
ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়া (৭৫১হিঃ) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত; প্রকাশক–মাকতাবাতুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব; ৬ষ্ঠ সংস্করণ–১৪১৪হিঃ = ১৯৯৪ইং

٥٨–المنار المنيف في الصحيح والضعيف

৫৯–সিফরুস সাআদা
মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব ফিরোযাবাদী (৮১৭হিঃ) মানশূরাতিল মাকতাবাতিল আছারিয়া, সাঈদা–বৈরুত

٥٩–سفر السعادة

৬০–আল লাআলিল মাসনূআ
জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ূতী (৯১১হিঃ) দারুল মারেফা, বৈরুত

٦٠–اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة

৬১–যাইলুল লাআলিল মাসনূআ
জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ূতী (৯১১হিঃ) আল মাকতাবাতুল আসারিয়া, সাঙ্গলা হল, শাইখপুরা–পাকিস্তান

٦١–ذيل اللآلي المصنوعة

৬২–আল মাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূ
মোল্লা আলী কারী (১০১৪হিঃ) (ক) প্রকাশক–মাকতাবাতুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব–সিরিয়া; (খ) ঐ ৫ম সংস্করণ–১৪১৪হিঃ = ১৯৯৪ইং

٦٢–المصنوع في معرفة الحديث الموضوع

৬৩–আল মাওযূআতুল কুবরা
মোল্লা আলী কারী (১০১৪হিঃ) (ক) নূর মুহাম্মাদ কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, আরামবাগ, করাচী। (খ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪০৫হিঃ = ১৯৭৫ইং

٦٣–الموضوعات الكبرى

৬৪–তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফূআ আনিল আখ্বারিশ শানীআতিল মাওযূআ ইবনে আররাক কিনানী (৯০৭-৯৬৩হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ২য় সংস্করণ–১৪০১হিঃ = ১৯৮১ইং	٦٤–تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
৬৫–তায্কিরাতুল মাওযূআত মুহাম্মাদ তাহের পাটনী (৯৮৬হিঃ) দারু ইহ্য়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; ৩য় সংস্করণ–১৪১৫হিঃ = ১৯৯৫ইং	٦٥–تذكرة الموضوعات
৬৬–আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ফিল আহাদীসিয যয়ীফাতি ওয়াল মাওযূআ মুহাম্মাদ ইবনে আলী শাওকানী (১২৫০হিঃ) মাকতাবায়ে নেযার মুস্তফা বায, মক্কা মুকাররমা; ২য় সংস্করণ–১৪২১হিঃ = ২০০০ইং	٦٦–الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة
৬৭–আল আসারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাওযূআ আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪০৫হিঃ = ১৯৮৪ইং	٦٧–الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة
৬৮–আল লুউলুউল মারসূ ফীমা কীলা লা আসলা লাহূ আও বিআসলিহী মাওযূ সায়্যিদ মুহাম্মাদ কাউকজী (১৩০৫হিঃ) মাকতাবায়ে বারোনিয়া, মিশর	٦٨–اللؤلؤ المرصوع فيما قيل لا أصل له أو بأصله موضوع
৬৯–আল ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযূআত ডঃ মুহাম্মাদ আবু শুহবাহ, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো–মিশর; ৪র্থ সংস্করণ–১৪০৮হিঃ = ১৯৯৮ইং	٦٩–الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير
৭০–যাইলু তানযীহিশ শরীয়া মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (পাণ্ডুলিপি)	٧٠–ذيل تنزيه الشريعة المرفوعة
৭১–সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা নাসিরুদ্দীন আলবানী মাকতাবাতুল	٧١–سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

Contents

মাআরেফ, রিয়াদ–সৌদি আরব; ১ম সংস্করণ–১৪১৭হিঃ = ১৯৯৬ইং

লোকমুখে প্রসিদ্ধ হাদীসবিষয়ক — **كتب الأحاديث المشتهرة**

৭২–আত তাযকিরা ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরা — ٧٢-التذكرة في الأحاديث المشتهرة
বদরুদ্দীন যারকাশী (৭৪৫-৭৯৪হিঃ) দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়া, বৈরুত–লেবানন; ১ম সংস্করণ–১৪০৬হিঃ = ১৯৮৬ইং

৭৩–আল মাকাসিদুল হাসানা — ٧٣-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সাখাবী (৯০২হিঃ) দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪০৫হিঃ = ১৯৮৫ইং

৭৪–আদ্দুরারুল মুন্‌তাসিরা ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরা — ٧٤-الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১হিঃ) (ক) দারুল আরাবিয়া, বিতরণ–আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪০৪হিঃ = ১৯৮৪ইং (খ) মাকতাবাতুল ওয়াররাক, মককা; ১ম সংস্করণ–১৪১৫হিঃ = ১৯৯৪ইং

৭৫–কাশফুল খাফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস আম্মাশ তাহারা মিনাল আহাদিসী আলা আলসিনাতিন নাস — ٧٥-كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس
ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আজলুনী (১১৬২হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪১৮হিঃ = ১৯৯৭ইং

৭৬–যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা — ٧٦-ذيل المقاصد الحسنة
মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (পাণ্ডুলিপি)

Contents

আসমাউর রিজালবিষয়ক **كتب أسماء الرجال**

৭৭–তাহযীবুল কামাল
জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ মিযযী (৭৪২হিঃ) দারুল ফিকর, বৈরুত; প্রকাশকাল–১৪১৪হিঃ = ১৯৯৪ইং
٧٧–تهذيب الكمال في أسماء الرجال

৭৮–সিয়ারু আলামিন নুবালা
আল্লামা যাহাবী (৭৪৮হিঃ) ১ম সংস্করণ–১৪১৭হিঃ = ১৯৯৭ইং
٧٨–سير أعلام النبلاء

৭৯–তাহযীবুত তাহযীব
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হিঃ) মজলিসে দায়েরায়ে মাআরেফে নেযামিয়া, হিন্দ; ১ম সংস্করণ–১৩২৫হিঃ
٧٩–تهذيب التهذيب

৮০–তারীখে মাদীনাতে দামেস্ক
ইবনে আসাকির (৫৭১হিঃ) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত; প্রকাশকাল– ১৪১৫হিঃ = ১৯৯৫ইং
٨٠–تاريخ مدينة دمشق

৮১–মীযানুল ইতিদাল
মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ যাহাবী (৭৪৮হিঃ) দারুল ফিক্‌র, মিশর
٨١–ميزان الاعتدال في نقد الرجال

৮২–লিসানুল মীযান
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হিঃ) (ক) মাজলিসু দায়িরাতিন নুমানিয়া নিযামিয়া, হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য, হিন্দ; ১ম সংস্করণ–১৩৩০হিঃ (খ) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪২৩হিঃ
٨٢–لسان الميزان

৮৩–আযযুআফাউল কাবীর
মুহাম্মাদ ইবনে আমর উকাইলী (৩২২হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ২য় সংস্করণ–১৪১৮হিঃ = ১৯৯৮ইং
٨٣–الضعفاء الكبير

সীরাত ও ইতিহাসবিষয়ক | كتب السيرة والتاريخ

৮৪–শামায়েলে তিরমিযী — ٨٤–شمائل الترمذي
জামে তিরমিযী দেখুন

৮৫–আততবাকাতুল কুবরা — ٨٥–الطبقات الكبرى
মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (২৩০হিঃ) দারু ইহ্য়াউত তুরাসিল আরাবী; বৈরুত

৮৬–হিলয়াতুল আওলিয়া — ٨٦–حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
আবু নুআইম ইস্পাহানী, (৪৩০হিঃ) দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪১৮হিঃ = ১৯৯৭ইং

৮৭–দালায়েলুন নবুওয়া — ٨٧–دلائل النبوة
ইমাম বাইহাকী (৪৫৮হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪০৫হিঃ = ১৯৮৫ইং

৮৮–তারীখে বাগদাদ — ٨٨–تاريخ بغداد
আহমাদ ইবনে আলী খতীব (৪৬৩হিঃ) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত–লেবানন

৮৯–আল বিদায়া ওয়াননিহায়া — ٨٩–البداية والنهاية
হাফেয ইবনে কাসীর (৭৭৪হিঃ) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪১৭হিঃ = ১৯৯৬ইং

৯০–আল খাসায়েসুল কুবরা — ٩٠–الخصائص الكبرى
জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪০৫হিঃ = ১৯৮৫ইং

৯১–সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ — ٩١–سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ সালেহী (৯৪২হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪১৪হিঃ = ১৯৯৩ইং

৯২–আল খামীস ফী আহ্ওয়ালে আনফাসে নাফীস — ٩٢–الخميس في أحوال أنفس نفيس

Contents

কম্পিউটার সংস্করণ–২০০০ইং

৯৩–শরহুল মাওয়াহেব
আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ কাসতাল্লানী (৯২৩হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪১৭হিঃ = ১৯৯৬ইং

٩٣–شـرح المواهب اللدنيـة بالمنح المحمدية

৯৪–গায়াতুল মাকাল ফীমা য়াতাআল্লাকু বিন্নিআল
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) ইদারাতুল কুরআন, করাচী; প্রকাশকাল–১৪১৯হিঃ

٩٤–غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

৯৫–সীরাতুন্নবী
আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সুলাইমান নদভী, হোযাইফা একাডেমী, লাহোর

٩٥–سيـرة النبي صلى الله عليـه وسلم

৯৬–আল বুসীরী মাদেহুর রাসূলিল আ'যম
আব্দুল আল হামামিসী, মাকতাবাতুল হিদায়া, বৈরুত; ২য় সংস্করণ–১৪১৩হিঃ = ১৯৯৩ইং

٩٦–البـوصـيـري مـادح الرسـول الأعظم

৯৭–নশরুত তীব
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) দারুল ইশাআত, করাচী; ১ম সংস্করণ–১৯৮৭ইং

٩٧–نشر الطيب

৯৮–তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত
আবুল হাসান আলী নদভী (১৪২১হিঃ) মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম, লাখনো; ৭ম সংস্করণ–১৪১৯হিঃ = ১৯৯৮ইং

٩٨–تاريخ دعوت وعزيمت

ফিক্হ, ফাতাওয়া ও উসূলুল ফিক্হ — **كتب الفقه والفتاوى وأصول الفقه**

৯৯–আররিসালা
ইমাম শাফী (২০৪হিঃ) দারুল ফিকর, বৈরুত

٩٩–الرسالة للإمام الشافعي

১০০–আল মুতামাদ ফী উসূলিল ফিক্হ

١٠٠–المعتمد في أصول الفقه

Contents

আবুল হুসাইন বাসরী (৪৩৬হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

১০১–المجموع شرح المهذب
১০১–মাজমূউ শরহিল মুহাযযাব
ইমাম নববী (৬৭৬হিঃ) দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; নতুন সংস্করণ–১৪১৫হিঃ = ১৯৯৫ইং

১০২–مجموع فتاوى ابن تيمية
১০২–মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হিঃ) বাদশা ফাহাদ প্রকাশনা কমপ্লেক্স, মদীনা, সৌদি আরব; ১৪১৬হিঃ = ১৯৯৭ইং

১০৩–الفتاوى الحديثية
১০৩–আল ফাতাওয়া হাদীসিয়া
ইবনে হাজার মক্কী (৭৯৪হিঃ) দারুল ফিকর, বৈরুত; লেবানন

১০৪–الحاوي للفتاوي
১০৪–আল হাভী লিল ফাতাভী
ইমাম সুয়ূতী (৯১১হিঃ) দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত

১০৫–البحر الرائق شرح كنز الدقائق
১০৫–আল বাহরুর রায়িক
যাইন ইবনে নুজাইম (৯৭০হিঃ) এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী, করাচী

১০৬–تحفة المحتاج في شرح المنهاج
১০৬–শরহুল মিনহাজ
শিহাবুদ্দীন ইবনে হাজার হাইতামী (৯৭৩হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪১৬হিঃ = ১৯৯৬ইং

১০৭–حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح
১০৭–হাশিয়াতু তাহতাভী আলাল মারাকী
শাইখ আহমাদ তাহতাভী (১২৩১হিঃ) মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, আরামবাগ–করাচী

১০৮–رد المحتار على الدر المختار
১০৮–ফাতাওয়া শামী
ইবনে আবেদীন (১২৫২হিঃ) এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী, করাচী (বোলাক মুদ্রণের ফটো।)

১০৯–شرح عقود رسم المفتي
১০৯–শরহু উকূদি রাসমিল মুফতী

Contents

ইবনে আবেদীন (১২৫২হিঃ) কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী

১১০–ফাতাওয়া আযীযী — ١١٠-فتاوى عزيزيه
শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী (১২৩৯হিঃ) এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী, আদব মনযিল, করাচী; নতুন মুদ্রণ–১৪০৮হিঃ

১১১–আসসিআয়া — ١١١-السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) সুহাইল একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান; ২য় সংস্করণ–১৪০৮হিঃ = ১৯৮৭ইং

১১২–মাজমূআ ফাতাওয়া আব্দুল হাই — ١١٢-مجموعة فتاوى عبد الحي
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী, আদব মনযিল, পাকিস্তান চক, করাচী

১১৩–ইমদাদুল আহকাম — ١١٣-إمداد الأحكام
যাফর আহমাদ উসমানী ও আব্দুল কারীম গুমথালভী, মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচী; ২য় মুদ্রণ–১৪১২হিঃ

১১৪–ইমদাদুল ফাতাওয়া — ١١٤-إمداد الفتاوى
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচী

১১৫–ইমদাদুল মুফতীন — ١١٥-إمداد المفتين
মুফতী শফী (১৩৯৬হিঃ) দারুল ইশাআত, উর্দূ বাজার, করাচী

১১৬–ফাতাওয়া মাহ্মূদিয়া — ١١٦-فتاوى محموديه
মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (১৪১৭হিঃ) কুতুবখানায়ে মাযহারী, গুলশান ইকবাল, করাচী

১১৭–খাইরুল ফাতাওয়া — ١١٧-خير الفتاوى
মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জলন্দরী, খায়রুল মাদারেস, মুলতান; প্রকাশ–১৪০৭হিঃ

Contents

١١٨-نفع المفتي والسائل

১১৮–নফউল মুফতী ওয়াস সায়েল
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী, করাচী

كتب التصوف والمواعظ

তাসাওউস ও মাওয়ায়েজ

١١٩-إحياء علوم الدين

১১৯–ইহয়াউ উলূমিদ্দীন
আবু হামেদ গাযযালী (৫০৫হিঃ) মাকতাবাতুল ঈমান, মনসূরা, মিশর; ১ম সংস্করণ–১৪১৭হিঃ = ১৯৯৬ইং

١٢٠-لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

১২০–লাতায়িফুল মাআরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযায়েফ
যাইনুদ্দীন ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫হিঃ) দারু ইবনে হাযম ও মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত; ২য় সংস্করণ–১৪১৭হিঃ = ১৯৯৬ইং

١٢١-إرشادات مجدد ألف ثاني

১২১–ইরশাদাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী
ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর, পাকিস্তান; ১৪১৭হিঃ = ১৯৯৬ইং

١٢٢-إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين

১২২–ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন
মুরতাযা যাবীদী (১২০৫হিঃ) দারুল ফিক্র, (কায়রো ১৩১১হিঃ সংস্করণের ফটো।)

١٢٣-التكشف عن مهمات التصوف

১২৩–আত তাকাশশুফ
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) ইদারায়ে তালিফাতে আশরাফিয়া, মুলতান–পাকিস্তান

١٢٤-شريعت و طريقت

১২৪–শরীয়ত ওয়া তরীকত
আশরাফ আলী থানভী, মাসউদ পাবলিশিং হাউজ, দেওবন্দ, ভারত

١٢٥-السنة الجلية في الچشتية العلية

১২৫–আসসুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল চিশ্‌তিয়াতিল আলিয়্যা
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) ইদারায়ে তালিফাতে আশরাফিয়া, মুলতান–পাকিস্তান

١٢٦-تعليم الدين

১২৬–তালীমুদ্দীন

Contents

আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) দারুল ইশাআত, করাচী

১২৭–ইসলাহী নেসাব ۱۲۷-إصلاحی نصاب
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) (মাজমূআয়ে রাসায়েলে থানভী) দারুল ইশাআত, করাচী–পাকিস্তান

১২৮–শরীয়ত ওয়া তরীকত কা তালাযুম ۱۲۸-شریعت وطریقت کا تلازم
শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (১৪০২হিঃ) কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম, সাহারানপুর, ভারত; ১ম সংস্করণ–১৩৯৮হিঃ = ১৯৭৮ইং

১২৯–তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ ۱۲۹-التصوف بین عرض ونقد
মাহমূদ আশরাফ উসমানী, মাওলানা আব্দুল মালেক, প্রকাশক–মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা; ১ম সংস্করণ

১৩০–দুররাতুস সালেহীন ۱۳۰-درة الصالحين
মুহাম্মাদ রুহুল আমীন, ইছামতী অফসেট প্রেস–ঢাকা; ৩য় সংস্করণ–১৯৯৩ইং

১৩১–কুররাতুল ওয়ায়েযীন ۱۳۱-قرة الواعظين
মৌলভী নূরুদ্দীন, মাতবায়ে ওয়াহীদী, কানপুর–ভারত

আকীদা ও সুন্নত-বিদআতবিষয়ক كتب العقائد والسنة

১৩২–আল আকীদাতুত ত্বহাবিয়া ۱۳۲-العقيدة الطحاوية
ইমাম জাফর ত্বহাবী (৩২১হিঃ)

১৩৩–শরহুল আকীদাতিত তহাবিয়া ۱۳۳-شرح العقيدة الطحاوية
আলী ইবনে আলী আবিল ইযয (৭৯২হিঃ) মাকতাবাতু দারিল বয়ান; ১ম সংস্করণ–১৪০১হিঃ = ১৯৮১ইং

১৩৪–কানূনুত তাভীল ۱۳٤-قانون التأويل
আবু হামেদ গাযযালী (৫০৫হিঃ) আল আনওয়ার, কায়রো

Contents

১৩৫–আল মাদখাল ١٣٥-المدخل لابن الحاج
ইবনুল হাজ্জ (৭৩৭হিঃ) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত

১৩৬–আল ই'তিসাম ١٣٦-الاعتصام
ইবরাহীম ইবনে মূসা শাতেবী (৭৯০হিঃ) দারু ইবনে আফফান, সৌদি আরব; ১ম সংস্করণ–১৪১৮হিঃ = ১৯৯৭ইং

১৩৭–আল আকায়িদুন নাসাফিয়া ١٣٧-العقائد النسفية
উমর নাসাফী (৫৩৭হিঃ) (দেখুন নিবরাস)

১৩৮–শরহুল আকায়িদিন নাসাফিয়া ١٣٨-شرح العقائد النسفية
সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (৭৯৩হিঃ) (দেখুন নিবরাস)

১৩৯–নিবরাস ١٣٩-النبراس
আব্দুল আযীয আল ফারহারী (১২৩৯হিঃ এর পর) হাবীবিয়া লাইব্রেরী, কোয়েটা, পাকিস্তান

১৪০–কায়িদাতুন জালীলা ফিত তাওয়াসসুলে ওয়াল ওয়াসীলা ١٤٠-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হিঃ) ১ম সংস্করণ–১৪১২হিঃ = ১৯৯২ইং

১৪১–ঈযাহুল হাক্কিস সারীহ ١٤١-إيضاح الحق الصريح في أحكام الموتى والضريح
শাহ ইসমাঈল শহীদ (১২৪৬হিঃ) কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী

১৪২–ইতমামুল বুরহান ফী রদ্দী তাওযীহিল বয়ান ١٤٢-إتمام البرهان في رد توضيح البيان
সারফরায খান সফদর, মাকতাবায়ে সাফদারিয়া, গুজরাঁওয়ালা, পাকিস্তান; ৩য় সংস্করণ–১৪১৩হিঃ = ১৯৯৩ইং

১৪৩–মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশ্‌ফি ওয়াররুইয়া ١٤٣-موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤيا
ডঃ ইউসুফ কারযাভী, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত; ১ম সংস্করণ–১৪১৭হিঃ

Contents

=১৯৯৬ইং

১৪৪–তাবসিরাতুল আদিল্লা ١٤٤–تبصرة الأدلة
আবুল মুঈন নাসাফী (৫০৮হিঃ) দামেস্ক; ১৯৯৩ইং

১৪৫–কিতাবুল ইসতিগাসা ফিররদ্দে আলাল বাকরী ١٤٥–كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হিঃ) দারুল ওয়াতন, রিয়াদ সৌদি আরব; ১ম সংস্করণ–১৪১৭হিঃ = ১৯৯৭ইং

১৪৬–ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম ١٤٦–اختلاف امت اور صراط مستقيم
মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানভী, মাকতাবায়ে লুধিয়ানভী, করাচী

১৪৭–রাহে সুন্নাত ١٤٧–راه سنت
সরফরায খান সফদর ইদারাতুস সাকাফা ওয়ান নশর, ১২তম সংস্করণ–১৪০১হিঃ = ১৯৮১ইং

বিবিধ المتفرقات

১৪৮–ইকতিযাউল ইলমিল আমালা ١٤٨–اقتضاء العلم العمل
আবু বকর আহমদ ইবনে আলী খতীব বাগদাদী (৪৬৩হিঃ) আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত; ৩য় সংস্করণ

১৪৯–হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ١٤٩–حجة الله البالغة
শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (১১৭৬হিঃ) দারুল মারেফা, বৈরুত

১৫০–তাহকীকাতুন ওয়া আনযারুন ফিল কুরআনি ওয়াসসুন্নাহ ١٥٠–تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة
মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আশূর, শারিকায়ে তিউনিসিয়া–তিউনিস (তিউনিসিয়া) ও মুআসসাসায়ে ওয়াতানিয়া–আল জাযায়ের (আলজেরিয়া)

Contents

১৫১–কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা ١٥١-قيمة الزمن عند العلماء.
আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (১৪১৭হিঃ) মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব–সিরিয়া; ৬ষ্ঠ সংস্করণ

১৫২–মুকাদ্দিমাতু মুকাদ্দিমাতি কিতাবিত তালীম ١٥٢-مقدمة مقدمة كتاب التعليم
আব্দুর রশীদ নোমানী (১৪২০হিঃ) লাজনাতু ইহইয়াইল আদাবিস সিন্দী, করাচী

كلمة أهل الحديث من أهل النقد والرأي على وضعها أو أنه لا أصل لها، لا يجوز نشرها وروايتها حديثاً ومنسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتخب من الموضوعات التي قد شاعت في بلادنا ببنغلاديش بصفة خاصة، لئلا يشوش ذهن الشعب بالموضوعات التي لم يسمعوها بعدُ. ولم يقصد بهذا العدد تحديد الموضوعات فيه. وذكر بجنب كل حديث موضوع حديث صحيح مهما أمكن، حتى يقف القاري على هدى النبي صلى الله عليه وسلم ونوره فيتبدد الظلام المخيم من الأباطيل والموضوعات والواهيات.

تقبل الله هذه الخدمة بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً، وجزى من بذل أدنى جهد في إخراج هذا الكتاب ونشره، خير الجزاء وأوفاه، آمين، يا رب العالمين.

كتبه

زبير حسين

أستاذ بقسم التخصص في علوم الحديث الشريف بالمركز

١٤٢٤/٧/١٥ هـ

فلو نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه كان من أشد الكبائر الذي اجترأ عليها وارتكبها من لا يخاف الله ولا يرجو الآخرة، والذي تبوأ مقعده من النار بحصائد لسانه ويده. كما قال صلى الله عليه وسلم : من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.

ولا شك أن هذا الأمر قد وقع، قد نشأ الكذابون الدجالون، فانشأوا ما لم يقله صلى الله عليه وسلم فنسبوه حديثاً إليه صلى الله عليه وسلم - ظلماً وزوراً. وليست هي من نور النبوة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي من هديه في شيء، ولا يهتدي بها أحد، ولا يجد بها حلاوة الفلاح، ولا يتبرك بها قط. بل هي التي ذهبت بالناس إلى شفا جرف هار، فانهار بهم ...

ولما كان من وعد الله عز وجل أن يحفظ دينه من كل نقص وزيادة، خلق في كل زمان من يحرس هذا الدين ويحرس مصدره العظيم: الحديث النبوي الشريف. فنصبوا معالم تمييز الحديث النبوي من هذيانات الدجالين الكذابين، وعرفوا الحق عن الباطل. فأدوا فيه خدمات جليلة فميزوا الموضوعات والواهيات والمعلولات وأبلوا فيه بلاء حسناً.

وهذا الكتاب - الأحاديث الموضوعة الرائجة - الذي بين أيديكم حلقة من تلك السلسلة الذهبية التي قام بها الأقدمون. لما كانت بلادنا بنغلاديش نائيةً من المراكز العلمية الزاخرة بعلوم الدين والشريعة لاسيما علوم الحديث الشريف - تأخرت هذه الخدمة اللازمة من أوانها حتى شرّف الله تعالى بها مركزنا مركز الدعوة الإسلامية داكا، ووفقه لتقديمها إلى الشعب البنغلاديشيين الذين لم يزالوا ولا يزالون يشتاقون إلى مثل هذه المساعي الطيبة.

والذي تصدينا له في هذا الكتاب : جمعنا فيها نحو مئة حديث اتفقت

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة في التعريف بالكتاب وموضوعه

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،

فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنور المبين عن رب العالمين، فأنار به الدجى التي قد ملئت بها الدنيا منذ تباعدت من نور الرسالة - رسالة نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو نور الكتاب المبين المنزل عليه، ونور السنة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى تبيانا لكتابه، وقد انشعبت إلى أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وشمائله.

فسُعد الناس بحياة منورة مباركة على ضوء هديه صلى الله عليه وسلم.

هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان السنة هي لوامع وومضات ذلك النور المبين الذي يهدي الناس إلى سواء السبيل، وينتهي بهم إلى قمة الفلاح والنجاح الخالد.

ولا شك أن هذه الأحاديث تُمثِّل شهادة الفلاح لكونها حديثاً نبوياً، ولأنها متقاطرة من نور النبوة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، والتي أيِّد صاحبها بروح القدس الأمين عليه الصلاة والسلام.

في هذا المجلد كتابُ :

الأحاديث الموضوعة الرائجة

الجزء الأول

كتاب يهُم العوام والطلاب والعلماء، فيه فوائد كثيرة متنوعة إلى جانب الكشف عن أحوال نحو من مئة رواية راجت في البيئة، مع أنها موضوعة أو لا أصل لها باتفاق من النقاد، والكتاب متقن جداً يعتمد أسسا متينة ونصوصاً من الجهابذة صريحة.

جمع وتخريج

الشيخ مطيع الرحمن

أستاذ بقسم التخصص في علوم الحديث الشريف

بمركز الدعوة الإسلامية داكا

تقديم وإشراف

الأستاذ الشيخ محمد عبد المالك

أمين شؤون التعليم ومشرف قسم التخصص في علوم الحديث الشريف بالمركز

الناشر

مركز الدعوة الإسلامية داكا

30/12 قلبي، داكا-1216 بنغلاديش، الهاتف : 8050418